PAROMANUR RAJJYE

Translated by : Meena Sharafuddin

প্রথম প্রকাশঃ নবেম্বর, ১৯৭১

চিত্রসূচী ।০

ভূমিকা ১—৪

১। পরমাণুর উপাদান ৫—২৩
- সব কিছু যা দিয়ে তৈরি
- দুজাতের বিদ্যুৎ
- দুই অসমান যমজ
- উদাসীন কণিকা

২। পরমাণুর গড়ন ২৪—৪১
- ভারি কেন্দ্র
- ফাঁপানো বাকি অংশ
- নানা জাতের পরমাণু
- কয়েকটি মৌলের নমুনা
- মৌলের পরিবার
- আধানযুক্ত পরমাণু

৩। যমজ পরমাণু ৪২—৫৬
মৌল কাছাকাছি থেকে দেখা
বেশি আর কম আইসোটোপ
ভারি হাইড্রোজেন আর ভারি পানি
আইসোটোপ আবিষ্কারের কাহিনী
আইসোটোপ পৃথক করা
৪। পরমাণুর ভেঙে পড়া ৫৭—৭৭
অস্থায়ী পরমাণু
তিন রকম রশ্মি
নানা জাতের আলো
গামারশ্মি
নতুন ধরনের শক্তি
৫। পরমাণুর জীবনকাল ৭৮—৯৬
তেজস্ক্রিয়ার শক্তিক্ষয়
দীর্ঘজীবী পরমাণু
স্বল্পজীবী পরমাণু
পরমাণুর হিসেব-নিকেশ
৮৩ আর তার নিচে তেজস্ক্রিয়া
৬। পরমাণুর ছর্‌রা গুলি ৯৭—১১২
কিমিয়ার স্বপ্ন
ইলেকট্রনদের বাধা ডিঙানো
এক নতুন ধরনের কার্বন
মানুষের হাতে তৈরি
৭। পরমাণুর কামান দাগা ১১৩—১২৯
নতুন ধরনের গুলি
নতুন পরমাণু-ভাঙা যন্ত্র
নতুন নতুন পরমাণু
নতুন নতুন মৌল
৮। নতুন মৌলকণিকার আবির্ভাব ১৩০—১৪৩
প্রত্যেকের বিপরীত
উল্টা-বস্তু
সবচেয়ে ছোট
মাঝামাঝি
বাকি সব রহস্য
৯। পরমাণু-শক্তি ১৪৪—১৬০
পুরোপুরি ১ নয়
হারিয়ে যাওয়া ভর
দরকারি নিউট্রন
নিউট্রন বিক্রিয়া
পরমাণু-বিভাজন
ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বিশেষত্ব
১০। পরমাণু থেকে বিপদ ১৬১—১৭৭
শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার সাফল্য
নানা রকম অসুবিধে
পারমাণবিক বোমা
হাইড্রোজেন বোমা
তিনটি প্রভাব
তেজস্ক্রিয় ভস্মবর্ষণ—সবচেয়ে বড় বিপদ
১১। পরমাণুর কল্যাণকর সম্ভাবনা ১৭৮—১৯৮
সূক্ষ্ম ভারসাম্য
পরমাণুযুগের আবির্ভাব
প্রচুর আইসোটোপ
প্রচুর শক্তি
আরো জ্বালানি
ভবিষ্যতের দিকে
পারিভাষিক শব্দ ১৯৯—২০৬

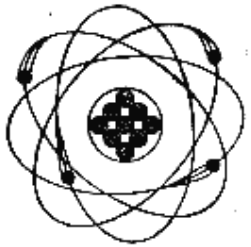

চিত্রসূচী

আকর্ষণ আর বিকর্ষণ	১০
ক্যাথোড রশ্মি ও চ্যানেল রশ্মি ;	১২
আধান যোগ ও আধান ত্যাগ	১৩
মৌলকণিকা ও চুম্বক	১৫
মৌলকণিকাদের ভর	২০
পরমাণুর ভেতর দিয়ে মৌলকণিকা	২৬
কয়েকটি সরল পরমাণু	৩৪
সদৃশ মৌল	৩৭
কয়েকটি সরল আইসোটোপ	৫০
ভরবর্ণালী-লেখ	৫৫
চুম্বকক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি	৬২
আল্‌ফা কণিকা আর বেটা কণিকা	৬৬
তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ	৭১
বস্তু ও শক্তি	৭৬
অর্ধজীবনকাল	৮৩
একটি তেজস্ক্রিয় শ্রেণী	৮৮
বিদ্যুৎবীক্ষণ	১০৩
কার্বন-১৪ সৃষ্টি	১০৬
মানুষের হাতে পরমাণুর রূপান্তর	১০৯
প্রোটন দিয়ে গুলিবর্ষণ	১১৬
কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া	১২৪
ভর-শক্তি নক্‌সা ১	১৪৬
ভর-শক্তি নক্‌সা ২	১৪৭
ডয়টেরন	১৫১
শৃঙ্খল-বিক্রিয়া	১৫৫
ভর-শক্তি নক্‌সা ৩	১৫৯
ভর-শক্তি নক্‌সা ৪	১৬৯
পারমাণবিক শক্তি	১৭২

read n share

www.banglainternet.com

ভূমিকা

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর আকাশে উঠল 'স্পুটনিক' নামে ছোট্ট এক নতুন চাঁদ। সাথে সাথে চারদিকে আওয়াজ উঠল, আমেরিকা বৈজ্ঞানিক কীর্তিকর্মের নানা দিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এর পর বিভিন্ন মহল থেকে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ওপর বেশি জোর দেবার দাবী উঠল, আর সে-অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হল।

আসলে কিন্তু স্পুটনিক নতুন কোন সমস্যার জন্ম দেয়নি ; যে সমস্যা আগে থেকেই ছিল, শুধু তার বহুল প্রচার ঘটিয়েছে মাত্র। মার্কিন বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়ে চললেও দিন দিন যেন বিজ্ঞান-শিক্ষার অধোগতি ঘটছে। উচ্চবিদ্যালয়ে গণিত, পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন চর্চার ব্যবস্থা সংকুচিত হয়েছে ; কলেজগুলি থেকে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী আর যন্ত্রী উৎপাদনের সংখ্যা কমেছে ; উন্নত মানের বিজ্ঞান শিক্ষকরা যেন ক্রমেই অদৃশ্য হচ্ছেন।

স্পুটনিকের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সতর্ক-বাণীতে কেউ তেমন কান দেয়নি।

এমন কি স্পুটনিকের তাৎপর্যেরও ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কেউ যদি ভাবেন শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পাল্লা দেবার জন্যে বা আরো ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্যেই বিজ্ঞানচর্চার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার, তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। আসলে দুনিয়ার দেশে দেশে যদি কোন বিরোধ আদৌ না থাকত তাহলেও বিজ্ঞানীদের গুরুত্ব কমত না।

পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন তিনশো কোটির কাছাকাছি [১৯৭০ সালে ৩৬৫ কোটি—অনুবাদক] আর এই সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিশ কোটির মতো [১৯৭০ সালে ২২ কোটি—অনুবাদক]। এদেশে জীবনযাত্রার মান আজ অন্য সব দেশের চেয়ে উঁচু ; অন্যান্য দেশের লোকেরাও নিজেদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে মনে রাখতে হবে এই বিপুল জনসংখ্যার জন্যে উন্নত জীবন-যাত্রার মান সম্ভব হতে পারে শুধু একটি জিনিসের সাহায্যে—সে হল যন্ত্র।

যন্ত্র বেশি পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে ; কঠিন মাটি খুঁড়ে বেশি আকরিক তুলে সাহায্য করে বেশি ধাতু নিষ্কাশনে ; সাহায্য করে নগর-জনপদ গড়তে আর চালু রাখতে ; যন্ত্র মানুষকে আর মানুষের দরকারী নানা সামগ্রী বয়ে নেয় ডাঙা, পানি আর হাওয়ার ওপর দিয়ে ; আমাদের ঘরে ঘরে দেয় আনন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্য ; এমন কি মানসিক শ্রমের কাজও করে দেয়। আমাদের এই যন্ত্রসভ্যতা যদি অল্প-সময়ের জন্যেও বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পৃথিবীতে নেমে আসবে ব্যাপক অনাহার আর চরম দুর্যোগ। যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া শুধু পেশীশক্তি আজকের সভ্যতাকে একদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

সব যন্ত্রকেই নির্ভর করতে হয় কয়লা বা তেল পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির ওপর ; অথচ এই কয়লা আর তেলের ভান্ডার উজাড় হতে বেশিদিন লাগবে না। আমাদের সব যন্ত্রপাতিকে চালু রাখার জন্যে তাই খুব শীগ্‌গিরই নতুন শক্তির উৎস ব্যবহার করতে হবে—ইউরেনিয়াম পরমাণু-বিভাজনের শক্তি, হাইড্রোজেন পরমাণু-সংযোজনের শক্তি অথবা সরাসরি সূর্য থেকে পাওয়া শক্তি। যন্ত্রপাতি সবই তৈরি হয় ধাতু দিয়ে ; কোন কোন ধাতুর সরবরাহ যখন কমে আসবে তখন খুঁজতে হবে তাদের নতুন উৎস—কাজে লাগাতে হবে নিচু মানের আকরিক অথবা সাগরজলের ভাণ্ডারকে। অথবা আবিষ্কার

করতে হবে নতুন বিকল্প—কাচ, প্লাস্টিক, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের নতুন নতুন ব্যবহার।

জনসংখ্যা যত বাড়বে ততই আমাদের খাদ্য উৎপাদন আর ব্যবহারেরও নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতে হবে ; আবিষ্কার করতে হবে কীটপতঙ্গ আর পরগাছাকে মোকাবিলা করার, গৃহনির্মাণ আর যাতায়াতের নতুন নতুন উপায়। স্বভাবতই আমরা সবাই চাই রোগ ও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি, দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন, বন্যা, অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা।—কে জানে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে নভোযাত্রার বিস্ময়কর সম্ভাবনা।—এ সব কিছুর জন্যেই প্রয়োজন বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ঃ আরো বেশি করে বিজ্ঞান, আরো বেশি বিজ্ঞানী।

কিন্তু বেশি করে বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে হলে আমাদের শুরু করা দরকার তরুণ সমাজকে নিয়ে। কুশলী খেলোয়াড় তৈরি যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কুশলী গবেষক বিজ্ঞানী সৃষ্টির জন্যেও বহু সময় আর প্রশিক্ষণ দরকার। উভয় ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে যে শুরু করবে তার সাফল্যের সম্ভাবনা যাবে বেড়ে।—এ বই হয়তো এমনি তরুণদের অল্প বয়সে বিজ্ঞান-সাধনা শুরু করতে সাহায্য করবে। অবশ্য সেটাই এ বই লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

এমন মনে করা ভুল যে, কেউ যদি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে না চায় তাহলে তার বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া অর্থহীন ; কিংবা বিদ্যা-লয়ের গণ্ডী পেরোলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা হল বেস-বল। খুব কমসংখ্যক লোকই পেশাগতভাবে বেস-বল খেলে ; কিন্তু দর্শক হিসেবে এই খেলা উপভোগ করে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক। খেলার নিয়মকানুনগুলো জানা থাকলে ভাল খেলা দেখার আনন্দ আর উত্তেজনা বহুগুণে বেড়ে যায়। তাতে জীবনের গভীর তৃপ্তিকর অনুভূতির বিকাশ আর সার্থকতা সম্ভব হয়। খেলার নিয়মকানুন না জানলে এই উপভোগ সম্ভব হবে না ; তখন মনে হবে যেন দুদল লোক শুধু শুধু একটি বলের পেছনে তাড়া করছে।

বিজ্ঞানের বেলাতেও তাই। বিজ্ঞান আজ আমাদের জীবনের এক অবি-চ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; একে আজ আর কারো এড়িয়ে চলার উপায় নেই। বিজ্ঞান আমাদের চারদিক ঘিরে আছে ; আমরা যাই করি না কেন তাতেই রয়েছে বিজ্ঞানের ছোঁয়া। আমাদের মধ্যে হয়তো খুব কম লোকই

banglainternet.com

হবে গবেষক বিজ্ঞানী, কিন্তু আমরা সবাই—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—রয়েছি দর্শকের ভূমিকায়।

না বুঝে দর্শক হলে সব কিছু আমাদের মনে শুধু বিভ্রান্তি আর উদ্বেগই সৃষ্টি করবে। তার চেয়ে বরং খেলার নিয়মকানুন কিছুটা জেনে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত, যাতে আমরা এর আবেগ আর উত্তেজনাকে যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারি আর যথাসময়ে হর্ষধ্বনিও তুলতে পারি।

জানা আর উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার তৃপ্তি। আমাদের আয়ত্ত নতুন জ্ঞান যদি শুধু চারপাশের ঘটনাকে আরো ভাল করে বুঝতে সাহায্য করে তাহলেও এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা সার্থক। তারপর যদি কেউ সমঝদার দর্শক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ্ঞান লাভে অগ্রসর হয় আর ঘটনায় সক্রিয় অংশ নেয় তাহলে তো সেটা বাড়তি লাভ।

পরমাণুর রাজ্যে বইটিতে পরমাণু আর তার ভেতরকার ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে নানা দরকারি বিষয়, কি করে মানুষ এসব জেনেছে আর সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে সেসব সম্পর্কেই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

১ পরমাণুর উপাদান

সব কিছু যা দিয়ে তৈরি

সারা দুনিয়ায় কত নানান ধরনের জিনিস যে আছে আর তাদের একটা থেকে আরেকটার মধ্যে কত যে তফাত তার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে মাথা ঘুলিয়ে যায়। আমাদের চারপাশে তাকালেই একথা বুঝতে কারো বাকি থাকে না।

যেমন, আমি এখন একটা টেবিলের সামনে বসে আছি, সেটা কাঠের তৈরি। আমার সামনে আছে একটা টাইপ-রাইটার, সেটা তৈরি ইস্পাত এবং অন্যান্য আরো ধাতু দিয়ে। টাইপ-রাইটারের 'রিবন'টা আসলে একটা রেশমের তৈরি ফিতে, তার ওপর কার্বনের আস্তরণ লাগানো। আমার সামনে আর আছে কাগজ, যা তৈরি কাঠের মণ্ড দিয়ে। আমার পোশাক তৈরি তুলা, পশম, চামড়া এবং অন্যান্য উপাদানে। আমার দেহ তৈরি চামড়া, পেশী, রক্ত, হাড় এবং অন্যান্য জীবন্ত কলায় ; এদের প্রত্যেকটা অন্যটা থেকে ভিন্ন।

banglainternet.com

একটা কাচের জানলা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ির সামনের রাস্তার ফুটপাথ ভাঙা খোয়ায় তৈরি, আর রাস্তাটা তৈরি 'অ্যাস্‌ফল্ট' নামে আলকাতরার মতো কালো একটা বস্তুতে। বৃষ্টি পড়ছে, তাই রাস্তার মাঝে মাঝে পানি জমে আছে। জোরে হাওয়া বইছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের চারপাশে বায়ু নামে একটা অদৃশ্য বস্তু আছে।

আদতে কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে—দেখতে তারা যত তফাতই হোক—একটা বিষয়ে মিল রয়েছে। কাঠ, ধাতু, রেশম, কাচ, রক্ত আর মাংস সব জিনিসই তৈরি ছোট ছোট পৃথক কণা দিয়ে। আমাদের এই পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, আকাশের সব নক্ষত্র এ সবও গোড়ায় ছোট ছোট কণা দিয়েই গড়া।

বলা বাহুল্য, এ সব কণাকে আমরা কেউ চোখে দেখতে পাইনে। সত্যি বলতে কি, এক টুকরো কাগজ কিংবা একখণ্ড কাঠ বা ধাতুর তৈরি জিনিসকে দেখতে মোটেই ছোট ছোট কণায় তৈরি বলে মনে হয় না, বরং আস্ত একটা খণ্ড বলেই মনে হয়।

মনে কর, তুমি উড়োজাহাজে চড়ে একটা জনশূন্য বালির চরের দিকে তাকাচ্ছ। বালির চরটা মনে হবে হাল্‌কা হলুদ বা মেটে রঙের নিরেট একখণ্ড জমি। অথচ তুমি যদি হাঁটু গেড়ে সেখানে উপুড় হয়ে তাকাও তাহলে দেখবে সে চড়াটা আসলে তৈরি অসংখ্য পৃথক পৃথক ছোট বালির কণা দিয়ে।

অবশ্য আমাদের চারপাশের সব জিনিস তৈরি যেসব কণা দিয়ে সেগুলো বালির কণার চেয়ে আকারে অনেক ছোট। আর সে এমনই ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তাদের দেখার মতো বড় করার উপায় নেই। একটা বালির চড়ায় যত বালির কণা আছে, একটি বালির কণাতেই এমনি কণা আছে তার চাইতে বেশি। সারা দুনিয়ার সব সমুদ্রে যত গ্লাস পানি হবে, এক গ্লাস পানিতেই হবে তার চেয়ে বেশি কণা। এ রকম কণা দশ কোটি পাশাপাশি এক সরল রেখায় সাজালে তা লম্বায় হবে মোটে আধ ইঞ্চি।

সারা দুনিয়ার সব কিছু তৈরি এমনি যেসব কণা দিয়ে, তাদের নাম হল **পরমাণু**।

দুনিয়ায় কত জাতের পরমাণু আছে, এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে। আমাদের চারপাশে লক্ষ লক্ষ রকমের আলাদা জিনিস দেখে মনে হতে পারে, পরমাণুও আছে এমনি লক্ষ লক্ষ জাতের। কিন্তু আসলে তা নয়। এ পর্যন্ত

আমরা জেনেছি ১০৩ রকম পরমাণুর কথা। মাত্র ১০৩—বাস!

তার ওপর এই ১০৩ জাতের মধ্যে আবার অনেকগুলো একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। কতকগুলো পাওয়া যায় শুধু কয়েক ধরনের দুর্লভ পাথরে। কতকগুলো বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে তৈরি করেন, তার বাইরে সেগুলো মোটেই পাওয়া যায় না।

আদতে দুনিয়ায় যত নানান ধরনের জিনিস আছে তার প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগই তৈরি মাত্র ডজনখানেক জাতের পরমাণু দিয়ে। মাত্র একই তিন জাতের পরমাণু দিয়ে তৈরি চিনি, **শ্বেতসার**, কাঠ, তুলা, **শিরকা** এ সব জিনিসের প্রত্যেকটি। দুনিয়ায় এত নানান ধরনের জিনিস হবার কারণ হল মাত্র অল্প কয়েক জাতের পরমাণুকে বহু রকমভাবে সাজানো যায়। মাত্র তিন-চার রঙের সুতো দিয়ে যেমন অসংখ্য রকমের নক্‌শা তৈরি করা যায়, এও যেন ঠিক তেমনি।

এখানে হয়তো কেউ কেউ জিজ্ঞেস করবে : পরমাণু যদি এতই ছোট যে তাদের দেখতে পাবার উপায় নেই তাহলে তারা যে সত্যি সত্যি আছে তা আমরা জানলাম কি করে?

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। কয়েক শ' বছর থেকে বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করছেন নানা রকম জিনিসে তাপ দিলে কোনটা জ্বলে, কোনটা ভস্‌ভসিয়ে ওঠে, আবার কোনটায় বিস্ফোরণ ঘটে কেন ; ভেজা আবহাওয়ায় কোন কোন জিনিসে মরচেইবা পড়ে কেন? দুনিয়ার নানা রকম জিনিসের গুণাগুণের কারণ বোঝার জন্যে তাঁরা নানা অবস্থায় সে সব নিয়ে অনেক পরীক্ষাও করেছেন। এ ধরনের অনুসন্ধানের নাম হল **রসায়ন**।

এই সব পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে গিয়েই রসায়নবিদরা সিদ্ধান্ত করলেন, পরমাণু নামে ছোট ছোট কণাদের অস্তিত্ব রয়েছে। পরমাণু না থাকলে রসায়নবিদদের অনেক আবিষ্কারেরই কোন সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন ডলটন (John Dalton) নামে এক ইংরেজ রসায়নবিদ প্রথম আধুনিক **পরমাণু-তত্ত্বের** (প্রাচীন গ্রীকদেরও এক ধরনের পরমাণু-তত্ত্ব ছিল) প্রবর্তন করেন।

এর পরের দেড় শ' বছরে বিজ্ঞানীদের সব পরীক্ষাতেই এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। কাজেই পরমাণু দেখতে না পেলেও আজ তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ তোলার কোন পথ নেই বললেই চলে।

banglainternet.com

তবে কি পরমাণুই দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট জিনিস? আসলে পরমাণুর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'অ্যাটম' কথাটাও এসেছে এমন এক গ্রীক শব্দ থেকে, যার অর্থ হল 'অবিভাজ্য' বা যাকে আর ভাঙা যায় না। অর্থাৎ পরমাণু হল সেই পরম অণু বা কণা যাকে আর কিছুতেই কাটা বা ভাগ করার উপায় নেই। এর ছোট আর কিছু হতে পারে না। প্রায় এক শ' বছর ধরে তাই ভাবতেন রসায়নবিদরা।

তারপর ১৮৯০ সালের পর ব্যয়শূন্য জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে কতকগুলো পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, পরমাণুর চেয়েও ছোট কণিকার অস্তিত্ব রয়েছে। আসলে সব পরমাণুই এই সব আরো ছোট কণিকা দিয়ে তৈরি। এই সব অতি ছোট কণিকাদের নাম দেওয়া হল অতি-পারমাণবিক বা মৌল কণিকা।

দুজাতের বিদ্যুৎ

উনিশ শতকের শেষ দশকে এই আবিষ্কারের পেছনে অবশ্য এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এসব অতি-পারমাণবিক কণিকার কথা জানার বহুকাল আগে থেকেই মানুষ এদের প্রভাব লক্ষ্য করে আসছে। যেমন, প্রাচীন কালের গ্রীকরা প্রায় দুহাজার পাঁচ শ' বছর আগে লক্ষ্য করেছিল যে, অনেকটা হলদে কাচের মতো দেখতে 'অ্যাম্বার' বলে একটা জিনিসকে পশম বা কাপড় দিয়ে ঘষলে হঠাৎ এতে ছোট ছোট পালক বা পশমের টুকরো আকর্ষণ করার ক্ষমতা জন্মায়।

১৫৭০ সালের দিকে উইলিয়ম গিলবার্ট (William Gilbert) নামে এক ইংরেজ ডাক্তার অ্যাম্বারের এই অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন আরো কতকগুলো জিনিসও অ্যাম্বারের মতো আকর্ষণ করতে পারে। অ্যাম্বারের ল্যাটিন প্রতিশব্দ হল 'ইলেক্‌ট্রাম' ; তাই অ্যাম্বারের মতো যে সব জিনিসে ঘষলে আকর্ষণের ক্ষমতা জন্মায় গিলবার্ট তাদের নাম দিলেন 'ইলেকট্রিক'। কিছুদিনের মধ্যেই লোকে এই আকর্ষণের শক্তিকে বলতে লাগল 'ইলেকট্রিসিটি' বা বিদ্যুৎ।

এর পর ১৭৩৩ সালে চার্লস ফ্রাঁসোয়া দু-ফে (Charles Francois Du Fay) নামে এক ফরাসী গবেষক দেখলেন আকর্ষণের শক্তি আছে দুধরনের, অর্থাৎ বিদ্যুৎ আছে দুজাতের।

তিনি দেখলেন একটা কাচের দণ্ড আর একটা সীলমোহর করার গালার

দণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে দুটোতেই বিদ্যুৎ জন্মায়। কাচের দণ্ড ছোট ছোট জিনিসকে আকর্ষণ করে ; আবার গালাও তেমনি আকর্ষণ করে।

মনে করা যাক, বিদ্যুৎযুক্ত দুটো কাচের দণ্ড আলাদা রেশমী সুতো দিয়ে কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দেখা যাবে দণ্ড দুটো পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে। ঠিক তেমনি যদি দুটো বিদ্যুৎযুক্ত গালার দণ্ড কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেগুলোও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। তারাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।

এবার মনে করা যাক, একটা কাচের দণ্ড আরেকটা গালার দণ্ড কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এরা কাছাকাছি সরে আসবে। অর্থাৎ এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কাচে জন্মাচ্ছে এক ধরনের বিদ্যুৎ আর গালায় জন্মাচ্ছে আরেক ধরনের বিদ্যুৎ। একই জাতের বিদ্যুৎযুক্ত দুটো জিনিস, যেমন দুটো কাচের দণ্ড বা দুটো গালার দণ্ড, পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আবার বিভিন্ন জাতের বিদ্যুৎযুক্ত দুটো জিনিস, যেমন একটা কাচদণ্ড আরেকটা গালার দণ্ড, পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

মার্কিন দেশের বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) ১৭৪০ সালের পর বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে তিনি বললেন, এক ধরনের বিদ্যুৎ আছে যা এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে যাওয়া-আসা করে। কোন কোন জিনিসে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বিদ্যুৎ বেশি জমে উঠতে পারে। আবার অন্য জিনিসে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় হতে পারে কম বিদ্যুৎ। ফ্র্যাঙ্কলিনই প্রথম বললেন বিদ্যুতের ধনাত্মক আধান আর ঋণাত্মক আধানের কথা।

১৮০০ সালে আলেসান্দ্রো ভোল্টা (Alessandro Volta) নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী ধাতুখণ্ড পাশাপাশি সাজিয়ে বৈদ্যুতিক 'ব্যাটারি' বা কোষ-শ্রেণী তৈরির কায়দা বের করলেন। এ থেকে চলমান বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যেত।

প্রত্যেক ব্যাটারিতেই থাকত একটা ধনাত্মক মেরু—তাকে বলা হত 'অ্যানোড', আর একটা ঋণাত্মক মেরু—তাকে বলা হত 'ক্যাথোড'। যাঁরা এসব ব্যাটারি নিয়ে কাজ করতেন তাঁরা ভাবতেন, বিদ্যুৎপ্রবাহ ধনাত্মক মেরু থেকে

banglainternet.com

আকর্ষণ আর বিকর্ষণ

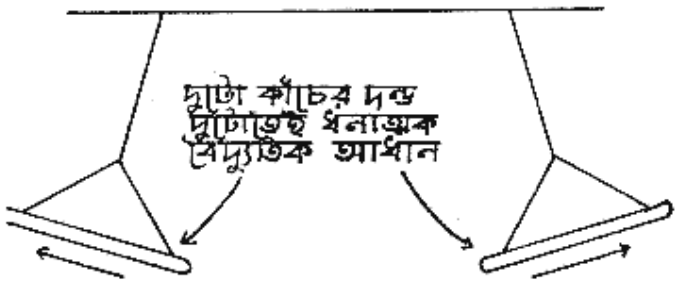

সদৃশ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

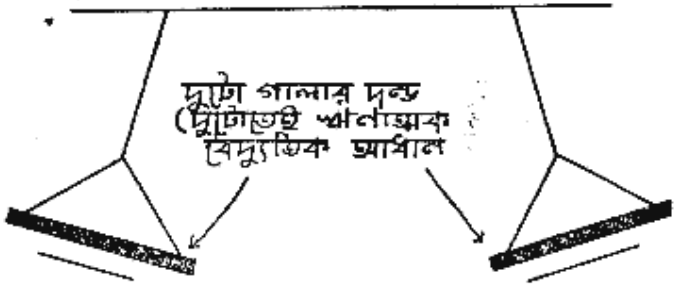

সদৃশ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

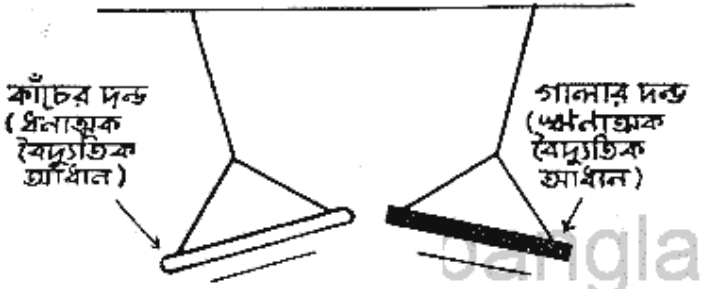

অসদৃশ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে

banglainternet.com

ঋণাত্মক মেরুতে বয়। এটা সত্যি কিনা তা তাঁদের জানার কোন উপায় ছিল না ; এ ছিল নেহাতই তাঁদের অনুমানের কথা।

পরে দেখা গেল তাঁদের এ অনুমানটা সত্যি নয়। যতক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ ধাতুর তার বা কোন তরল পদার্থের ভেতর দিয়ে বইতে থাকে ততক্ষণ প্রবাহ কোন্ দিকে বইছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, বিদ্যুৎ যে-জায়গা দিয়ে বইবে সেখানে কিছুই নেই, অর্থাৎ সে জায়গা বায়ুশূন্য, তাহলে কি হবে?

বিজ্ঞানীরা যখন এমন ধরনের পাত্র তৈরি করতে পারলেন যা থেকে সব হাওয়া পাম্প করে বের করে ফেলা হয়েছে, তখন তাঁরা এমনি পরীক্ষার আয়োজন করলেন। এমন **বায়ুশূন্য কাচ নল** তৈরি হল যার ভেতরে আঁটা থাকবে একটা অ্যানোড আর একটা ক্যাথোড, আর যার ভেতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যাবে জোরালো বিদ্যুৎপ্রবাহ। দেখা গেল ঋণমেরু বা ক্যাথোডে সৃষ্টি হল আলো-ছড়ানো বিদ্যুতের প্রবাহ আর সে প্রবাহ নলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল সরল রেখায়।

১৮৭৬ সালে ইউগেন গোল্ডস্টাইন (Eugen Goldstein) নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী ক্যাথোড থেকে সৃষ্টি হওয়া এ ধরনের বিদ্যুৎপ্রবাহের নাম দিলেন **ক্যাথোড রশ্মি**। ১৮৮৬ সালে তিনি ফুটো বা 'চ্যানেল'-অলা বিশেষ এক ধরনের ক্যাথোড তৈরি করলেন। তিনি দেখলেন এ ধরনের ফুটোঅলা ক্যাথোড ব্যবহার করলে আর এক ধরনের রশ্মি সৃষ্টি হয়। এগুলো ফুটো বা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে বেরোয় আর ছুটে চলে ক্যাথোড রশ্মির উল্টো দিকে। গোল্ডস্টাইন এই নতুন ধরনের রশ্মিদের নাম দিলেন **চ্যানেল রশ্মি**।

বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বুঝতেই পারেন না এ সব রশ্মি কি দিয়ে তৈরি। এগুলো কি কোন নতুন ধরনের আলো, অথবা কোন রকম সূক্ষ্ম কণিকার প্রবাহ? অবশেষে ১৮৯৭ সালে জোসেফ টমসন (Joseph John Thomson) নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন যে ক্যাথোড রশ্মি আসলে এক রকম অতি সূক্ষ্ম কণিকার প্রবাহ ; এই কণিকাগুলো আবার যে কোন পরমাণুর চেয়ে অনেক ছোট। এই হল প্রথম অতি-পারমাণবিক বা মৌল কণিকার আবিষ্কার। এই কণিকাদের প্রবাহ থেকে 'ইলেকট্রিক' বা বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় বলে এই কণিকাদের নাম রাখা হল **ইলেকট্রন**। এই আবিষ্কারের জন্যে টমসন ১৯০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ক্যাথোড রশ্মি ও চ্যানেল রশ্মি

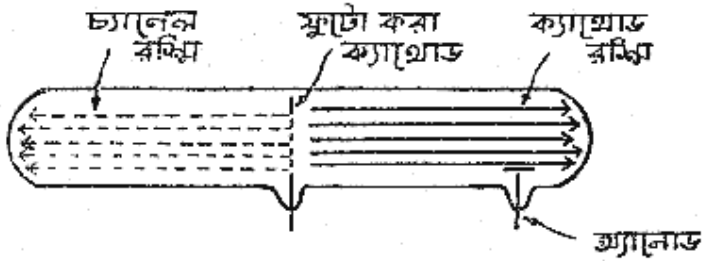

আধান যোগ ও আধান ত্যাগ

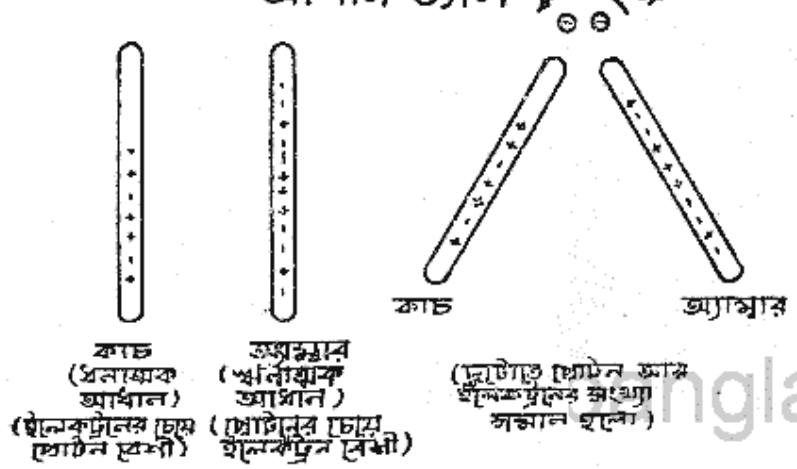

দেখা গেল চ্যানেল রশ্মিও তৈরি কণিকা দিয়ে ; তবে এতে আছে ছোট-বড় নানান জাতের কণিকা, আর তার কোনটাই ইলেকট্রন নয়। ১৯১৪ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) নামে এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী (জন্ম তাঁর নিউজিল্যান্ডে) এই কণিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের কণিকাগুলোর নাম দিলেন **প্রোটন** ; এই নামটাই চালু হয়ে গেল।

দেখা গেল ইলেকট্রন আর প্রোটন দুয়েতেই রয়েছে বৈদ্যুতিক আধান। ইলেকট্রনের আধান হল ঋণাত্মক আর প্রোটনের আধান ধনাত্মক। দু-ফে যে দুজাতের বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিলেন এই দুজাতের কণিকাই তার মূল কারণ।

অবশ্য প্রোটন কণিকার তুলনায় ইলেকট্রন কণিকা এক জিনিস থেকে আরেক জিনিসে অনেক বেশি সহজে চলাচল করতে পারে। 'ক' বস্তু থেকে যদি ইলেকট্রন চলে যায় 'খ' বস্তুতে, তাহলে 'খ' বস্তুতে ইলেকট্রনের পরিমাণ হবে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেশি, আর তাতে দেখা দেবে ঋণাত্মক আধান। 'খ' বস্তুতে যত বেশি ইলেকট্রন এসে জড় হবে, তার ঋণাত্মক আধান তত বেশি হবে। আবার 'ক' বস্তু তার ইলেকট্রন হারাবার ফলে সেখানে দেখা দেবে বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ প্রকাশ পাবে ধনাত্মক আধান। 'ক' বস্তু থেকে যত বেশি ইলেকট্রন চলে যাবে তার ধনাত্মক আধানের তীব্রতা হবে তত বেশি।

ঋণাত্মক আধানযুক্ত কোন বস্তু যদি ছোঁয়ানো যায় ধনাত্মক আধানযুক্ত কোন বস্তুর গায়ে তাহলে প্রথম বস্তুর বাড়তি ইলেকট্রন দ্বিতীয় বস্তুর ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণ করার জন্যে ছুটে আসে। এইভাবে ইলেকট্রনের পরিমাণ সমান সমান হয়ে গেলে বস্তু দুটো **আধান ত্যাগ** করে। কখনো কখনো বস্তু দুটো ছোঁয়া লাগার ঠিক আগেই ইলেকট্রনরা হাওয়ার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে একটা থেকে আরেকটায় পেরিয়ে যায়। তখন ছোট্ট একটা আলোর ঝলক দেখা যায় আর কড় কড় শব্দ শোনা যায়।

ঝড়ের সময় জমিন আর মেঘের গায়ে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ জড়ো হয়। এমনি ঝড়ের সময় যদি আধান ত্যাগ ঘটে তখন আলোর ঝলক দেখা দেয় বিজলি চমকানি হিসেবে, আর কড় কড় আওয়াজটা হয়ে দাঁড়ায় বজ্রের গর্জন। ১৭৫২ সালে এক ঝড়ের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে মেঘের কিছুটা বিদ্যুৎ মাটিতে বয়ে এনে ফ্র্যাঙ্কলিনই এ কথা প্রমাণ করেছিলেন।

কিন্তু কোন বস্তু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে তাতে ধনাত্মক আধান

banglainternet.com

জন্মাবে কেন? এর জবাব হল, প্রতিটি পরমাণুতেই রয়েছে ঋণ-বিদ্যুতের কণিকা ইলেকট্রন আর ধন-বিদ্যুতের কণিকা প্রোটন দুই-ই। সচরাচর কোন বস্তুতে এরা থাকে সমান সংখ্যায়, তাই দুরকম বিদ্যুতের প্রভাব কাটাকাটি হয়ে যায়। তাই সাধারণত সব জিনিস **আধানবিহীন**।

কোন বস্তুতে যদি কিছু ইলেকট্রন এসে ঢোকে তাহলে তাতে প্রোটনের চাইতে ইলেকট্রনের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় বেশি ; তাই ধনাত্মক আধানকে ছাপিয়ে ওঠে ঋণাত্মক আধান। আবার যদি কোন বস্তু থেকে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে তাতে ইলেকট্রনের চাইতে প্রোটনের সংখ্যা হয়ে পড়ে বেশি ; আর তখন ঋণাত্মক আধানকে ছাপিয়ে প্রকাশ পায় ধনাত্মক আধান।

দুই অসমান যমজ

ইলেকট্রন আর প্রোটন দুই-ই আকারে পরমাণুর চাইতে অনেক, অ-নে-ক ছোট। প্রায় এক লক্ষ ইলেকট্রন বা প্রোটন পাশাপাশি সাজালে তবে তা চওড়ায় একটা পরমাণুর সমান হবে।

প্রত্যেক পরমাণুতেই ইলেকট্রন আর প্রোট্রন থাকে, কমসে-কম একটা করে। কোন কোন পরমাণুতে রয়েছে একশ' তিনটা করে ইলেকট্রন আর প্রোটন। কাজেই প্রোটন আর ইলেকট্রন দুই-ই আমরা আগে যে মৌল কণিকার কথা বলেছি তাদের দলে পড়ে।

অবশ্য ইলেকট্রন আর প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধানে তফাত রয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া তাদের মধ্যে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে—এ-সম্বন্ধে জানা গিয়েছে চুম্বকের সাহায্যে তাদের পরীক্ষা করতে গিয়ে।

ছোটখাট চুম্বক যা দিয়ে সুঁই, আলপিন এবং অন্যান্য লোহা বা ইস্পাতের তৈরি ছোটখাট জিনিস টেনে তোলা যায় তা নিশ্চয়ই সবাই দেখেছ। সবচেয়ে সাধারণ চুম্বক হল একটা চুম্বকিত ইস্পাতের দণ্ড। এমনি একটা চুম্বককে যদি মাঝখান দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এটা কম্পাস-কাঁটার মতো উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকবে। যে প্রান্তটা উত্তর দিকে মুখ করে থাকে তাকে বলা হয় **উত্তর মেরু** আর যে প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে, তাকে বলে **দক্ষিণ মেরু**। এছাড়া আছে অশ্বখুর চুম্বক—সেটা আর কিছুই নয়, **দণ্ডচুম্বকের** দুটো প্রান্তকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

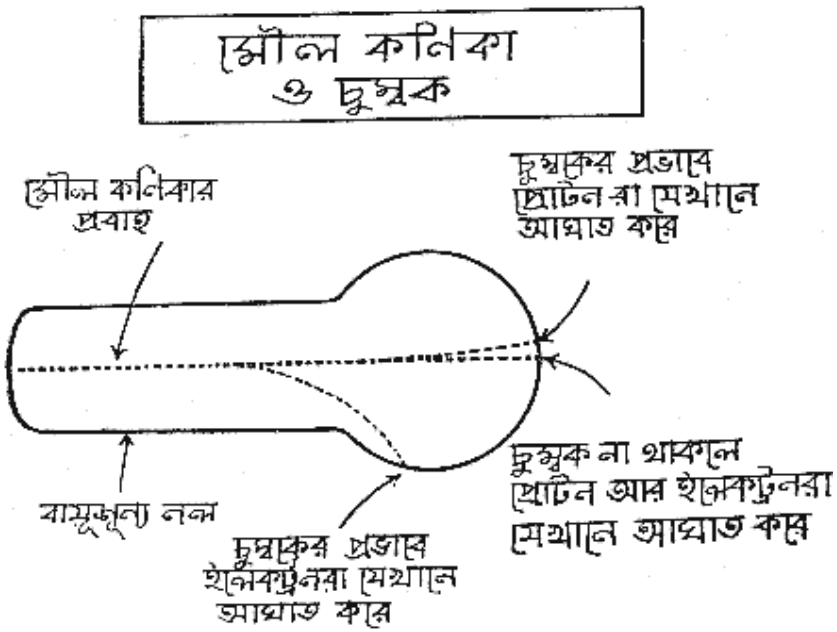

দুটো দণ্ডচুম্বক নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে একটার উত্তর মেরু অন্যটার দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। এর ফলে চুম্বক দুটো কাছাকাছি এসে গায়ে গায়ে লেগে থাকে। আবার যদি একটার উত্তর মেরুকে আরেকটার উত্তর মেরুর কাছে আনা যায় তাহলে মনে হয় চুম্বকরা তাতে বাধা দিচ্ছে ; মেরু দুটো কাছাকাছি আনতে রীতিমতো জোর লাগবে, তবু তারা গায়ে গায়ে লেগে থাকবে না। দুটো দক্ষিণ মেরুকে কাছাকাছি আনতে চাইলেও ঘটবে এমনি অবস্থা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুতের মতো চুম্বকের বেলাতেও দুই অসদৃশ পরস্পরকে আকর্ষণ করে আর দুই সদৃশ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। (আসলে বিদ্যুৎ আর চুম্বকের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক, তাই এদের এক থেকে অন্যকে আলাদা করা যায় না।)

গতিশীল ইলেকট্রন আর প্রোটনের ওপর চুম্বকের প্রভাব রয়েছে। ইলেকট্রনরা টান খায় এক দিকে আর প্রোটনরা টান খায় তার উল্টো দিকে।

banglainternet.com

আসলে এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই দুধরনের কণিকায় দুরকমের আধান রয়েছে। চুম্বকের টানে কে কোন্ দিকে ছিট্‌কে যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় ইলেকট্রনরা বয়ে বেড়ায় ঋণাত্মক আধান আর প্রোটনরা বয় ধনাত্মক আধান। একটা বায়ুশূন্য কাচনলের ভেতর দিয়ে যদি ছুঁড়ে দেওয়া যায় ইলেকট্রনের প্রবাহ তাহলে নলের প্রান্তে যেখানে কাচের গায়ে ইলেকট্রনরা গিয়ে আঘাত করে, সেখানে দেখা যায় জ্বলজ্বলে আলো। এই প্রবাহের কাছে এবার যদি একটা চুম্বক এনে হাজির করা হয়, তাহলে ইলেকট্রনদের পথ সরল রেখা থেকে বেঁকে যায়, আর সাথে সাথে আলো জ্বলা উজ্জ্বল জায়গাটাও যায় সরে।

ইলেকট্রন কণিকার প্রবাহ সরল পথ থেকে কতখানি বেঁকে যাবে, তা খানিকটা নির্ভর করে ইলেকট্রন কণিকার ওজনের ওপর। মনে কর, একটা টেনিস বল বা ক্রিকেট বল যাচ্ছে পাশ দিয়ে গড়িয়ে ; পা দিয়ে আস্তে একটু লাথি মারলেই তার পথ যাবে বেঁকে। কিন্তু যদি তার বদলে একটা বিরাট ভারি কামানের গোলা যেতে থাকে একই গতিতে তাহলে তার পথ তো বেশি বাঁকবেই না, পায়েও রীতিমতো ব্যথা লাগবে। একই ভাবে দেখা গেল চুম্বকের প্রভাবে চলন্ত ইলেকট্রনের চাইতে চলন্ত প্রোটনের পথ বাঁকে অনেক কম। এ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, নিশ্চয়ই ইলেকট্রনের চেয়ে প্রোটন অনেক ভারি কণিকা। ইলেকট্রনের পথ বেঁকে যাওয়ার সাথে প্রোটনের পথ বেঁকে যাওয়ার তুলনা করে বোঝা গেল একটা প্রোটন ১৮৩৬টা ইলেকট্রনের সমান ভারি।

এবারে একটু ভেবে দেখা যাক 'ভারি', 'ওজন' এ সব কথায় আমরা সত্যি সত্যি কি বুঝি। পৃথিবী কোন জিনিসকে তার দিকে আকর্ষণ করে বলেই ওজন দেখা দেয়। ধরা যাক, তোমার ওজন ১২০ পাউন্ড, অর্থাৎ এই পরিমাণ শক্তিতে পৃথিবী তোমাকে টানছে। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে আকারে অনেক ছোট, তাই তার **মাধ্যাকর্ষের** পরিমাণ পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগ মোটে। তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলে চাঁদ তোমাকে টানবে পৃথিবীর ওপরকার তুলনায় কম, আর সেখানে তোমার ওজন হবে মাত্র ২০ পাউন্ড। আবার পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বৃহস্পতি গ্রহে গেলে তোমার ওজন দাঁড়াবে ৩০০ পাউন্ড।

তোমার ওজন বদলাবার জন্য কিন্তু আসলে অন্য গ্রহে যাবারও দরকার নেই। যদি পানিতে সাঁতার কাটতে যাও তাহলে দেখবে তোমার ওজন অনেক হাল্‌কা মনে হচ্ছে। পানির রয়েছে **প্লবতা** শক্তি, এই শক্তি সব কিছুকে

ওপর দিকে ঠেলে ধরে। পানিতে হাত-পা ছড়িয়ে ভেসে থাকা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। এই ভেসে থাকার সময় তোমার কোন ওজনই থাকে না।

ওজনের যদি এমন হেরফের হয় তাহলে এর হিসেব নিয়ে রীতিমতো গোলমাল বাধতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা ওজনের হিসেব ধরেন কতকগুলো নির্দিষ্ট অবস্থায়—সমুদ্র সমতলে ৪৫ ডিগ্রী অক্ষাংশে বায়ুশূন্য জায়গায়।

এই সব নির্দিষ্ট অবস্থায় কোন বস্তুর ওজন হল তার **ভর**-এর সমান। ৪৫ ডিগ্রী উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে বায়ুশূন্য অবস্থায় এক পাউন্ড ভর-এর একখণ্ড কাঠ মাপলে তার ওজন হবে ঠিক এক পাউন্ড। যদি এর চারপাশে হাওয়া থাকে কিংবা মাপা হয় উঁচু পাহাড়ের ওপর তাহলে ওজন দাঁড়াবে এক পাউন্ডের চেয়ে সামান্য কম। পানির ওপর ভাসমান অবস্থায় মাপলে ওজন হবে একেবারে শূন্য। বৃহস্পতি গ্রহের ওপর এর ওজন দাঁড়াবে আড়াই পাউন্ড, সূর্যের ওপর ছাব্বিশ পাউন্ড আর চাঁদের ওপর ওজন হবে মাত্র তিন আউন্স (প্রায় দেড় ছটাক)। কিন্তু সব অবস্থাতেই কাঠের খণ্ডটির ভর কিন্তু থাকবে ঠিক এক পাউন্ড, কেননা বিজ্ঞানীদের স্থির করা ওই সব নির্দিষ্ট অবস্থায় এর ওজন দাঁড়ায় এক পাউন্ড।

বিজ্ঞানীরা ছোটখাট জিনিসের ওজন মাপার জন্য খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। কিন্তু তা বলে প্রত্যেকবার ওজন নেবার সময় তাঁদের পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া চলে না। তাঁরা সব সময় বায়ুশূন্য অবস্থায় ওজন নেন না আর সমুদ্র সমতলেও যান না। তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থায় ওজন না নিয়ে অন্য অবস্থায় ওজন নিলে যে সামান্য মাত্রায় ভুলচুক হবে তার পরিমাণ তাঁরা হিসেব করে বের করতে পারেন ; খুব সূক্ষ্মভাবে মাপ নেবার দরকার হলে এই সব মাপজোকের সাহায্যে তাঁরা হিসেবকে দরকার মতো সংশোধন করে নেন।

এ বইতে আমরা এর পর আর কোন জিনিসের ওজনের কথা না বলে বলব ভরের হিসেব। যেমন, একটা প্রোটনের ওজন ১৮৩৬টা ইলেকট্রনের ওজনের সমান এভাবে না বলে আমরা বলব একটা প্রোটনের ভর ১৮৩৬টা ইলেকট্রনের ভরের সমান।

আচ্ছা, তাহলে পাউন্ডের হিসেবে একটা প্রোটনের ভর কত? বুঝতেই পারছ, খুবই সামান্য। প্রায় ২৭,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ (২৭-এর পেছনে পঁচিশটা শূন্য)-টা প্রোটন একত্র করলে এক পাউন্ড ভর হয়। কথায় বললে বলতে হয় সাতাশ লক্ষ লক্ষ লক্ষ লক্ষ লক্ষ

banglainternet.com

অথবা দুলক্ষ সত্তুর হাজার কোটি কোটি কোটি। বুঝতেই পারছ এত বড় সংখ্যা নিয়ে কারবার করা শুধু অসুবিধেজনক নয়, রীতিমতো হাস্যকর।

তার চেয়ে বরং একটা প্রোটনের ভরকে ধরা যাক একক—অর্থাৎ ১। এর পর অন্যান্য মৌল কণিকা বা এমন কি আস্ত পরমাণুর ভরকেও প্রকাশ করা যাবে প্রোটনের সাথে তুলনা করে এই এককে। যেমন, যে পরমাণুর ভর দশটা প্রোটনের ভরের সমান তার **ভরসংখ্যা** হবে ১০; যার ভর বায়াত্তুরটি প্রোটনের সমান তার ভরসংখ্যা ধরা হবে ৭২; এমনি অন্যান্যের বেলাতেও। এভাবে পরমাণুদের ভরসংখ্যা দাঁড়াতে পারে ১ থেকে শুরু করে ২৫০-এর ওপর পর্যন্ত।

একটা ইলেকট্রনের ভরসংখ্যা, বুঝতেই পারছ, ১-এর চেয়ে অনেক কম হবে, কেননা এর ভর প্রোটনের তুলনায় অনেক কম। বলতে কি, ইলেকট্রনের ভরসংখ্যা (১/১৮৩৬) এতই কম যে অনেক সময় তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরা হয় না।

প্রোটনের ভর যেহেতু ইলেক্ট্রনের চাইতে অনেক বেশি, কাজেই মনে হতে পারে যে এতে বুঝি বৈদ্যুতিক আধানও থাকে বেশি। আসলে কিন্তু তা নয়। একটা ইলেকট্রনে রয়েছে যতখানি আধান, একটা প্রোটনেও আধান রয়েছে ঠিক ততখানিই। প্রোটনের আধান ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক, শুধু এই যা তফাত।

তাহলে একটা ইলেকট্রন বা প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধানের পরিমাণ কত? এই সব কণিকারা ঠিক কতখানি করে বিদ্যুৎ বয়ে বেড়ায়?

এই পরিমাণটাকে যদি আমরা সাধারণ হিসেবের একক দিয়ে প্রকাশ করতে যাই, তাহলে একটা বেখাপ্পা রকমের ছোট সংখ্যা এসে পড়বে। একটা বিজলি বাতির বাল্‌ব্‌কে মাত্র এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় জ্বালিয়ে রাখতেও বহু লক্ষ কোটি ইলেকট্রনের সব আধান খোয়াতে হয়। হিসেবের সুবিধের জন্যে বিজ্ঞানীরা তাই একটা প্রোটন বা ইলেক্ট্রনের আধানকেই একক বা ১ বলে ধরেন। প্রোটনের আধান ধনাত্মক, তাই এর বৈদ্যুতিক আধানকে ধরা হয় +১ বলে; কাজেই ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধান দাঁড়ায় —১।

ইলেকট্রনের ভর এত কম বলেই তারা অতি সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করতে পারে। প্রোটনের ভর বেশি, তাই তার নড়া-

চড়াও একটু আয়েসী—সহজে নিজের জায়গা ছাড়তে চায় না। আমরা বিজলির যত রকম প্রভাব আমাদের চারপাশে দেখি—টর্চ লাইট জ্বালানো থেকে টেলিভিশনের ছবি দেখা পর্যন্ত—তার সব কিছুরই মূলে রয়েছে চলন্ত ইলেকট্রন।

কোন কোন জিনিসের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন খুব সহজে চলে যেতে পারে; এ ধরনের জিনিসকে বলা হয় **পরিবাহী**। তামা একটা খুব ভাল পরিবাহী, তাই বিজলির তার বেশির ভাগই তামার তৈরি। আবার কতকগুলো জিনিস তাদের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন যেতে দেয় না বা দেয় খুব কম পরিমাণে; এদের বলা হয় **অন্তরক**। কতকগুলো সাধারণ অন্তরকের দৃষ্টান্ত হল রবার, রেশম, গালা, কাচ আর গন্ধক। বিদ্যুৎ বইবার তামার তারের ওপর রবার বা রেশমের আবরণ দেওয়া থাকে, যাতে সেই তার নাড়াচাড়া করতে বিপদ না ঘটে। অন্তরকের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে দেহের ক্ষতি করতে পারে না, তাই নিরাপদে সে তার ধরা যায়।

উদাসীন কণিকা

পরমাণুতে প্রধানত তিন রকমের মৌল-কণিকা দেখা যায়। তার মধ্যে প্রোটন আর ইলেকট্রনের আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৯০ সালের পর পর; তৃতীয় জাতের কণিকার আবিষ্কার ১৯৩০ সালের আগে সম্ভব হয়নি।

দেরির কারণ হল এই তৃতীয় জাতের কণিকার কোন আধান নেই। ইলেকট্রন আর প্রোটনদের আধান আর তাদের ওপর চুম্বকের প্রভাবের জন্যেই এদের নিয়ে পরীক্ষা করতে সুবিধে।

বিজ্ঞানীরা এসব কণিকার গতি কি করে পরীক্ষা করেন তার গোটা দুই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মনে কর, একটি পাত্রে আছে ভেজা হাওয়া, তাতে একটা পিস্টন লাগানো—যেটা টেনে ওপরে তোলা যায়। পিস্টন যখন টেনে তোলা হয় তখন হাওয়া প্রসারিত হয়; আর হাওয়া প্রসারিত হলে তাপমাত্রা যায় কমে।

হাওয়ার তাপমাত্রা কমলে তাতে আগের মতো আর বেশি জলীয়বাষ্প ভেসে থাকতে পারে না, তাই খানিকটা জলীয়বাষ্প জমে ফোঁটা ফোঁটা পানির বিন্দু তৈরি করে। সচরাচর এমনি পানির ফোঁটা তৈরি হয় সূক্ষ্ম ধুলোর ওপর ভর করে।

হাওয়ায় যদি ধুলোর কণা মোটেই না থাকে তাহলে বৈদ্যুতিক আধান-

banglainternet.com

যুক্ত অণু বা পরমাণুর গায়েও পানির ফোঁটা জমতে পারে। এমনি আধানযুক্ত অণু বা পরমাণুকে বলা হয় **আয়ন**। সাধারণ হাওয়ায় তেমন বেশি আয়ন থাকে না, কিন্তু প্রোটন বা ইলেকট্রন যখন হাওয়ার ভেতর দিয়ে যায় তখন তার পথে রেখে যায় অসংখ্য আয়ন।

পাত্রের হাওয়ায় যদি ধুলোর কণা না থাকে আর তার ভেতর দিয়ে প্রোটন বা ইলেকট্রন চলে যাবার মুহূর্তে যদি হাওয়াকে প্রসারিত করা যায় তাহলে আয়নের গায়ে জমবে পানির সূক্ষ্ম ফোঁটা। এই সব পানির ফোঁটা দেখে বোঝা যাবে কোন্ পথে গিয়েছে চলন্ত কণিকাটি। এই চলন্ত পথের ফটো তুলে নিয়ে কণিকার গতির হিসেব-নিকেশ করা যায়।

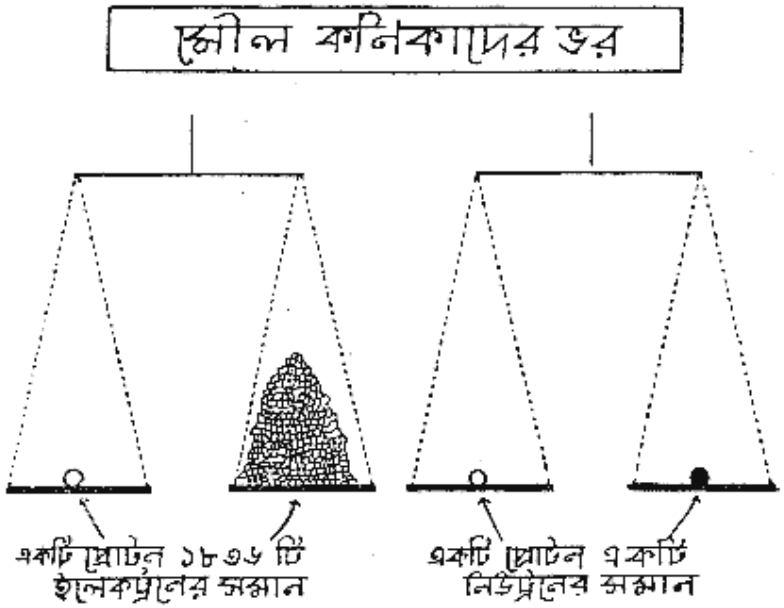

ভেজা বাতাসের মেঘ থেকে সূক্ষ্ম পানির ফোঁটার রেখা তৈরি হয় এমনি যে যন্ত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছে **মেঘ-কক্ষ**। এটা আবিষ্কার করেছিলেন

banglainternet.com

স্কটল্যান্ডের পদার্থবিদ চার্লস উইলসন (Charles T. R. Wilson) ১৯১১ সালে। এর জন্যে উইলসন ১৯২৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯৫২ সালে এমনি ধরনের আরেক যন্ত্র তৈরি করেন মার্কিন পদার্থ-বিদ ডোনাল্ড গ্লেজার (Donald A. Glaser)। তিনি নিলেন এমন এক গরম তরল পদার্থ যা শুধু বন্ধ পাত্রে চাপে রাখার জন্যেই টগবগ করে ফুটতে পারছে না। চাপ কমিয়ে দিলে তরল পদার্থ সঙ্গে সঙ্গেই ফুটতে শুরু করবে, আর তার ভেতর উঠতে থাকবে বাষ্পের বুদবুদ। এই বাষ্পের বুদবুদ আয়নের গায়ে তৈরি হয় খুব সহজেই।

চাপ কমিয়ে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি কোন মৌল কণিকা ছুটে যায় তরল পদার্থের ভেতর দিয়ে, তাহলে তার পথে সৃষ্টি হবে অসংখ্য আয়ন। এই সব আয়নের চারপাশে জমবে বাষ্পের বুদবুদ আর এই বুদ-বুদের রেখা দিয়ে কণিকার চলে যাওয়া পথটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে। এই **বুদবুদ-কক্ষ** আবিষ্কারের জন্যে গ্লেজার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬০ সালে।

এই কক্ষগুলোকে যদি রাখা হয় চুম্বকের কাছে তাহলে আধানযুক্ত কণিকাগুলো চলবে বাঁকানো পথে আর ফোঁটা বা বুদবুদের রেখাও হবে বাঁকানো। ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণিকার পথ বেঁকে যাবে একদিকে আর ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন কণিকার পথ বেঁকে যাবে তার উল্টো দিকে। কণিকা হাল্কা হলে তার পথের রেখা হবে সরু, আর সেটা বাঁকবেও বেশি পরিমাণে ; ভারি কণিকার পথের রেখা হবে মোটা, সেটা বাঁকবেও কম পরিমাণে।

এ ধরনের পথের রেখা থেকে এসব কণিকা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। আধানবিহীন কণিকা যখন কোন বস্তুর ভেতর দিয়ে ছুটে যায়, তখন কোন আয়ন সৃষ্টি করে না। আর সেজন্যেই এর পথের নিশানা পানির ফোঁটা বা বুদবুদের রেখার সাহায্যে দেখতে পাবার কোন উপায় থাকে না। আদতে মৌল কণিকাদের হদিস করবার যত রকমের যন্ত্র সবগুলোই এদের খবর পায় আয়নের সাহায্যে। আধানবিহীন কণিকা তাই এসব যন্ত্রে ধরা পড়বার কথাও নয়।

এবার প্রশ্ন হবে, তাহলে এ রকম কণিকার অস্তিত্ব আদৌ ধরা পড়ল কি করে? এর জবাব হল বিজ্ঞানীরা এমন কতকগুলো কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করলেন যার কারণ আধানবিহীন কণিকার অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন রকম-

ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে মনে মনে কল্পনা কর একটা অন্ধকার মঞ্চ, তার ওপর এক যাদুকর অনেকগুলো মুগুর একসাথে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে ধরার খেলা দেখাচ্ছে। মনে করা যাক, তার কতকগুলো মুগুরে লাগানো আছে জ্বলজ্বলে লাল রঙ আর কতকগুলোতে লাগানো আছে জ্বল-জ্বলে সবুজ রঙ—তাহলে এগুলোকে মোটামুটি ইলেকট্রন আর প্রোটনের প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে। এগুলোকে দেখতে পাওয়া যাবে তাদের রঙের জন্যে। এখন সেই যাদুকরের যদি আর কটি মুগুর থাকে যাতে কোন রঙ লাগানো নেই তাহলে সেগুলোকে অন্ধকারে মোটেই দেখতে পাওয়া যাবে না।

মনে কর, খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ এমনি একটা নিরঙা অদৃশ্য মুগুর যাদুকরের হাত ফস্‌কে হঠাৎ এসে পড়ল তোমার মাথায়। আর অমনি তোমার মনে হবে চোখে দেখা না গেলেও যাদুকরের হাতে নিশ্চয়ই তৃতীয় এক ধরনের মুগুর রয়েছে।

১৯৩০ সালের পর পর দেখা গেল বস্তু থেকে এমন এক ধরনের রশ্মি সৃষ্টি করা যায় যা দেখতে পাবার উপায় নেই : তার চলার পথে মেঘকক্ষ রাখলেও তাতে কোন পথের রেখা ফুটে ওঠে না।

কিন্তু কিছু একটা যে সেখানে রয়েছে তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই, কেননা এই রশ্মির পথে **মোম** রাখলে সেই মোম থেকে ছিটকে বেরোতে লাগল প্রোটন কণিকার প্রবাহ। এই প্রোটন কণিকাদের অস্তিত্ব সহজেই বোঝা গেল। কিন্তু এই প্রোটন কণিকাদের মোমের ভেতর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে কিসে? প্রোটন রীতিমতো ভারি কণিকা ; ইলেকট্রন বা আলোর ঢেউ-এর মতো হাল্‌কা কোন কিছু যে এদের এভাবে ছুঁড়ে দিতে পারবে তার সম্ভা-বনা খুবই কম। খুব সম্ভব যা এদের ছুড়ে দিচ্ছে তাও রীতিমতো ভারি কিছু।

অবশেষে ১৯৩২ সালে জেমস চ্যাড্‌উইক (James Chadwick) নামে এক ইংরেজ পদার্থবিদ ঘোষণা করলেন এ ব্যাপারটার একমাত্র ব্যাখ্যা হল এই রহস্যময় রশ্মিতে রয়েছে প্রায় প্রোটনের মতোই ভরবিশিষ্ট আধান-বিহীন কণিকা। এ ধরনের আধানবিহীন কণিকাদের নাম দেওয়া হল **নিউট্রন**। এই আবিষ্কারের জন্যে চ্যাড্‌উইক ১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

banglainternet.com

নিউট্রন নামটা এল এই জন্যে যে এই নতুন কণিকাগুলো "নিউট্রাল" অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা উদাসীন। এদের না আছে ধনাত্মক আধান না ঋণাত্মক আধান ; এরা এদিকেও না ওদিকে না। নিউট্রনের ভর প্রায় হুবহু প্রোটনের ভরের সমান ; তাই এর ভরসংখ্যা হল ১।

এবার আমরা পরমাণুর মধ্যে যে তিন জাতের মৌল কণিকা পাওয়া গেল তাদের বিভিন্ন গুণাগুণ নিয়ে একটা ছোট্ট তালিকা তৈরি করতে পারি:

	ভরসংখ্যা	আধান
প্রোটন	১	+১
ইলেকট্রন	০ (প্রায়)	—১
নিউট্রন	১	০

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের জানা সব চাইতে ছোট আকারের জিনিসের মধ্যে পড়ে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। দুনিয়ার সব জিনিসই এই তিন প্রধান জাতের কণিকা দিয়ে তৈরি। এর পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব পরমাণুর মধ্যে এই কণিকাগুলো কিভাবে সাজানো থাকে আর তাতে কি করে নানা জাতের পরমাণুর সৃষ্টি হয়।

পরমাণুর গড়ন

ভারি কেন্দ্র

ভারি কতকগুলো মৌল কণিকার প্রবাহ ফটোর প্লেটে গিয়ে পড়লে কি হয় ১৯০৬ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী তা নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ফটোর প্লেটটাকে ডেভেলপ করে দেখা গেল কণিকাগুলো যেখানে আঘাত করেছে সেখানে ফুটে উঠেছে একটা কালো দাগ। এর পর কণিকাদের প্রবাহের পথে রাখলেন তিনি মাত্র এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ পুরু অতি হাল্কা সোনার পাত। এর ফলে সেই কালো দাগের তেমন কিছু পরিবর্তন হল না—অর্থাৎ যেন প্রায় সব কণিকাই সোনার পাত সরাসরি ভেদ করে গিয়ে পড়ছে ফটোর প্লেটে। কিন্তু এবার সেই কালো দাগের চারপাশে দেখা গেল গোল হয়ে পড়েছে একটা অতি হাল্কা কালো দাগ—যেন অল্প কিছু কণিকা সোনার পাত থেকে ঠিকরে সরে গিয়ে পড়েছে অন্য জায়গায়।

ব্যাপারটার কারণ খুঁজতে গিয়ে মাত্র একটাই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

সোনার পাতটা খুব পাতলা হলেও ওইটুকু জায়গার ভেতর রয়েছে প্রায় দুহাজার সোনার পরমাণু আর তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রোটন কণিকাগুলো। এ থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন, সোনার পরমাণুর প্রায় সবটাই তৈরি খুব হাল্কা কণিকা দিয়ে, তাই ভারি কণিকা তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারে। তিনি বললেন, পরমাণুর আদত ভরটা জড়ো হয়ে রয়েছে তার মাঝখানে একটা ছোট কেন্দ্রে।

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হলে মনে মনে কল্পনা কর, কতকগুলো ছোট ছোট সীসের গুলি হাওয়ায় ঝোলানো আছে ; তাদের মাঝে মাঝে আছে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা। এবার মনে কর, কতকগুলো ধাতুর খণ্ড এই সীসের গুলিগুলোর গায়ে এলোপাথাড়ি ছোঁড়া হচ্ছে। বেশির ভাগ ধাতুর খণ্ডই সীসের গুলির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে। তবে মাঝে মাঝে দুয়েকটি ধাতুর খণ্ড গিয়ে ধাক্কা খাবে কোন-না-কোন সীসের গুলির গায়ে আর ছিট্‌কে সরে যাবে একটু অন্য দিকে।

পরমাণুর মধ্যেও অবস্থাটা হয় তেমনি। ভারি কণিকাগুলো সব দলা পাকানো আছে পরমাণুর একেবারে কেন্দ্রে। এইভাবে জোট বাঁধা কণিকাগুলো মিলিয়ে তৈরি হয় পরমাণুর **নিউক্লিয়াস** বা **কেন্দ্র**। পরমাণুর বাকি অংশটা অতি হাল্কা কণিকা দিয়ে তৈরি। আমাদের আগের উপমায় সীসের গুলির মধ্যেকার হাওয়ার মতো, কঠিন পদার্থের মধ্যেকার পাশাপাশি পরমাণু-কেন্দ্রের মাঝখানে ইলেকট্রনরা সৃষ্টি করেছে ফাঁকা জায়গা। ছুটন্ত মৌল কণিকারা সচরাচর পরমাণুর ভেতরকার এই ইলেকট্রনদের এলাকা পেরিয়ে যায় বিনা বাধায়। তবে বহু হাজারে একটা কণিকা হয়তো মাঝখানের কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত করে, আর ঠিকরে সরে যায় অন্য দিকে।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আস্ত পরমাণুর চাইতে মৌল কণিকারা অনেক ছোট। এতে বোঝা যায় সমগ্র পরমাণুর খুব ছোট্ট একটা অংশ জুড়ে থাকে তার কেন্দ্র। সব চাইতে জটিল পরমাণুর কেন্দ্রে দলা পাকিয়ে থাকে প্রায় ২৫০টা কণিকা। তবু এমনি দলা পাকানো কেন্দ্র ৭০০০টা পাশাপাশি রাখলে তবে তা চওড়ায় একটা পরমাণুর সমান হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা পরমাণু যদি হয় ফুটবলের সমান, তাহলে এর কেন্দ্র হবে চওড়ায় মোটে এক ইঞ্চির পাঁচ শ' ভাগের এক ভাগ—অর্থাৎ এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যাবে না।

পরমাণুর কেন্দ্র এত কম জায়গা দখল করে থাকলেও পরমাণুর মোট

banglainternet.com

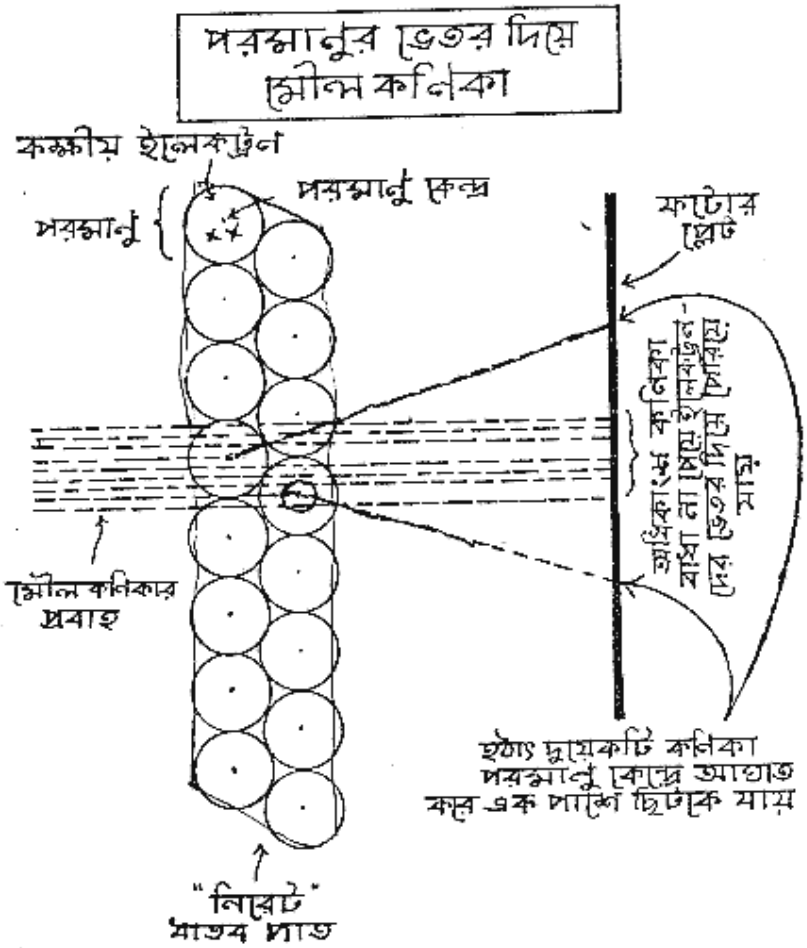

ভরের প্রায় সবটাই রয়েছে এই কেন্দ্রে। পরমাণুর ভরের শতকরা ৯৯.৯৫ ভাগ—কখনো তার চেয়েও বেশি—রয়েছে এই ছোট্ট কেন্দ্রটাতে।

পরমাণুর কেন্দ্র আর পরমাণু সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আবিষ্কারের জন্যে রাদারফোর্ড ১৯০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

প্রথমটায় নানান জাতের পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যে যে কি তফাত সে সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। ১৯১৩ সালে ইংরেজ পদার্থবিদ হেনরি মোজ্‌লে (Henry G. J. Moseley) এ ব্যাপারে একটা বড় রকম আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখালেন প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রেই রয়েছে ধনাত্মক আধান। এতেই প্রথম বোঝা গেল পরমাণু-কেন্দ্রে নিশ্চয়ই প্রোটন রয়েছে। (মোজ্‌লে এই আবিষ্কারের জন্য নির্ঘাত নোবেল পুরস্কার পেতেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি ১৯১৫ সালে নিহত হন)।

পরমাণু-কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক আধান অনুসারে তাতে যতগুলো প্রোটন থাকার কথা, ততগুলো প্রোটনের ভর যোগ করে হল কেন্দ্রের ভরের চেয়ে অনেক কম। তাই ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার সাথে সাথে ভের্নার কার্ল হাইসেনবার্গ (Werner Karl Heisenberg) নামে এক জার্মান পদার্থবিদ বললেন, পরমাণুর কেন্দ্রে নিশ্চয়ই নিউট্রনও রয়েছে।

যখন বোঝা গেল, পরমাণু-কেন্দ্র প্রোটন আর নিউট্রন কণিকা মিলিয়ে তৈরি তখন সহজেই কেন্দ্রের ভর আর আধানের হিসেব মেলানো সম্ভব হল।

বলা বাহুল্য, পরমাণু কেন্দ্রের ভর নির্ভর করে তাতে মোট প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যার ওপর। প্রোটন আর নিউট্রন দুয়েরই ভরসংখ্যা ১, কাজেই এদের মোট সংখ্যা যোগ করলেই পাওয়া যায় সেই পরমাণু কেন্দ্রের ভরসংখ্যা। যে পরমাণুর কেন্দ্রে আছে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন তার ভরসংখ্যা হল ৪। পরমাণু কেন্দ্রে ৮টি প্রোটন আর ৮টি নিউট্রন থাকলে তার ভর-সংখ্যা হবে ১৬। ইউরেনিয়ামের প্রোটন আছে ৯২টি আর নিউট্রন আছে ১৪৬টি তার ভরসংখ্যা ২৩৮।

পরমাণু কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক আধানের হিসেব করা এর চেয়েও সোজা। নিউট্রনের আদৌ কোন আধান নেই, তাই তাদের ধর্তব্যের মধ্যে না নিলেও চলে। কেন্দ্রের প্রত্যেকটা প্রোটনের আধান হল +১। কাজেই কেন্দ্রের মোট আধানের পরিমাণ হল, তাতে যতগুলো প্রোটন রয়েছে তার সংখ্যার সমান। যে পরমাণু কেন্দ্রে রয়েছে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন তার মোট আধান হল +২। যাতে আছে ৮টা প্রোটন আর ৮টা নিউট্রন তার আধান +৮। আর যেটাতে প্রোটন ৯২টা আর নিউট্রন ১৪৬টা তার আধানের পরিমাণ +৯২।

পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাকে বলা হয় **পারমাণবিক সংখ্যা**। মনে

banglainternet.com

রাখবে, ভরসংখ্যা আর পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু এক জিনিস নয়। ভরসংখ্যা হল পরমাণু কেন্দ্রের মোট ভরের পরিমাণ—কেন্দ্রের সবগুলো প্রোটন আর নিউট্রন কণিকাকে একসাথে করে। পারমাণবিক সংখ্যা হল পরমাণু কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক আধানের পরিমাণ, আর শুধু তাতে যে ক'টা প্রোটন রয়েছে সেই সংখ্যার সমান।

কোন পরমাণু কেন্দ্রের পারমাণবিক সংখ্যা আর ভরসংখ্যা জানা থাকলে খুব সহজেই তাতে ক'টা প্রোটন আর ক'টা নিউট্রন আছে তার হিসেব বের করা যায়। মনে কর, কেউ বলল একটি পরমাণু কেন্দ্রের পারমাণবিক সংখ্যা ২০ আর ভরসংখ্যা ৪২। তাহলে এর পারমাণবিক সংখ্যা যখন ২০ তখন এই কেন্দ্রে নিশ্চয়ই ২০টা প্রোটন রয়েছে। এর ভরসংখ্যা ৪২ হতে হলে ২০টা প্রোটন ছাড়া আরো ২২টা নিউট্রন থাকা দরকার। এমনি করে পুরো হিসেব মিলে গেল!

ফাঁপানো বাকি অংশ

ছোট্ট কেন্দ্রের চারপাশে পরমাণুর বাকি অংশটা তৈরি ইলেকট্রন দিয়ে। পরমাণুর মধ্যেকার এসব ইলেকট্রনকে কখনো কখনো বলা হয় **কক্ষীয় ইলেকট্রন**। তার কারণ হল প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, সৌরজগতে গ্রহগুলো যেমন সূর্যের চারপাশে কক্ষপথে ঘোরে, পরমাণুর কেন্দ্রের চারপাশেও তেমনি ইলেকট্রনগুলো বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। পরে দেখা গেল ব্যাপারটা অত সোজা আর সাদাসিধে নয়। ইলেকট্রনের গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আধুনিক ধারণার কথা বলতে গেলে জটিল গণিতের হিসেব এসে পড়বে; আপাতত আমাদের সে ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। সহজভাবে বোঝার জন্যে, সূর্যের চারপাশে গ্রহদের কক্ষপথে ঘোরার মতো ইলেকট্রনরাও পরমাণু কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে এই ধারণাতেই মোটামুটি কাজ চলবে।

সাধারণ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা ওই পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সমান; অর্থাৎ ইলেকট্রনের সংখ্যা আর পারমাণবিক সংখ্যা একই।

একটা পরমাণুর কেন্দ্রে যদি থাকে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন, তাহলে তার চারপাশে ঘুরবে দুটো ইলেকট্রন। কোন পরমাণুর কেন্দ্রে ৮টা প্রোটন আর ৮টা নিউট্রন থাকলে তার চারপাশে ঘুরবে ৮টা ইলেকট্রন। আবার কেন্দ্রে প্রোটন ৯২টা আর নিউট্রন ১৪৬টা হলে তার চারপাশে ঘুরতে থাকবে ৯২টা ইলেকট্রন।

এবার ইলেকট্রনদের আধানের কথা চিন্তা করা যাক। পরমাণুতে ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ নির্ভর করবে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপরে। প্রত্যেক ইলেকট্রনের আধান হল —১। দুটো ইলেকট্রনের মোট আধান হবে —২, আটটা ইলেকট্রনের —৮ আর ৯২টা ইলেকট্রনের মোট —৯২।

আমরা আগেই দেখেছি, একটা সাধারণ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা তার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সমান। তাতে বোঝা যায়, পরমাণুর বাইরের অংশে ঋণাত্মক আধান হুবহু তার কেন্দ্রে ধনাত্মক আধানের সমান। কাজেই এমনি পরমাণুর মোটমাট আধান দাঁড়ায় একদম শূন্য। পরমাণুতে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক বিদ্যুৎ থাকে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু দুই-ই সমান সমান পরিমাণে থাকে বলে তাদের প্রভাব কাটাকাটি হয়ে যায়। তাই শেষমেষ গোটা পরমাণুটা হয়ে দাঁড়ায় আধানবিহীন বা **উদাসীন পরমাণু**।

এবার ধরা যাক, ইলেকট্রনদের ভরের কথা। ইলেকট্রনদের ভর অতি সামান্যই। আমাদের জানার মধ্যে সবচেয়ে জটিল পরমাণুতে থাকে ১০৩টি ইলেকট্রন। এই সবগুলো ইলেকট্রনের ভর যোগ করলেও হয় একটা প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের মাত্র বিশ ভাগের এক ভাগের মতো। সেই জন্যেই কখনো কখনো বলা হয় "পরমাণুর বেশির ভাগ জায়গাই থাকে একেবারে ফাঁকা।"

তা বলে যেন ভেবো না যে, ইলেকট্রনরা নেহাত অপ্রয়োজনীয়। আসলে ইলেকট্রনরা মোটেই ফাঁকা জায়গা নয়। প্রথমত, তাদের আধান পরমাণু কেন্দ্রের আধানকে নিরপেক্ষ করে। দ্বিতীয়ত, তারা ছুটন্ত মৌল-কণিকা ঠেকাতে না পারলেও পরমাণু কেন্দ্রকে তারা অন্য পরমাণু থেকে আড়াল করে রাখে। দুটি পরমাণুতে যখন ধাক্কা লাগে তখন দুয়ের একেবারে বাইরের ইলেকট্রনদের খোলসে ঠোকাঠুকি হয়ে তারা ঠিকরে ফিরে যায়।

এই ধাক্কার ফলে কিন্তু বাইরের খোলসের ইলেকট্রনগুলোকে খানিকটা শাস্তি পেতে হয়। ধাক্কার ফলে, তাপের দরুন বা অন্য কারণে একটি, দুটি বা তিনটি বাইরের ইলেকট্রন পরমাণু থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে।

খুব বিশেষ অবস্থায় ভেতরকার ইলেকট্রনগুলোও ছিটকে বেরিয়ে পড়তে পারে। আমাদের সূর্য এবং অন্যান্য তারার ভেতরে, যেখানে তাপমাত্রা ওঠে বহু কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, সেখানে এ রকম ঘটে। সেখানে পরমাণু থেকে সব ইলেকট্রনই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। (মাত্র অল্পদিন আগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে এ অবস্থা ঘটাতে পেরেছেন।)

banglainternet.com

যেসব তারার ভেতর পরমাণুর সব কক্ষীয় ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায় সেখানে খালি কেন্দ্রগুলো পরমাণুর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় পরস্পরের অনেক বেশি কাছাকাছি আসতে পারে। এ রকম পরমাণু কেন্দ্রের সমষ্টিকে বলা হয় **বিধ্বস্ত বস্তু** ; কেননা কক্ষীয় ইলেকট্রনদের বেড়া না থাকায় সে বস্তুর পরমাণুগুলো বিধ্বস্ত হয়ে তার কেন্দ্রগুলো প্রায় পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে যায়।

বিধ্বস্ত বস্তুর আয়তন হয়ে দাঁড়ায় অতিমাত্রায় কম। আমাদের সমগ্র পৃথিবীর সবগুলো পরমাণু থেকে যদি সব ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যেত আর খোলা কেন্দ্রগুলো বিধ্বস্ত বস্তুর অবস্থায় পৌঁছত তাহলে সমস্তটা পৃথিবীর বস্তু হত মাত্র এক মাইল ব্যাসের একটা গোলকের সমান।

অথচ পরমাণু কেন্দ্রেই রয়েছে তার প্রায় সবটা ভর। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিধ্বস্ত বস্তুর আয়তন বহু গুণে ছোট হলেও তাতে আদি বস্তুর ভর থাকবে প্রায় সবটাই। পৃথিবীর বস্তু বিধ্বস্ত হয়ে যদি মাত্র এক মাইল চওড়া একটা গোলকে পরিণত হয় তাহলে তারও ভর হবে আস্ত পৃথিবীর ভরের সমানই। একদানা বালির সমান বিধ্বস্ত বস্তুর ভর বেশ কয়েক শ' টন হতে পারে।

সূর্য এবং অন্যান্য সাধারণ তারা (যার এক একটার ভর বহু লক্ষ পৃথিবীর সমান) কেন্দ্রে এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে যে, সেখানে সামান্য পরিমাণে বিধ্বস্ত বস্তু সৃষ্টি হয়। **শ্বেত-বামন** নামে এক বিশেষ জাতের তারা আছে, সেগুলো প্রায় আগাগোড়াই বিধ্বস্ত বস্তু দিয়ে তৈরি। এদের 'বামন' বলা হয় এই জন্যে যে, সাধারণ তারাদের তুলনায় এদের আকার নেহাতই ছোট। এদের কোন কোনটা এমন কি পৃথিবীর চেয়েও ছোট। কিন্তু আকারে ছোট হলেও এদের ভর আর আর তারাদের মতোই।

তাহলে বুঝতেই পারছ, আমাদের চারপাশের বস্তু যে হাল্কা আর ফাঁপানো তার মূলে রয়েছে পরমাণুর ইলেকট্রনরা। ইলেকট্রনদের ভর কম হলেও এরা যথেষ্ট জায়গা নিয়ে থাকে আর ভারি ভারি পরমাণু কেন্দ্রগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব বজায় রাখে।

নানা জাতের পরমাণু

পরমাণুরা সচরাচর একে অন্যের সাথে জোট বেঁধে থাকে ; এসব জোটকে বলা হয় **অণু**। কতকগুলো অণু রীতিমতো ছোট। যেমন হাওয়ায় যেসব

অণু আছে তার প্রায় সবগুলোই মাত্র দুটি করে পরমাণুর জোট। অবশ্য তেমনি আবার রীতিমতো বড় অণুও রয়েছে ; আমাদের শরীর তৈরি যে সব অণুতে তার কোন-কোনটা হাজার হাজার পরমাণুর জোট।

অণুরা সব সময়ই চলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যেমন, আমাদের চারপাশে হাওয়ায় যে সব অণু আছে তারা হরদম ছুটছে অন্তত ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে। এমন কি কঠিন পদার্থ নিরেট গতিশূন্য মনে হলেও তার অণুগুলো অনবরত কাঁপছে এদিক-সেদিক। তাপমাত্রা যত বেশি এই অণুদের ছুটো-ছুটিও তত বেশি।

স্বভাবতই এমনি ছুটোছুটি করতে থাকলে অণুদের পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লাগবেই। প্রত্যেক মিনিটে বহু লক্ষ বা কোটিবার এমনি ধাক্কাধাক্কি লাগতে পারে। ধাক্কা খাওয়া অণুগুলি অনেক সময় কোন কিছু না খুইয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। তবে কখনো কখনো তাদের কিছু খোয়াতেও হয়। হয়তো ধাক্কা খাওয়া একটি অণু থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল একটি কি দুটি পরমাণু, কিংবা যে অণুর সাথে ধাক্কা লাগল তার সাথে বদলাবদলি হয়ে গেল একটি-দুটি পরমাণু। কখনো আবার ধাক্কা খাওয়া একটি অণু অন্য অণুর গায়ে সেঁটে গিয়ে নতুন একটা বড়সড় অণু তৈরি করে। এমনি আরো নানা কিছুই ঘটতে পারে।

এসব পরিবর্তন প্রায়ই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ধাক্কা খাওয়া অণুদের আমরা দেখতে পাইনে সত্যি, কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার ফল যা হয় তা আমরা বেশ দেখতে পাই। হয়তো একটা হজমী ওষুধের গুঁড়ো বা বড়ি পানিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পানির অণুদের সাথে ওষুধের অণুদের বেজায় ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল। তার ফলে সৃষ্টি হল ভস্‌ভস্‌ শব্দ আর উঠতে লাগল প্রচুর বুদবুদ। একটুকরো লোহার অণুদের সাথে হাওয়ার অণুদের ধাক্কাধাক্কি লাগে, তার ফলে আমরা দেখি লোহাতে মরচে ধরেছে। অ্যাসিডের অণুদের সাথে একখণ্ড তামার অণুদের লাগে ধাক্কাধাক্কি, তাই তামার খণ্ড হয়ে যায় সবুজ।

তাপমাত্রা বাড়ালে অণুদের ছুটোছুটি যায় বেড়ে ; তখন তাদের মধ্যেকার ধাক্কাধাক্কি সংখ্যায় বাড়ে আর হয়ও আগের চেয়ে জোরেসোরে। পরিবর্তনও দেখা দেয় তাড়াতাড়ি। কাগজ দপ করে জ্বলে ওঠে। কাঠ ঝল্‌সে যায়, তার-পর পোড়ে। ডিনামাইটে বিস্ফোরণ ঘটে।

banglainternet.com

অণুদের ধাক্কাধাক্কি থেকে এমনি যেসব পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের বলা হয় **রাসায়নিক বিক্রিয়া**।

রসায়নবিদরা এসব রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করেন আর বোঝার চেষ্টা করেন কোন্ ধরনের ধাক্কাধাক্কিতে কোন্ অণুর চালচলন কেমন ধারা হবে। এ থেকে তাঁরা বুঝতে পারেন এই অণুতে কোন্ কোন্ জাতের পরমাণু রয়েছে। দেখা যায়, অণুতে কোন পরমাণুর চালচলন নির্ভর করে তাতে ক'টা ইলেকট্রন রয়েছে তার ওপরে। দুটো পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি হুবহু সমান হয় তাহলে তাদের চালচলনও একই রকম হবে।

আমরা আগেই দেখেছি, উদাসীন পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা হল তার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার সমান। এই জন্যে রসায়নবিদরা পরমাণুদের তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে ভাগ করেন। যেসব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা সমান, তাদের চালচলন সব একই রকমের। বিভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যার পরমাণুদের চালচলন আলাদা রকমের।

সবচেয়ে সরল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা হল ১। আমাদের জানামতো সবচেয়ে জটিল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১০৩। এর মাঝামাঝি যত সংখ্যা আছে তার প্রত্যেকটাই কোন জাতের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রসায়নবিদরা ঠিক ১০৩ রকমের বিভিন্ন জাতের পরমাণুর হদিস পেয়েছেন। তাঁরা এই ১০৩ জাতের বিভিন্ন পরমাণুর আলাদা আলাদা নাম রেখেছেন ; আর এদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ বা **মৌল**।

কয়েকটি মৌলের নমুনা

ধরা যাক, সবচাইতে সরল পরমাণুর কথা। এর পারমাণবিক সংখ্যা ১, অর্থাৎ এতে ইলেকট্রন আছে মোটেই একটা। এ রকম পরমাণুকে রসায়নবিদরা নাম দিয়েছেন হাইড্রোজেন। (হাইড্রোজেন নামটা এসেছে দুটো গ্রীক শব্দ থেকে, যাদের অর্থ 'পানি তৈরি করা'। অধিকাংশ মৌল এবং অনেক রাসায়নিক বস্তুর নামও এসেছে গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ থেকে। এসব নাম কখনো বোঝায় বস্তুটির গুণাগুণ, কখনো এটা কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল, কখনো এর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য।)

হাইড্রোজেন পরমাণুরা জোড় বেঁধে বেঁধে তৈরি করে হাইড্রোজেন অণু। অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু যদি এক জায়গায় জড়ো হয় তাহলে হাওয়ার মতো একটা জিনিস তৈরি হয় ; তাকে বলে 'গ্যাস'। হাইড্রোজেন হল সবচাইতে হাল্কা গ্যাস। হাওয়ার চাইতে এর ওজন মাত্র পনের ভাগের এক ভাগ। তাই বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাস ভরলে কাঠ যেমন পানিতে ভেসে থাকে, এই বেলুনও তেমনি হাওয়ায় ভেসে থাকে। এই রকম বিরাট বিরাট বেলুনে গ্যাস পোরা হলে তা বহু টন ওজন বয়ে নিতে পারে।

হাইড্রোজেন নিয়ে অবশ্য একটা মুশকিল হল, এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে সহজেই। বিশেষ করে হাইড্রোজেন অণুর সাথে হাওয়ার কতকগুলো অণুর ধাক্কাধাক্কিতে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। তাপমাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে হাইড্রোজেন অণুগুলো এমন সক্রিয় হয়ে ওঠে যে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৩৭ সালে 'হিণ্ডেনবার্গ' নামে এক বিশাল বেলুনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল ; খুব সম্ভব স্থিরবিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি হওয়া তাপই এজন্যে দায়ী। হাইড্রোজেন এভাবে সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে বলে একে বলা হয় **সক্রিয় মৌল**।

এর পরের যে সরল অণুটি, বলা বাহুল্য, তার পারমাণবিক সংখ্যা ২। এতে আছে দুটো ইলেকট্রন। এর নাম হল হিলিয়াম। (হিলিয়াম নামটা এসেছে যে গ্রীক শব্দ থেকে তার অর্থ 'সূর্য' তার কারণ, শুনতে আশ্চর্য শোনালেও, এই গ্যাসটি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হবার আগেই এর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল সূর্যের বুকে।)

হিলিয়ামও হাওয়ার চাইতে হাল্কা একটি গ্যাস। এটা হাইড্রোজেনের মতো অতটা হাল্কা নয়, তবু বড় বড় বেলুনে ব্যবহার করা চলে। হিলিয়ামের একটা বড় সুবিধে হল এটা কোন রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। তাপমাত্রা যতই হোক না কেন, হিলিয়ামের পরমাণু অন্য পরমাণুতে ধাক্কা খেলে শুধু ঠিকরে ফিরে আসে। এমন কি এরা নিজেদের মধ্যেও জোট বাঁধে না—থাকে একেবারেই একা একা। হিলিয়াম জ্বলে না, বিস্ফোরণ ঘটায় না, একদম কিচ্ছু করে না। এটা হল এক নিষ্ক্রিয় **মৌল**। এর জন্যে একে বড় বা ছোট যে-কোন রকম বেলুনে ব্যবহার করা রীতিমতো নিরাপদ।

ভাবতে আশ্চর্য লাগবে যে, মাত্র একটা ইলেকট্রনের কম-বেশিতেই এত তফাত হতে পারে। কিন্তু সত্যি তাই হয়। একটা কক্ষীয় ইলেকট্রনঅলা

banglainternet.com

হাইড্রোজেন সামান্য কারণেই বিস্ফোরণ ঘটাবে। অথচ দুটো কক্ষীয় ইলেকট্রনঅলা হিলিয়াম কোনমতেই কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জড়াবে না। ধরা যাক, এর পরের মৌলের কথা—এতে আছে তিনটা কক্ষীয় ইলেকট্রন। এর নাম হল লিথিয়াম (নামটা এসেছে 'পাথরের' গ্রীক প্রতিশব্দ থেকে ; কারণ এক ধরনের পাথরে এটা প্রথম আবিষ্কৃত হয়)। এটা কিন্তু গ্যাস নয়, সাধারণ অবস্থায় কঠিন পদার্থ।

তিনটে উল্লেখযোগ্য মৌল রয়েছে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৭ আর ৮। ছ'নম্বর মৌল হল কার্বন। এটা একটা কাল রঙের কঠিন পদার্থ ; আমরা সবাই দেখেছি একে, কেননা সাধারণ কয়লা এক ধরনের কার্বন বই আর কিছু নয়। আসলে 'কার্বন' কথাটাও এসেছে কয়লার ল্যাটিন প্রতিশব্দ থেকে। জীবজন্তুর দেহের জন্যে কার্বন যেমন জরুরী, এমন আর কোন মৌল নয়।

সাত নম্বর মৌল হল নাইট্রোজেন আর আট নম্বর মৌল অক্সিজেন। হাইড্রোজেন পরমাণুদের মতোই এদের পরমাণুরাও জোড়া বেঁধে থাকে। নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন দুই-ই গ্যাস। আমাদের চারপাশে যে হাওয়া তা প্রায় সবটাই এই দুটি গ্যাসের মিশেলে তৈরি—পাঁচ ভাগের চার ভাগ নাইট্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন। এই দুটি গ্যাসের চালচলনে অনেক তফাত আছে। নাইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় (যদিও হিলিয়ামের মতো অতটা নিষ্ক্রিয় নয়) কিন্তু অক্সিজেন রীতিমতো সক্রিয়। কাগজ, কাঠ, কেরোসিন, হাইড্রোজেন এসব যখন হাওয়ায় পোড়ে, তখন আসলে অক্সিজেনের অণুর সাথে এদের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। হাওয়ায় যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু না থাকত তাহলে এসব জিনিস জ্বলত অতি উজ্জ্বল হয়ে। আর হাওয়ায় যদি বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ছাড়া আর কিছু না থাকত তাহলে এসব জিনিস মোটেই জ্বলত না। আমরা যখন নাক দিয়ে শ্বাস টানি, তখন আসলে আমরা হাওয়ার অক্সিজেন টেনে নিই ফুসফুসে। সেই অক্সিজেন আমাদের দেহের নানান অণুর সাথে ক্রিয়া করে দেহকে চালু রাখে। নাইট্রোজেনকে আমরা হাওয়ার সাথে টেনে নিই, কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে সেটা বেরিয়ে যায়।

সবগুলো মৌলের কথা এখানে আলোচনা করা যাবে না ; কেননা তার জন্যে বহু জায়গা লাগবে। তার চেয়ে বরং কতকগুলো মৌলের নামের একটা তালিকা করা যাক ; দেখবে এর মধ্যে অনেকগুলোই তোমার চেনা।

banglainternet.com

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল
১০	নিয়ন	৫০	টিন
১৩	অ্যালুমিনিয়াম	৫৩	আয়োডিন
১৬	গন্ধক	৭৮	প্লাটিনাম
২৪	ক্রোমিয়াম	৭৯	সোনা
২৬	লোহা	৮০	পারদ
২৮	নিকেল	৮২	সীসা
২৯	তামা	৮৮	রেডিয়াম
৩৩	আর্সেনিক	৯২	ইউরেনিয়াম
৪৭	রুপো	৯৪	প্লুটোনিয়াম

আবার এমনও সব মৌল আছে যেগুলোর নাম রসায়নবিদরা ছাড়া অন্য সাধারণ লোকে প্রায় জানেই না। যেমন ধর, ৪১ নম্বর মৌলের নাম নিওবিয়াম, ৪৯ নম্বর হল ইণ্ডিয়াম, ৫৪ নম্বর জেনন, ৫৯ নম্বর প্রাসিওডিমিয়াম, ৬৬ নম্বর ডিস্‌প্রোজিয়াম, ৯১ নম্বর প্রোট্যাকটিনিয়াম, ইত্যাদি। ভ্যাগ্যাস, এদের নিয়ে আমাদের তেমন মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

মৌলের পরিবার

প্রত্যেক মৌল আলাদা আলাদা হলেও তাদের মধ্যে আবার পারিবারিক মিলও রয়েছে। যেমন, সোডিয়াম আর পটাসিয়ামের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মিল—দুটোই কোমল, সক্রিয় মৌল আর সহজেই গলে যায়। ব্রোমিন আর ক্লোরিনের মধ্যেও আছে প্রচুর মিল—দুটোই সক্রিয়, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। আর্গন আর নিয়নের মধ্যে আছে অনেক মিল—দুটোই নিষ্ক্রিয় মৌল।

এসব মিলের কারণ হল পরমাণুতে ইলেকট্রনদের সমাবেশের কায়দা। ইলেকট্রনরা পরমাণুর বাইরের দিকে যেমন-তেমন করে ছড়ানো থাকে না; সাজানো থাকে স্তরে স্তরে। প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রের চারপাশে অনেকটা পেঁয়াজের খোলসের মতো যেন স্তরে স্তরে সাজানো থাকে **ইলেকট্রন-**

সদৃশ মৌল

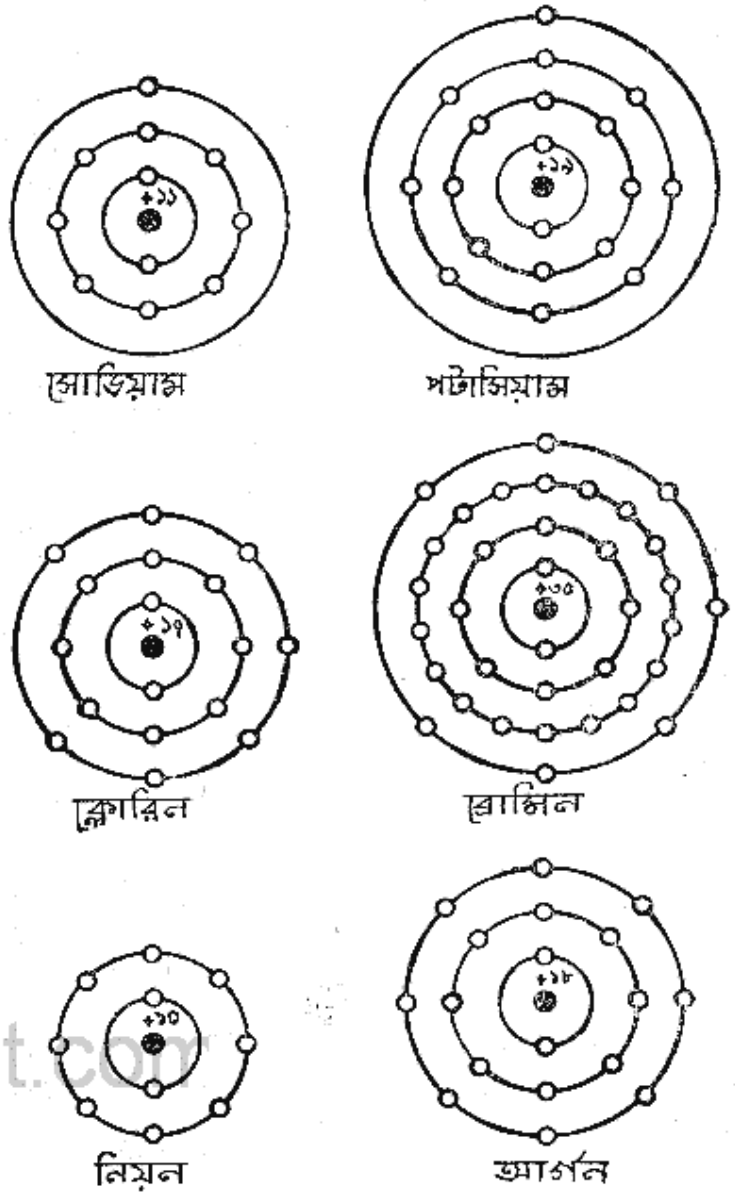

banglainternet.com

খোলস। প্রত্যেক ইলেকট্রন-খোলসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতে পারে। একেবারে ভেতরের খোলসে থাকতে পারে মাত্র দুটি ইলেকট্রন, এর পরেরটিতে আটটি, তার পরেরটিতে আঠারটি, ইত্যাদি।

একটি সোডিয়াম পরমাণুর কথা বিবেচনা করা যাক। এর পারমাণবিক সংখ্যা ১১, কাজেই এতে ১১টি ইলেকট্রন আছে। এগুলো সাজানো আছে এইভাবেঃ একদম ভেতরের খোলসে ২টি, তার পরের খোলসে ৮টি, তার পরের খোলসে ১টি। একে যদি আমরা ২/৮/১ এইভাবে লিখি তাহলে দেখা যাবে এই সংখ্যাগুলোর যোগফল হবে ১১।

এবার যদি আমরা একটি পটাসিয়াম পরমাণুর কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখব তার পারমাণবিক সংখ্যা ১৯ ; আর এই ১৯টি ইলেকট্রন সাজানো আছে এইভাবে ২/৮/৮/১। ইলেকট্রনদের খোলসের মধ্যে এই সব সাজাবার ব্যবস্থার কথা আমরা জেনেছি দিনেমার পদার্থবিদ নীল্‌স্‌ বোর (Niels Bohr), অস্ট্রীয় পদার্থবিদ ওল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ পাউলি (Wolfgang Pauli) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জটিল তত্ত্বীয় গবেষণা থেকে।

সোডিয়াম আর পটাসিয়মের পরমাণুতে ইলেকট্রন সাজাবার কায়দা (২/৮/১ আর ২/৮/৮/১) তুলনা করলে দেখা যাবে দুটোর মধ্যে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে—সে হল একদম বাইরের খোলসে মাত্র একটি করে ইলেকট্রন। দুটি পরমাণু যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার মতো জোরে ধাক্কা খায়, তখন এই বাইরের ইলেকট্রনের গায়েই সত্যিকার আঘাতটা লাগে। দুটি পরমাণুর বাইরের খোলস যদি হয় এক রকমের, তাহলে তাদের অনেকটা একই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা দেবে। অবশ্য তাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া হুবহু এক রকম হবে না, কেননা নিচের স্তরের খোলসে তফাত রয়েছে, তবে অনেকখানি এক ধরনের হবে।

এইভাবে বাইরের খোলসে একটি করে ইলেকট্রন থাকায় সোডিয়াম আর পটাসিয়ামকে এক পরিবারের সদস্য বলে ধরা যেতে পারে ; এই পরিবারে রয়েছে মোট ছ'টি মৌল। এই ছ'টির একটি হল লিথিয়াম ; তার ইলেকট্রন সাজাবার হিসেব হল ২/১।

এমনি ইলেকট্রন সাজাবার কায়দা অনুসারে ক্লোরিন আর ব্রোমিনের মধ্যেও রয়েছে মিল। ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা ১৭, আর তার ইলেকট্রনের বিন্যাস ২/৮/৭ (মোটমাট ১৭)। ব্রোমিনের পারমাণবিক সংখ্যা

৩৫ ; তার ইলেকট্রনের বিন্যাস ২/৮/১৮/৭ (মোট ৩৫)। দুয়েরই বাইরের খোলসে ইলেকট্রনের সংখ্যা হল সাতটি করে।

এবার দেখা যাক নিয়ন (পারমাণবিক সংখ্যা ১০) আর আর্গনের (পারমাণবিক সংখ্যা ১৮) অবস্থা। নিয়নের দশটি ইলেকট্রন সাজানো আছে এইভাবে ২/৮ ; আর্গনের আঠারটি সাজানো আছে ২/৮/৮। দুয়েরই বাইরের খোলসে ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটি।

এমনি করে ১০৩টি মৌলের সবগুলোকেই তাদের খোলসে ইলেকট্রনের বিন্যাস অনুসারে ফেলা যায় কোন-না-কোন পরিবারে ; কোন কোন পরিবারে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পনেরটি পর্যন্ত।

১৮৬৯ সালে দ্‌মিত্রি মেণ্ডেলিয়েভ (Dmitri Mendele'ev) নামে এক রুশ রসায়নবিদ তখনকার জানা সবগুলো মৌলকে স্তম্ভ আর সারি-অলা একটা ছকে সাজালেন। তিনি ইলেকট্রনদের কথা কিছুই জানতেন না ; তখনকার দিনে কেউই জানত না। তবে তিনি মৌলগুলোকে এমনভাবে সাজালেন যেন একই ধরনের রাসায়নিক গুণঅলা মৌলগুলো পড়ে একই স্তম্ভে। একে বলা হল **পর্যাবৃত্ত ছক**।

এর পর পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে এই পর্যাবৃত্ত ছক বিজ্ঞানীদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার রহস্য বুঝতে সাহায্য করেছে। এর পর যখন ইলেকট্রনদের কথা জানা গেল, তখন সবাই অবাক হয়ে দেখল এ সম্বন্ধে আগে না জেনেও কোন্‌ মৌলে ক'টি ইলেকট্রন-খোলস আছে আর সবচাইতে বাইরের খোলসে ক'টি ইলেকট্রন আছে ঠিক সেই অনুযায়ীই মেণ্ডেলিয়েভ মৌলগুলোকে ছকে ফেলেছেন।

আধানযুক্ত পরমাণু

খানিক আগে আমরা অণুদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। কখনোসখনো এমনি ধাক্কাধাক্কিতে অণুর একটি পরমাণু কিছু ইলেকট্রন খুইয়ে বসে, কিংবা হয়তো ক'টি বাড়তি ইলেকট্রন লুফে নেয়। নিশ্চয়ই ভাবছ, ইলেকট্রনের সংখ্যা এভাবে বদলে গেলে কি তাহলে গোটা পরমাণুটাই আগের তুলনায় বদলে যায় না? হ্যাঁ, যায় বই কি!

ধরা যাক, সোডিয়াম পরমাণুর কথা, যাতে রয়েছে এগারটি ইলেকট্রন। যেইমাত্র একটি ইলেকট্রন খোয়া যায় তখন আর সোডিয়াম পরমাণু উদাসীন থাকে না। গোড়ায় বাইরের এগারটি ইলেকট্রনের আধান কাটাকাটি হয়ে

banglainternet.com

থাকছিল কেন্দ্রের এগারটি প্রোটন দিয়ে ; তাই গোটা পরমাণুটা ছিল উদাসীন। যেইমাত্র একটা ইলেকট্রন ছিটকে খোয়া গেল, বাকি দশটা ইলেকট্রনের মোট আধান রইল --১০ ; এদিকে কেন্দ্রের এগারটি প্রোটনের মোট আধান হল +১১। কাজেই মোটমাট পরমাণুটির বাকি আধান রইল +১।

আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৭ নম্বর মৌল হল হালকা সবুজ, সক্রিয়, বিষাক্ত গ্যাস ক্লোরিন। এর পরমাণুরাও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন পরমাণুদের মতোই জোড় বেঁধে থাকে। এই ক্লোরিনের অণু যখন আর কোন জাতের পরমাণু বা অণুর সাথে ধাক্কা খায় তখন ক্লোরিনের পরমাণুগুলো অনেক সময় একটা করে বাড়তি ইলেকট্রন ধরে আটকে রাখে। তার ফলে ক্লোরিন পরমাণুর গায়ে হয়ে দাঁড়ায় ১৮টি ইলেকট্রন, যার মোট আধান --১৮। এদিকে ক্লোরিনের পরমাণুকেন্দ্রে রয়েছে মাত্র ১৭টি প্রোটন (সেটা বদলায় না), যাদের মোট আধান +১৭। কাজেই মোটমাট পরমাণুর আধান দাঁড়াল --১।

অবস্থাগতিকে সব পরমাণুতেই একটি বা বেশি ইলেকট্রনের বাড়তি বা ঘাটতি হতে পারে। তার ফলে কখনো কখনো গোটা অণুটাতে স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে ইলেকট্রনের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় বেশি বা কম। এ ধরনের অণু বা পরমাণু (কিংবা কখনো কোন পরমাণুজোট বা একটা অণুর অংশ) আর নিরপেক্ষ থাকে না ; ইলেকট্রনের ঘাটতি হলে তাতে হয় ধনাত্মক আধান, আর ইলেকট্রনের বাড়তি হলে দেখা দেয় ঋণাত্মক আধান। ক'টা ইলেকট্রনের বাড়তি বা ঘাটতি হয়েছে তার ওপরই নির্ভর করে এই আধানের পরিমাণ।

ইলেকট্রনরা যেমন বিদ্যুৎপ্রবাহের সাথে বয়ে যায় তেমনি বিশেষ অবস্থায় এই সব আধানযুক্ত অণু বা পরমাণুরাও বয়ে যেতে পারে। যেগুলোর আধান ঋণাত্মক, সেগুলো বইবে ইলেকট্রনরা যেদিকে বয় সেই দিকে। যেগুলোর আধান ধনাত্মক সেগুলো বইবে তার উলটো দিকে।

এমনি সব আধানযুক্ত অণু বা পরমাণু যারা বিদ্যুৎপ্রবাহের সাথে চলে বেড়ায় তাদের বলা হয় **আয়ন** ; নামটা এসেছে এক গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ 'যাওয়া'। আধানের রকম অনুসারে আয়ন ঋণাত্মকও হতে পারে, ধনাত্মকও হতে পারে।

ধনাত্মক আধানযুক্ত কণিকা, যেমন প্রোটন, যদি কোন বস্তুর ভেতর দিয়ে ছুটে যায় তাহলে যাবার সময় পথের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা, যেমন ছুটন্ত ইলেকট্রন, কোন বস্তুর ভেতর দিয়ে গেলে তার পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। এই দুটোর যেকোন অবস্থাতেই পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা যায় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কম হয়ে আর এগুলো তখন হয়ে দাঁড়ায় ধনাত্মক আয়ন। এমনি আয়ন সৃষ্টি হয় বলেই মেঘ-ঝক্কে পানির ফোঁটায় বা বুদবুদ-ঝক্কে বুদবুদের সাহায্যে ছুটন্ত কণিকাদের নিশানা করা সম্ভব হয়।

নিউট্রনের মতো আধানবিহীন কণিকা ইলেকট্রনদের আকর্ষণও করে না, বিকর্ষণও করে না। কাজেই এরা আয়নও সৃষ্টি করে না। আর এই জন্যেই আধানযুক্ত কণিকাদের অস্তিত্ব যেমন সহজে বোঝা যায় আধানবিহীন কণিকাদের তত সহজে হদিস করা যায় না।

ধাতব তারে ইলেকট্রনরা যেমন বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে নেয়, তেমনি পানিতে আয়নরা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে নিতে পারে। ব্যাটারিতে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয় তার জন্যে আয়নরাও অনেকখানি দায়ী।

খুব বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ ভাল পরিবহণ করতে পারে না, কিন্তু তাতে যদি সাবান, ময়লা, রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদির আয়ন যোগ হয় তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে বেশি। ভেজা শরীরও খুব ভাল বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। এই জন্যে গোসলখানায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে খুব সাবধান। খুব সহজেই শরীরে বিদ্যুৎ ঢুকে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

নানা রকম মৌল সম্বন্ধে আলোচনা করার পর এবার মৌলদের আর একটু ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার। এরপরের অধ্যায়ে আমরা দেখব একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো সত্যি সত্যি হুবহু এক রকম কিনা।

banglainternet.com

যমজ পরমাণু

মৌল কাছাকাছি থেকে দেখা

কয়েক পৃষ্ঠা আগে যে ক'টি মৌলের তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে হর-হামেশা ব্যবহারে হয় এ রকম একটি মৌল হল তামা। আমরা সবাই দেখেছি এই লালচে-বাদামি ধাতুটিকে। বিজলির তার সচরাচর তৈরি হয় তামা দিয়ে। ব্রোঞ্জের এক-পয়সার মুদ্রারও প্রধান উপাদান তামা।

এখন মনে কর, আমাদের সামনে রয়েছে খানিকটা অতি বিশুদ্ধ তামা। 'বিশুদ্ধ' মানে হল এই তামায় শুধু তামা ছাড়া আর কিছু নেই। আর কোন ধাতু বা আর কোন মৌলই নেই তাতে। এমনি তামার তালের পরমাণুদের সম্বন্ধে কি বলতে পারি আমরা?

প্রথমত এর প্রতিটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা একই। তামার পারমাণবিক সংখ্যা হল ২৯, অর্থাৎ প্রতিটি নিরপেক্ষ তামার পরমাণুতে ২৯টি ইলেকট্রন রয়েছে। কোন পরমাণুতে যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা হয় ২৯-এর চেয়ে বেশি বা কম তাহলে সেটা তামার পরমাণু নয়।

এছাড়া ২৯টি ইলেকট্রনের আধান কাটাকাটি হবার জন্যে প্রতিটি তামার পরমাণুকেন্দ্রে থাকবে ২৯টি প্রোটন। যদি কোন পরমাণুর কেন্দ্রে ২৯টির চেয়ে বেশি বা কম প্রোটন থাকে তাহলে সেটা তামার পরমাণু নয়।

এতে প্রোটন আর ইলেকট্রনদের হিসেব পাওয়া গেল, কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে পরমাণুতে আরো এক রকম মৌল কণিকা রয়েছে। প্রতিটি তামার পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা কত?

এখানে দেখা দেয় খানিকটা হেরফের। কতক তামার পরমাণুতে রয়েছে ৩৪টি নিউট্রন, আবার কতক পরমাণুতে রয়েছে ৩৬টি। আরো স্পষ্ট করে বললে, এক তাল তামার শতকরা ৬৯ ভাগ পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ৩৪টি আর শতকরা ৩১ ভাগ পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ৩৬টি।

তামার পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যার হেরফেরে পারমাণবিক সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না ; সেটা নির্ভর করে একমাত্র কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার ওপরে। এতে তামার পরমাণুর রাসায়নিক গুণাগুণেও কোন পরিবর্তন হয় না ; সেটা নির্ভর করে শুধু কক্ষীয় ইলেকট্রনদের সংখ্যা আর বিন্যাসের ওপরে।

তাহলে কি নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশি হলে পরমাণুতে আদৌ কোন তফাত হয় না? হয় বৈকি!—দুজাতের তামার পরমাণুর ভরসংখ্যা হয় আলাদা। ৩৪টি নিউট্রনঅলা তামার পরমাণুর ভরসংখ্যা ৬৩ (২৯টি প্রোটন আর ৩৪টি নিউট্রন)। ৩৬টি নিউট্রনঅলা তামার পরমাণুর ভরসংখ্যা ৬৫ (২৯টি প্রোটন আর ৩৬টি নিউট্রন)।

দুজাতের তামার পরমাণুর মধ্যে তফাত করা যায় এই ভরসংখ্যা দিয়ে। রসায়নবিদরা যখন বলেন তামা-৬৩ তখন তাঁরা বোঝান এমন তামার পরমাণু যার কেন্দ্রে নিউট্রন আছে ৩৪টি। আবার তাঁরা যদি বলেন তামা-৬৫ তখন বুঝতে হবে এমন তামার পরমাণু যার কেন্দ্রে আছে ৩৬টি নিউট্রন।

মনে কর, তুমি এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ তামা-৬৩ পেলে যাতে শুধু ৩৪টি নিউট্রনঅলা পরমাণু রয়েছে। এবার তাকে যদি তুলনা করা যায় এক ঘন ইঞ্চি তামা ৬৫-এর সাথে যাতে রয়েছে শুধু ৩৬টি নিউট্রনঅলা পরমাণু? দুটি ঘনককে দেখতে মনে হবে হুবহু এক রকম। দুটো থেকেই একই ভাবে টেনে লম্বা তার বা চাপ দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা যাবে। এই তার বা মুদ্রার গুণাগুণ হবে হুবহু একই রকম। রসায়নবিদরা যদি এদের ওপর

banglainternet.com

অ্যাসিড বা আর কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরীক্ষা করেন তাহলে দুজাতের তামা থেকে একই রকম ফল পাবেন। তামা-৬৩ আর তামা-৬৫ হল পারমাণবিক যমজ।

এবার মনে কর, তুমি পিণ্ড দুটিকে ওজন করলে। তামা ৬৩-এর ঘনকটির ভর হবে ৫$\frac{1}{2}$ আউন্স। তামা ৬৫-এর ঘনকটির ভর হবে একটু বেশি, কেননা এর প্রতিটি পরমাণুতে রয়েছে দুটি বাড়তি নিউট্রন। এই সব বাড়তি নিউট্রনের দরুন তামা-৬৫ ঘনকটির ভর দাঁড়াবে ৫$\frac{1}{2}$ আউন্স। মাত্র এক-অষ্টমাংশ আউন্সের তফাত, কিন্তু এতেই বোঝা যাচ্ছে দুটি পারমাণবিক যমজ হুবহু এক নয়। (এর পরের অন্যান্য অধ্যায়ে দেখবে এদের মধ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।)

যখন দুই বা তার বেশি ধরনের পরমাণুর মধ্যে তফাত দেখা যায় শুধু পরমাণুকেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যায়, তখন তাদের বলা হয় **আইসোটোপ** বা **সমস্থানিক**। তামা-৬৩ আর তামা-৬৫ হল তামার আইসোটোপ।

বেশি আর কম আইসোটোপ

হয়তো জিজ্ঞেস করবে, তামার পরমাণুকেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যা শুধু ৩৪টি বা ৩৬টি হয় কেন? ৩৫, ৩৭ অথবা আর কোন সংখ্যা নয় কেন?

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক বিদ্যুতের কথা আমরা যখন প্রথম আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম সদৃশ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। প্রোটনদের সবারই আধান হল ধনাত্মক ; কাজেই দুটি প্রোটন পরস্পরকে বিকর্ষণ করার কথা—আর সত্যি সত্যি করেও তাই!

অথচ তবু তামার ছোট্ট পরমাণুকেন্দ্রে ২৯টি প্রোটন গাদাগাদি হয়ে থাকে এক সাথে! এরা বিকর্ষণের ফলে পরস্পর থেকে ছিটকে সরে যায় না কেন? খুব সম্ভব এর জবাব রয়েছে নিউট্রনদের মধ্যে। যখন কোন পরমাণুকেন্দ্রে একটির বেশি প্রোটন থাকে তখন তাতে নির্ঘাত নিউট্রন থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন এক সাথে হলে তাদের সঙ্গে অন্তত-পক্ষে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউট্রন চাই।

তামার পরমাণুর বেলায় ২৯টি প্রোটনের সাথে যদি মিশে থাকে অন্তত ৩৪টি নিউট্রন তাহলে আর প্রোটনরা পরস্পর থেকে ছিটকে সরে যাবে না। ৩৬টি নিউট্রন থাকলেও হবে। অর্থাৎ ৩৪টি অথবা ৩৬টি নিউট্রন থাকলে

তামার পরমাণুকেন্দ্র জোট বেঁধে থাকতে পারে। এটা তখন হয় **স্থায়ী**। নিউট্রনের সংখ্যা ৩৪ বা ৩৬ ছাড়া আর কিছু হলে প্রোটনরা আর এক সাথে থাকতে পারে না। নিউট্রনের সংখ্যা যদি ৩৫টি হত (অথবা ৩৪ ও ৩৬ ছাড়া আর কোন সংখ্যা) তাহলে তামার পরমাণুকেন্দ্র জোট বেঁধে থাকতে পারত না —হয়ে পড়ত **অস্থায়ী**।

তাহলে আমরা বলতে পারি তামার রয়েছে দুটি স্থায়ী আইসোটোপ।

কোন কোন মৌলের স্থায়ী আইসোটোপের সংখ্যা দুয়ের বেশিও হতে পারে। এর একটা খুবসই দৃষ্টান্ত হল লোহা। লোহার পারমাণবিক সংখ্যা ২৬। প্রতিটি নিরপেক্ষ লোহার পরমাণুতে রয়েছে ২৬টি ইলেকট্রন আর ২৬টি প্রোটন। তবে বিভিন্ন লোহার পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যার হেরফের হয়। লোহার পরমাণুদের শতকরা ৯২ ভাগের কেন্দ্রে থাকে ঠিক ৩০টি নিউট্রন। এগুলো হল লোহা-৫৬ পরমাণু। (বুঝতেই পারছ ২৬টি প্রোটন আর ৩০টি নিউট্রন যোগ হয়ে ভরসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫৬)। বাকি শতকরা ৮ ভাগের মধ্যে আবার আছে তিন জাতের লোহার পরমাণু। এক জাতের পরমাণুকেন্দ্রে আছে মোটে ২৮টি নিউট্রন (লোহা-৫৪)। আরেক জাতের আছে ৩১টি নিউট্রন (লোহা-৫৭)। তৃতীয় জাতের আছে ৩২টি নিউট্রন (লোহা-৫৮)। এর সবগুলোই আবার স্থায়ী পরমাণু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে লোহার রয়েছে চারটি স্থায়ী আইসোটোপ।

স্থায়ী আইসোটোপের সংখ্যার দিক দিয়ে টিনকে কেউ হারাতে পারে না। এর আছে দশটি স্থায়ী আইসোটোপ। রসায়নবিদরা এদের বলেন টিন-১১২, টিন-১১৪, টিন-১১৫, টিন-১১৬, টিন-১১৭, টিন-১১৮, টিন-১১৯, টিন-১২০, টিন-১২২ আর টিন-১২৪। টিনের যে কোন খণ্ডই তুমি হাতে নাও তাতে প্রত্যেকটি আইসোটোপই রয়েছে কিছু পরিমাণে।

বিভিন্ন মৌল আর তাদের আইসোটোপদের সাবধানে পরীক্ষা করলে একটা জিনিস চোখে পড়বে। যে সব মৌলের জোড় পারমাণবিক সংখ্যা (অর্থাৎ যাদের পরমাণুকেন্দ্রে রয়েছে জোড় সংখ্যার প্রোটন) তাদের আইসোটোপ রয়েছে বেজোড় পারমাণবিক সংখ্যাঅলা মৌলগুলির চেয়ে বেশি।

বোঝা যাচ্ছে, পরমাণুকেন্দ্রে জোড় সংখ্যা প্রোটন থাকা সুবিধে—তাতে যেন কেন্দ্রের ভারসাম্য ভালভাবে বজায় থাকে। অন্তত এ অবস্থায় নিউট্রন যোগ করে পরমাণুকেন্দ্রকে স্থায়ী রাখা যায়। নিউট্রনের সংখ্যায় মনে হয়

banglainternet.com

তেমন আসে-যায় না। জোড় পারমাণবিক সংখ্যাঅলা অধিকাংশ মৌলের তিনটি বা তার বেশি আইসোটোপ রয়েছে, তার অর্থ নিউট্রনদের নির্দিষ্ট তিন সংখ্যার যে কোন এক সংখ্যাতেই পরমাণুটি স্থায়ী হবে।

আমরা আগেই দেখেছি, লোহার (পারমাণবিক সংখ্যা ২৬) আইসোটোপ রয়েছে চারটি। ক্রোমিয়ামেরও (পারমাণবিক সংখ্যা ২৪) তাই। নিকেলের (পারমাণবিক সংখ্যা ২৮) আইসোটোপ আছে পাঁচটি আর টিনের (পারমাণবিক সংখ্যা ৫০), একটু আগেই বলেছি, আছে দশটি। এর কেন্দ্রে পঞ্চাশটি প্রোটনকে স্থায়ী রাখা যেতে পারে ৬২টি নিউট্রন দিয়ে, অথবা ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২ বা ৭৪টি নিউট্রন দিয়ে।

অথচ পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন যদি হয় বেজোড় সংখ্যক তাহলে তাকে স্থায়ী রাখা হয় রীতিমতো মুশকিল। প্রোটনকে জোড়া জোড়া করে হিসেব করলে একটা প্রোটন বাকি থাকে। এই বেজোড় প্রোটনের দরুন পরমাণু-কেন্দ্রের ভারসাম্য রাখা হয়ে পড়ে শক্ত।

বেজোড় পারমাণবিক সংখ্যাঅলা কোন মৌলের দুটির বেশি আইসোটোপ নেই। অর্থাৎ এ ধরনের মৌলের বেলায় নিউট্রন মাত্র দুটি সংখ্যার হলে তারা প্রোটনদের জোট বেঁধে রাখতে পারে। তামা (পারমাণবিক সংখ্যা ২৯), যার কথা আগেই বলেছি, এর একটি দৃষ্টান্ত। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল রুপো (পারমাণবিক সংখ্যা ৪৭)। রুপোর দুটি স্থায়ী আইসোটোপ হল রুপো-১০৭ আর রুপো-১০৯।

বেজোড় পারমাণবিক সংখ্যাঅলা অধিকাংশ মৌলের আবার স্থায়ী পরমাণু মোটে এক জাতের। একটা দৃষ্টান্ত হল অ্যালুমিনিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা ১৩। আর পরমাণুকেন্দ্র স্থায়ী হবার জন্যে ঠিক ১৪টি নিউট্রনের দরকার—বেশিও নয়, কমও নয়। নিউট্রনের সংখ্যা ১৪ ছাড়া আর কিছু হলে একেবারেই চলবে না ; কাজেই অ্যালুমিনিয়ামের মাত্র এক জাতের স্থায়ী পরমাণু হল অ্যালুমিনিয়াম-২৭।

তেমনি, স্থায়ী আর্সেনিকের (পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩) পরমাণুও আছে মাত্রই এক জাতের —আর্সেনিক-৭৫। মাত্র এক জাতের স্থায়ী আয়োডিন (পারমাণবিক সংখ্যা ৫৩) পরমাণু হল আয়োডিন-১২৭। মাত্র এক জাতের সোনার (পারমাণবিক সংখ্যা ৭৯) পরমাণু সোনা-১৯৭। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কখনো কখনো মাত্র এক জাতের স্থায়ী পরমাণুঅলা মৌলের কথা বলা হয় "এর আইসোটোপ মোটে একটি।" আসলে কিন্তু আইসোটোপ কথাটা ব্যবহার করা উচিত শুধু সেই সব মৌলের বেলায় যাদের দুটি বা তার বেশি জাত রয়েছে।

আবার এমনও মৌল রয়েছে যাদের কোন স্থায়ী পরমাণুই নেই —একদম একটিও না! (একথা শুনে হয়তো তোমাদের ধাঁধা লাগবে, মনে প্রশ্নও দেখা দেবে অনেক। একটু সবুর কর, এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথা আলোচনা করা যাবে।)

আমাদের জানা ১০৩টি মৌলের মধ্যে ২৩টির কোন স্থায়ী আইসোটোপ নেই ; ২০টির আছে একটি করে স্থায়ী আইসোটোপ ; ৬০টির আছে দুটি বা তার বেশি স্থায়ী আইসোটোপ। সবসুদ্ধ ২০৬ রকমের স্থায়ী আইসোটোপের কথা জানা গিয়েছে।

দুটি আলাদা মৌলের আইসোটোপের ভরসংখ্যা এক হওয়া সম্ভব। যেমন সব ক্যালসিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ২০টি প্রোটন আর সব আর্গন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ১৮টি প্রোটন। তবে ক্যালসিয়ামের কতক পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ২০টি আর কতক আর্গন পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ২২টি। ক্যালসিয়ামের যে পরমাণুতে প্রোটন ২০টি আর নিউট্রন ২০টি সে হল আইসোটোপ ক্যালসিয়াম-৪০। আবার আর্গনের যে পরমাণুতে প্রোটন ১৮টি আর নিউট্রন ২২টি সে হল আইসোটোপ আর্গন-৪০। দুটি পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যদি হয় পৃথক অথচ ভরসংখ্যা হয় একই তাহলে তাদের বলা হয় **আইসোবার**। ক্যালসিয়াম-৪০ আর আর্গন-৪০ আইসোবারের দৃষ্টান্ত।

ভারি হাইড্রোজেন আর ভারি পানি

যত রকম পরমাণু আছে তার মধ্যে সব চাইতে সরল হল হাইড্রোজেন। এর পারমাণবিক সংখ্যা এক। এতে আছে মাত্র একটি ইলেকট্রন। এর পরমাণুকেন্দ্রে আছে মাত্র একটি প্রোটন ; সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুতে আর কিচ্ছু নেই—একটি নিউট্রনও না। এ রকম হাইড্রোজেনের ভরসংখ্যা হল ১ আর তাই একে বলা হয় হাইড্রোজেন-১।

হাইড্রোজেনের আর কি কোন আইসোটোপ আছে? এর জবাব হল হ্যাঁ। পরমাণুকেন্দ্রে একটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন থাকলে সেটাও স্থায়ী

banglainternet.com

তাদের গতি হয় আলোর গতির নয়-দশমাংশ পর্যন্ত। অতি ছোট জিনিসও এমন প্রচণ্ড গতিতে চলার জন্যে প্রচুর শক্তির দরকার।

এই প্রচণ্ড গতি থেকে বোঝা যায়, আল্‌ফা আর বেটা কণিকা উভয়ই বস্তুর ভেতর ঢুকে যেতে পারে। আল্‌ফা রশ্মি ১ থেকে ৩ ইঞ্চি পুরু হাওয়ার অণুদের ঠেলে পেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এক পাত কাগজ দিয়ে তাকে ঠেকানো যায়। বেটা কণিকা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু ছোটে দ্রুততর গতিতে ; এরা কাগজের ভেতর দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারে, এমন কি ½ ইঞ্চি পুরু অ্যালুমিনিয়ামের পাতও ফুঁড়ে যায়। কোন বস্তুর পরমাণু যত ভারি, সেটা গতিশীল কণিকাদের তত ভালভাবে ঠেকাতে পারে। সীসার পরমাণুরা রীতিমতো ভারি ; তাই তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখবার পাত্র বানাতে সচরাচর সীসা ব্যবহার করা হয়। এটা তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে বর্মের কাজ করে।

মাদাম কুরী দেখিয়েছিলেন, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে তিন দিনে যে পরিমাণ শক্তি বিকিরিত হয়, তা এক আউন্সের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পেট্রল পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান। শুনতে মনে হচ্ছে, নেহাতই সামান্য শক্তি, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইউরেনিয়াম এমনি শক্তি ছড়াচ্ছে অনবরত, প্রতিদিন। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে এমনি শক্তি বিচ্ছুরণ। একশ' কোটি বছর পরে সেই এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে মোটমাট যে পরিমাণ শক্তি বেরোবে তা ৫,০০০ পাউণ্ড পেট্রল পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান। তার পরেও তার শক্তি বিচ্ছুরণ সমানে চলতেই থাকবে।

বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন, এই বিপুল পরিমাণ শক্তি আসছে কোথা থেকে ?

এই শক্তি নিশ্চয়ই আসছে কোথাও থেকে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নানা পরীক্ষায় ক্রমে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু একেবারে ধ্বংস করা যায় না। শক্তিকে সৃষ্টিও করা যায় না।

প্রকৃতির যত নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, খুব সম্ভব এটি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই নিয়মটি প্রথম স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন জার্মান পদার্থবিদ হার্মান হেল্‌মহোল্‌ট্‌স্‌ (Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz) ১৮৪৭ সালে ; সেই জন্যে সচরাচর তাঁকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয় **শক্তির নিত্যতার সূত্র** আবিষ্কারের।

বস্তুর বেলাতেও এমনি নিয়ম খাটে বলে মনে হয়। মোমবাতি জ্বালার সময় পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে মনে হলেও আসলে এর বিভিন্ন পরমাণুগুলি নানান গ্যাসের অংশ হিসেবে চারপাশের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পানি ফোটাবার সময় উবে গিয়ে অদৃশ্য হলেও আসলে বাষ্পের আকারে মিশে যায় হাওয়ায়। মরচে পড়লে লোহা ভারি হয়ে ওঠে। কিন্তু এতে আসলে নতুন বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে না ; হাওয়া থেকে অক্সিজেনের পরমাণু শুধু লোহার পরমাণুর গায়ে জুড়ে যাচ্ছে।

সোজা কথায়, বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায় ; কিন্তু তৈরিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। একে বলা হয় **বস্তুর নিত্যতার সূত্র**।

১৭৮০ সালের পর পর ফরাসী রসায়নবিদ আঁতোয়াঁ লরাঁ লাভোয়াজিয়ে (Antoine Laurent Lavoisier) প্রথম এই সূত্র আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্যে তাঁকে কখনো কখনো 'আধুনিক রসায়নের জনক' বলা হয়।

আসলে এই দুটি নিত্যতার সূত্রের ওপর ভিত্তি করে রসায়ন আর পদার্থ-বিদ্যার আর সব কিছু তত্ত্ব গড়ে ওঠে। এর যে কোন একটি মিথ্যে বলে প্রমাণ হলে বিজ্ঞানীরা পড়বেন বিষম বিপদে। অথচ ইউরেনিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে এমনভাবে শক্তি বেরিয়ে আসছে যেন এখানে শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এর সাথে শক্তির নিত্যতার সূত্রের গরমিল বিজ্ঞানীদের ভীষণ-ভাবে ভাবিয়ে তুলল।

ব্যাপারটার মীমাংসা করলেন আলবার্ট আইনস্টাইন—গত শতকের সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা) আর তার জন্যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য গবেষণার ফলে প্রথমবারের মতো পরমাণুর আকার মাপা সম্ভব হল। তাঁর গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে ফরাসী পদার্থবিদ জাঁ পেরিন (Jean Baptiste Perrin) পরমাণুর আকার মেপে বের করে ১৯২৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

এর চেয়েও বড় কথা, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বিশ্বকে বোঝার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব করলেন ; একে বলা হয় তাঁর **আপেক্ষিক তত্ত্ব**।

banglainternet.com

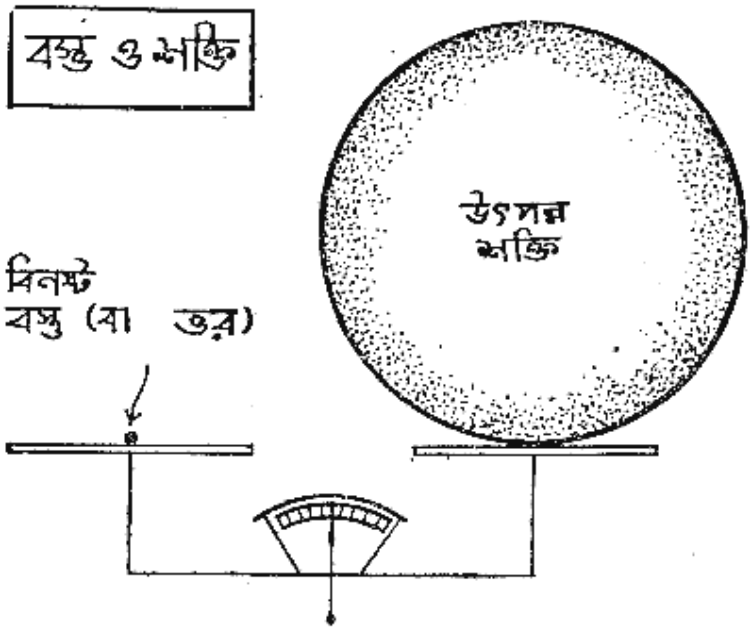

আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন দেখালেন বস্তু আর শক্তি আসলে একই জিনিসের দুই ভিন্ন রূপ। বস্তুকে 'ধ্বংস'ও করা যায়, কিন্তু তার ফলে খানিকটা শক্তি 'সৃষ্টি' হয়। শক্তিকেও 'ধ্বংস' করা যায়, কিন্তু তার ফলে খানিকটা বস্তু 'সৃষ্টি' হয়।

কিন্তু এই 'খানিকটা' কতটা? আইনস্টাইন দেখালেন, বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা হলে যতটা বস্তু ধ্বংস করা হল তাকে আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ করলেই কতখানি শক্তি সৃষ্টি হল, তা জানা যায়। আলোর গতি অনেক বেশি ; তাই খুব সামান্য বস্তুকেও শক্তিতে পরিণত করলে তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রচণ্ড রকম বড়।

মাত্র এক আউন্স পরিমাণ বস্তুকে যদি সম্পূর্ণ শক্তিতে পরিণত করা হয়, তাহলে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তা ৬০,০০০ টন পেট্রল পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান!

বলা বাহুল্য, এটা উল্টো দিক থেকেও সত্যি। বিপুল পরিমাণ শক্তিকে বস্তুতে পরিণত করলেও অতি সামান্য বস্তু পাওয়া যায়। ৬০,০০০ টন ওজনের পেট্রল পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায় তাকে যদি বস্তুতে পরিণত করা যেত, তাহলে পাওয়া যেত মাত্রই এক আউন্স পরিমাণ বস্তু।

এবার আমরা তেজস্ক্রিয়ার রহস্যের জবাব খুঁজে পেয়েছি। ইউরেনিয়ামের মতো কোন পরমাণুর কেন্দ্র যখন ভেঙে যায়, তখন এই কেন্দ্রের খুব সামান্য খানিকটা বস্তু পরিণত হয় শক্তিতে। যেটুকু বস্তু নষ্ট হল তার পরিমাণ এতই সামান্য যে, অতি বিশেষ কায়দা ছাড়া বস্তু যে খরচ হল, তা জানারও উপায় নেই। একশ' কোটি বছরে এক আউন্স ইউরেনিয়াম থেকে মাত্রই $\frac{১}{২৫,০০০}$ আউন্স বস্তু এভাবে ধ্বংস হয়। কিন্তু এটুকু বস্তু থেকেই তৈরি হয় গামা রশ্মি, আর আল্‌ফা ও বেটা কণিকা সৃষ্টি হয়ে ছুটে চলে তীব্র গতিতে।

আজ আর বিজ্ঞানীরা বস্তু আর শক্তির কথা আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করেন না। আজ দেখা দিয়েছে মাত্র একটি নিত্যতার সূত্র ঃ **বস্তু ও শক্তির নিত্যতার সূত্র।**

বস্তু আর শক্তির মধ্যেকার সম্পর্কটা বোঝা যাওয়ার ফলে আরো অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে এল—যেমন, সূর্যের আলো। বহুকাল থেকে বিজ্ঞানীরা সূর্যের শক্তিতে অবাক হয়ে যেতেন। আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে ন' কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও সূর্য থেকে এতটা তাপ আর আলো পাই আমরা। তার চেয়েও বড় কথা হল, বহু শত বছর ধরে সূর্য এমনিভাবে শক্তি বিলিয়ে চলেছে। এই বিপুল পরিমাণ শক্তি কেন ফুরিয়ে যাচ্ছে না তার ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বহু তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনটাই খুতসই হয়নি।

এবার তার জবাব পাওয়া গেল। সূর্য বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করছে। যদিও সামান্য একটু বস্তু থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, সূর্য এমন প্রচণ্ড আকারে শক্তি বিলোচ্ছে যে, তার জন্যে তাকে প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত ৪২,০০,০০০ টন বস্তু খোয়াতে হচ্ছে।

অবশ্য এতে আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই। সূর্য এত বিরাট যে, এই হারে বস্তু খুইয়েও তার সব বস্তু শেষ হতে আরো প্রায় তিন হাজার কোটি বছর লাগবে।

banglainternet.com

পরমাণুর জীবনকাল

তেজস্ক্রিয়ার শক্তিক্ষয়

আগের অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম ঃ এক পাউন্ড ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়া একশ' কোটি বছর পরেও সমান তালে চলতেই থাকবে ; কথাটা আর একবার তলিয়ে দেখা যাক। হয়তো ভাবছ, এটা আমরা জানব কি করে? কেউ তো আর এক তাল ইউরেনিয়ামকে একশ' কোটি বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখেনি!

তবু কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে রীতিমতো স্থিরনিশ্চিত। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে মাপজোক করে হিসেব করে বলা যায়, এক পাউন্ড ইউরেনিয়ামে প্রতি সেকেন্ডে একশ' কোটির বেশি পরমাণু ভেঙে পড়ছে। অবশ্য এক পাউন্ড ইউরেনিয়ামে মোটমাট পরমাণুর সংখ্যা এত বেশি যে, প্রতি সেকেন্ডে যদি একশ' কোটি পরমাণু ভাঙতে থাকে, তাহলেও তার সবগুলো পরমাণু ভাঙতে প্রায় তিন কোটি বছর লাগবে।

আসলে কিন্তু সব পরমাণু ভাঙতে তিন কোটি বছরের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে, তার কারণ পরমাণু ভাঙার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে আসে।

কেন কমে, বলছি।

সোজাভাবে জিনিসটা বোঝার জন্যে সবার পরিচিত একটি জিনিস, যেমন, সেল্‌স্‌ ট্যাক্সের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করা যাক, দোকান থেকে যে কোন জিনিস কিনতে হলে টাকা প্রতি ১ পয়সা সেল্‌স্‌ ট্যাক্স দিতে হবে। দুহাজার টাকা দিয়ে একটা টেলিভিশন কিনলে ট্যাক্স হবে ২০ টাকা। দাম যদি হয় এক হাজার টাকা, তাহলে ট্যাক্স দাঁড়াবে ১০ টাকা। পাঁচশ' টাকা দিয়ে রেডিও কিনলে তার ট্যাক্স হবে ৫ টাকা। একশ' টাকায় একটা ঘড়ি কিনলে তার ট্যাক্স হবে ১ টাকা।

তাহলে দেখছ, কোন জিনিসের দাম যত কম তার ওপর ট্যাক্সও তত কম হয়। এবার মনে কর, একটা দোকান খুব সস্তায় টেলিভিশন সেট বিক্রি করছে—এমনভাবে যে, প্রত্যেক দিনই তার দাম কমে যাচ্ছে দশ টাকা করে, তাহলে প্রত্যেক দিনই ট্যাক্স কমে যাচ্ছে ১০ পয়সা হিসেবে।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভেঙে পড়াও অনেকটা এই সেল্‌স্‌-ট্যাক্সের মতো। প্রত্যেক সেকেন্ডে দশ কোটি কোটি পরমণুর মধ্যে একটি করে ভেঙে যায়। পরমাণু যত ভাঙে মোটমাট ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা তত কমে আসতে থাকে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা যত কমে, পরমাণু ভেঙে পড়ার সংখ্যাও তত কমে। ঠিক যেমন টেলিভিশন সেটের দাম কমার সাথে সাথে কমে যায় সেল্‌স্‌-ট্যাক্স।

মনে কর, ইউরেনিয়াম ভাঙতে ভাঙতে সেই তাল থেকে মোটে আধ পাউন্ড ইউরেনিয়াম বাকি আছে। তাহলে শুরুর চাইতে এখন অর্ধেক পরমাণু ভাঙবে প্রতি সেকেন্ডে। তারপর যখন মাত্র পোয়া পাউন্ড ইউরেনিয়াম বাকি থাকবে, তখন ভাঙার হারও হবে এক-চতুর্থ। ইউরেনিয়ামের তাল কমতে কমতে যত ছোট হবে এর ভাঙার হারও হবে ক্রমে ক্রমে তত কম।

এ যেন আমরা ট্রেনে চড়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা শহরে যাচ্ছি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে। এই একই গতিতে চললে ঠিক এক ঘণ্টায় শহরটাতে পৌঁছানো যেত। কিন্তু মনে কর, ট্রেন যতই যায় তত এর গতি এমনভাবে কমতে থাকে যে, শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে থাকতে এর গতি হয় ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল মাত্র। এই গতিতে বাকি দূরত্বটা যেতে অন্তত আরো এক ঘণ্টা লাগবে।

যদি ট্রেনটার গতি অনবরতই কমতে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো

banglainternet.com

তেজস্ক্রিয় শ্রেণীর নমুনা। যেটার কথা আমরা এতক্ষণ বললাম সেটা ইউরেনিয়াম-২৩৮ শ্রেণী।

কাজেই যে-কোন এক খণ্ড ইউরেনিয়াম আকরিকে শুধু যে ইউরেনিয়াম-২৩৮ থাকে তাই নয় সীসা-২০৬ সহ ইউরেনিয়াম-২৩৮ শ্রেণীর সব মৌলই থাকে। এই শ্রেণীতে আছে মোটমাট আঠারটি আইসোটোপ (৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠার নকশা দেখ)। এর প্রতিটি আইসোটোপ যেমন ভেঙ্গে যাচ্ছে, তেমনি সাথে সাথে আবার তৈরিও হচ্ছে (এই অবস্থাকে বলা হয় **তেজস্ক্রিয় স্থিতিশীলতা**)। যে আইসোটোপ যত অস্থায়ী সেটা থাকে তত কম মাত্রায়, কিন্তু কিছু-না-কিছু থাকেই।

এই জন্যেই পৃথিবীতে আজো অল্প পরিমাণে স্বল্পস্থায়ী আইসোটোপ দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া এতে বোঝা যায় কেন ইউরেনিয়াম পরমাণু আলফা কণিকার সঙ্গে সঙ্গে বেটা কণিকাও ছুড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়। আসলে ইউরেনিয়াম-২৩৮ শুধু আলফা কণিকা আর গামারশ্মি ছুড়ে দেয়, বেটা কণিকা ছোড়ে না। কিন্তু ভেঙ্গে পড়ার পরবর্তী পর্যায়ে যে সব জিনিস সৃষ্টি হয় তার কোন কোনটা বেটা কণিকা ছুড়ে দিতে থাকে। তাই মনে হয় ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকেই বুঝি বেটা কণিকা বেরোচ্ছে।

ভেঙেপড়া এই সব পরবর্তী পর্যায়ের জিনিস সৃষ্টির আর একটা ফল এই যে, ইউরেনিয়াম থেকে আমরা আগের অধ্যায়ে যতটা তেজ সৃষ্টির কথা বলেছিলাম তার চেয়েও বেশি তেজ সৃষ্টি হয়। ইউরেনিয়াম থেকে তো তেজ সৃষ্টি হয়ই তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন জিনিসও ভেঙ্গে গিয়ে তেজ সৃষ্টি করে।

ইউরেনিয়াম-২৩৮ আর তার তেজস্ক্রিয় শ্রেণীর অন্যান্য জিনিস থেকে যেসব আলফা কণিকা বেরোয় সেগুলো আসলে হিলিয়াম পরমাণুকেন্দ্র, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আলফা কণিকা আশপাশ থেকে দুটি করে ইলেকট্রন পাকড়াও করে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এইভাবে একটি ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু ভেঙ্গে একটি সীসা-২০৬ হতে হতে আটটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হয়। ইউরেনিয়ামের আকরিকটি যদি যথাযথ ধরনের হয় তাহলে এই হিলিয়ামের খানিকটা অংশও ইউরেনিয়ামের সাথে স্থায়ীভাবে বন্দী হয়ে থাকে।

তোমরা হয়তো ভাবছ, ইউরেনিয়াম আকরিকে কতটা হিলিয়াম জমা আছে তা থেকে হিসেব করে হয়তো বলা যাবে এই ইউরেনিয়াম কতদিন ধরে ভেঙ্গে পড়ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে হিলিয়াম গ্যাসটা হল অতি হালকা, তাই এর খানিকটা যে কোনভাবেই হোক পালিয়ে যায়। যেটুকু বাকি থাকে শুধু সেটুকুর ওপর ভরসা করে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু হিসেব করা আদৌ সম্ভব নয়।

তবে ইউরেনিয়াম থেকে যে সীসা তৈরি হয় সেটা আকরিকের সাথে স্থায়ীভাবে থেকে যায় (অন্তত যতক্ষণ আকরিক কঠিন অবস্থায় থাকে)। মার্কিন রসায়নবিদ বার্ট্রাম বোর্ডেউড্ (Bertram Borden Boltwood) ১৯০৫ সালে বললেন, আকরিকে ইউরেনিয়ামের সাথে সীসার পরিমাণ তুলনা করে বলা যেতে পারে আকরিকটি কতদিন ধরে কঠিন অবস্থায় রয়েছে।

এখানে একটা অসুবিধে হল আকরিকের খানিকটা সীসা হয়তো গোড়াতেই সীসা হিসেবে ছিল, ইউরেনিয়াম ভাঙ্গার পরবর্তী পর্যায়ে সীসা হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে, সীসার রয়েছে চারটি আইসোটোপ ; তার মধ্যে একটি, সীসা-২০৪ কোন রকম তেজস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় না। কাজেই সীসা ২০৪-এর পরিমাণ মেপে বলা যায় কতটা সীসা গোড়া থেকেই সীসা অবস্থায় ছিল। বাকি সীসাটা তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন থেকে এসেছে, কাজেই তাদের মাপ নিয়ে আকরিকের বয়স বের করা যায়।

এই ধরনের হিসেব (এবং তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গার ভিত্তিতে অন্যান্য হিসেব) থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর ভূত্বক অন্তত ৪৫০,০০,০০,০০০ বছর ধরে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। সূর্য এবং সমগ্র সৌরজগতের বয়স ৫০০,০০,-০০, ০০০ বছরও হতে পারে।

ইউরেনিয়াম-২৩৮ শ্রেণীটি সবচেয়ে নামকরা এবং বয়স স্থির করার জন্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও এটিই একমাত্র তেজস্ক্রিয় শ্রেণী নয়।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং থোরিয়াম-২৩২ এই দুটি দীর্ঘজীবী আইসোটোপ থেকেও তেজস্ক্রিয় শ্রেণী তৈরি হয়। যে-কোন শ্রেণীর সদস্যদের অন্য শ্রেণীর সদস্যদের সাথে বেশ মিল আছে, তা বলে তারা হুবহু এক রকম নয়। এই কটি শ্রেণীর একটির সদস্য অন্য দুটির কোনটির সদস্য নয়। (যে কোন এক খণ্ড ইউরেনিয়াম আকরিকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম-২৩৫ শ্রেণীর সব সদস্য রয়েছে। ফ্রান্সিয়াম-২২৩, যার কথা

banglainternet.com

কয়েক পৃষ্ঠা আগে উল্লেখ করেছি, এই শ্রেণীর সদস্য ; তাই এর সবচেয়ে স্থায়ী আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল মাত্র একশ মিনিট হলেও কিছুটা ফ্রান্সিয়াম প্রকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়।)

ইউরেনিয়াম-২৩৫ আর থোরিয়াম-২৩২ শ্রেণীর শেষ হয় সীসায়, তবে সেগুলো ইউরেনিয়াম-২৩৮ শ্রেণী থেকে যে সীসার আইসোটোপ হয় সেটা নয়। ইউরেনিয়াম-২৩৫ শ্রেণীর শেষে তৈরি হয় সীসা-২০৭ আর থোরিয়াম-২৩২ শ্রেণীর শেষে পাওয়া যায় সীসা-২০৮।

ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম ছাড়া ৮৩-এর চেয়ে বেশি পারমাণবিক সংখ্যার আর কোন মৌলের এমন দীর্ঘজীবী আইসোটোপ নেই যা আজকের দিন পর্যন্ত আপনাআপনি টিকে থাকতে পারে। অন্যান্য মৌল তৈরি হয় শুধু ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের ভেঙে পড়ার সময়ে, আর তাই খুব অল্প সময়ের জন্যে।

৮৩ আর তার নিচে তেজস্ক্রিয়া

আমরা আগেই বলেছি, ৮৩-র বেশি যেসব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা সেগুলো সবই তেজস্ক্রিয়। এদের কোন স্থায়ী আইসোটোপ নেই। এবার প্রশ্ন হবে : তাহলে কি ৮৩ বা তার কম যেসব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা সেগুলোর সবারই স্থায়ী আইসোটোপে আছে? বেশির ভাগেরই আছে সে তো জানা কথা। কিন্তু সবারই আছে কি?

১৯২৫ সালের মধ্যে ভূত্বকে ১ (হাইড্রোজেন) থেকে ৮৩ (বিসমাথ) পর্যন্ত পারমাণবিক সংখ্যাঅলা সবগুলো মৌলের হদিস পাওয়া গেল—শুধু দুটি ছাড়া। এই তালিকায় ১ থেকে ৮৩ পর্যন্ত প্রতিটি মৌলেরই মনে হল অন্তত একটি করে স্থায়ী আইসোটোপ রয়েছে। হারিয়ে যাওয়া মৌল দুটির পারমাণবিক সংখ্যা হল ৪৩ আর ৬১। তাদের যে স্থায়ী আইসোটোপ কেন থাকবে না সেটা বোঝা মুশকিল হল। মনে হল হয়তো এরা অতি দুষ্প্রাপ্য মৌল, তাই খুব ভাল করে এদের খুঁজতে হবে। রসায়নবিদরা সব সময় তাদের খোঁজে থাকলেন। মাঝেমধ্যে দু-একজন রসায়নবিদ ঘোষণা করতেন, এই দুটি মৌলের একটির হদিস পেয়ে গিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৯৩০ সালের পর পর মৌলিক পদার্থের অধিকাংশ তালিকায় ৪৩ নম্বর মৌলকে 'মাসুরিয়াম' (জার্মানির একটি

জেলার নামে) এবং ৬১ নম্বর মৌলকে 'ইলিনিয়াম' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলিয়ন অঞ্চলের নামে) বলে উল্লেখ করা হত। অবশ্য দুটো নামের পরেই প্রশ্নচিহ্ন যোগ করা হত, তাতে বোঝাত বিজ্ঞানীরা এদের সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিত নন।

১৯৪০ সালের দিকে বোঝা গেল আগের সব আবিষ্কারের খবর ঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যে কোন কারণেই হোক, ৪৩ ও ৬১ নম্বর মৌলের আদৌ কোন স্থায়ী আইসোটোপ নেই। ৪৩ নম্বর মৌলের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অর্ধজীবনকালঅলা আইসোটোপের ভরসংখ্যা ৯৯ ; এর অর্ধজীবনকাল ২০০,০০০ বছর। ৬১ নম্বর মৌল এতটা স্থায়ী নয়। এর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপের (ভরসংখ্যা ১৪৫) অর্ধজীবনকাল ৩০ বছর।

এর ফলে যদি এই আইসোটোপগুলো কোন দীর্ঘজীবী তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে সৃষ্টি না হয়, তাহলে এদের ভূত্বকে থাকবার কথা নয়। আসলেও তাই, এদের ভূত্বকে মোটেই পাওয়া যায় না।

তুমি হয়তো বলবে : একটু দাঁড়ান! এগুলো যদি পৃথিবীতে আদৌ না থাকবে তাহলে এদের আইসোটোপ, অর্ধজীবনকাল এসব কথা আমরা জানলাম কি করে? এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। এ বইয়ের আরো খানিকটা পরে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

এবার আমরা ১৯ নম্বর মৌল **পটাসিয়ামকে** একটু পরীক্ষা করে দেখি। ভূত্বকে যে ডজনখানেক মৌল সবচেয়ে বেশি আছে তাদের মধ্যে পটাসিয়াম একটি ; আবার জীবদেহে যে ডজনখানেক মৌল সবচেয়ে বেশি তার মধ্যেও পটাসিয়াম পড়ে। মানুষের দেহের শতকরা এক ভাগ হল পটাসিয়াম। (অর্থাৎ এক শ' পাউন্ড ওজনের একটি ছেলের শরীরে এক পাউন্ড পটাসিয়াম আছে।) অনেক সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম রয়েছে। এমনিতে মনে হবে, এতে অসাধারণ কিছুই নেই।

পটাসিয়ামের আছে প্রধানত দুটো আইসোটোপ। এর বড় অংশ, শতকরা ৯৩·৩ ভাগ, হল পটাসিয়াম-৩৯ ; এর কেন্দ্রে আছে ১৯টি প্রোটন আর ২০টি নিউট্রন। বাকিটার অধিকাংশ হল পটাসিয়াম-৪১, এর কেন্দ্রে প্রোটন ১৯টি আর নিউট্রন ২২টি। অবশিষ্ট হল পটাসিয়াম-৪০। পটাসিয়াম পরমাণুর প্রতি ১০,০০০টিতে মাত্র একটি হল পটাসিয়াম-৪০ ; তবু এই আইসোটোপটিই হল সবচাইতে কৌতূহলোদ্দীপক। এর পরমাণুকেন্দ্রে

banglainternet.com

আছে ১৯টি প্রোটন আর ২১টি নিউট্রন। এই দুটোই বেজোড় সংখ্যা, এতে সচরাচর (যদিও সব সময় নয়) বোঝা যায় পরমাণুকেন্দ্রটি অস্থায়ী। পটাসিয়াম-৪০ সত্যি সত্যি অস্থায়ী। এটা তেজস্ক্রিয় ; একথা প্রথম আবিষ্কার করেন ইংরেজ পদার্থবিদ নরমান ক্যাম্পবেল (Norman Robert Campbell) ১৯০৬ সালে।

পটাসিয়াম-৪০ হল ভূত্বকের সবচাইতে হালকা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। মানুষের শরীরেও অবশ্য এর অস্তিত্ব রয়েছে। আগে যে এক শ' পাউণ্ড ওজনের ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার শরীরে পটাসিয়াম-৪০ আছে $\frac{১}{৬০০}$ আউন্স। এতে বোঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের শরীর, শুধু তাই নয়, প্রতিটি জীবিত প্রাণীর দেহ অতি সামান্য মাত্রায় তেজস্ক্রিয়।

পটাসিয়াম ৪০-এর অর্ধজীবনকাল ১৩০ কোটি বছর। ভূত্বক সৃষ্টি হবার পর থেকে প্রতি দশটা পটাসিয়াম-৪০ পরমাণুর মধ্যে ন'টা এরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে, দশটার বাকি একটা এখনও রয়ে গিয়েছে।

পটাসিয়াম-৪০ বেটা কণিকা ছুড়ে দেয়। যে পরমাণুটি বেটা কণিকা ছুড়ে দেয় তার পারমাণবিক সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে হয় ২০, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম। এতে ভরসংখ্যার পরিবর্তন হয় না। এভাবে পটাসিয়াম-৪০ রূপান্তরিত হয় স্থায়ী ক্যালসিয়াম ৪০-এ। দেখা যাচ্ছে, ইউরেনিয়াম-বা থোরিয়ামের মতো পটাসিয়াম-৪০ থেকে কোন তেজস্ক্রিয় শ্রেণী শুরু হয় না ; মাত্র এক ধাপেই এটা স্থায়ী রূপ নেয়।

তা বলে সব পটাসিয়াম-৪০ পরমাণু কিন্তু বেটা কণিকা ছুড়ে দিয়ে ভেঙে যায় না। ১৯৩৬ সালে জাপানী পদার্থবিদ হিদেকি ইউকাওয়া (Hideki Yukawa) দেখালেন যে, একটি পরমাণুতে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপারও ঘটা সম্ভব। একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তাকে বেটা কণিকা হিসেবে ছুড়ে ফেলার বদলে পরমাণু একটা ইলেকট্রন পাকড়াও করে তাকে পরমাণুকেন্দ্রে টেনে নিতেও পারে।

এ রকম ইলেকট্রন আসবে কোথা থেকে ? যেসব ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রের চারপাশে কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় তাদের থেকে হওয়াই স্বাভাবিক। পরমাণুকেন্দ্রের সবচাইতে কাছের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন পাকড়াও করাই হবে সবচাইতে সহজ। সবচাইতে ভেতরের ইলেকট্রন খোলসকে বলা হয় **কে-খোলস**, তাই এই খোলস থেকে পরমাণুকেন্দ্রে ইলেকট্রন গ্রাস করাকে বলা হয় **কে-গ্রাস**।

যে ইলেকট্রনকে পরমাণুকেন্দ্র গ্রাস করে সেটি আর ইলেকট্রন থাকে না, কেননা পরমাণুকেন্দ্রে কোন ইলেকট্রন নেই—থাকতেও পারে না। তার বদলে ইলেকট্রন একটি প্রোটনের আধান নিরপেক্ষ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, কেননা তার নিজের আধানও নিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে প্রোটনটি পরিণত হয় একটি নিউট্রনে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কে-গ্রাসের ফলে পরমাণুকেন্দ্রে একটি প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হয়। এর ভরসংখ্যা বদলায় না, কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা কমে যায় এক ঘর। (এটা হল বেটা কণিকা ছুড়ে দিলে যে অবস্থা হয় ঠিক তার উল্টো অবস্থা।)

১৯৩৮ সালে মার্কিন পদার্থবিদ লুই আলভারেজ (Luis W. Alvarez) দেখালেন পটাসিয়াম-৪০ পরমাণুতেও কখনো কখনো কে-গ্রাস ঘটে। প্রতি ১০০টি পটাসিয়াম-৪০ পরমাণু ভেঙে গেলে তার মধ্যে ৮৯টি বেটা কণিকা ছুড়ে দেয় আর বাকি ১১টি ইলেকট্রন পাকড়াও করে।

পটাসিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১৯ ; কে-গ্রাসের ফলে পারমাণবিক সংখ্যা কমে হয় ১৮—এটা **মৌল আর্গনের** সংখ্যা। কে-গ্রাসের ফলে পটাসিয়াম-৪০ পরিণত হয় আর্গন ৪০-এ।

পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এত পটাসিয়াম-৪০ ভেঙে পড়েছে যে, বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে আর্গন-৪০ রয়েছে। আর্গন তথাকথিত **বনেদী গ্যাসদের** দলে পড়ে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এসব গ্যাসের বেশির ভাগই পৃথিবী সৃষ্টির সেই আদি যুগে হারিয়ে গিয়েছে। তার ফলে বনেদী গ্যাসেরা সবাই অতি দুষ্প্রাপ্য। এদের মধ্যে আর্গন হল সবচাইতে কম দুষ্প্রাপ্য, সে প্রধানত আর্গন ৪০-এর জন্যে। বায়ুমণ্ডলে সব গ্যাসের শতকরা এক ভাগ হল আর্গন-৪০ ; তার অর্থ এই গ্যাস রয়েছে বহু শত কোটি টন। আর এ সবই আসছে আদতে পটাসিয়াম-৪০ থেকে।

এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় এ রকম হালকা আইসোটোপ (অর্থাৎ যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ৮৩ বা তার নিচে) আরো রয়েছে যেগুলো তেজস্ক্রিয় ; এদের সংখ্যা গোটা পনের হবে। এদের অর্ধজীবনকাল পটাসিয়াম ৪০-এর চাইতে লম্বা ; কোন কোন ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম-২৩৮ বা থোরিয়াম ২৩২-এর চেয়ে বহু হাজার গুণ লম্বা। এতে বোঝা যায় এদের তেজস্ক্রিয়া অতি দুর্বল। এরা সবাই মাত্র একবার ভেঙেই স্থায়ী রূপ নেয়।

banglainternet.com

কোন্ আইসোটোপ যে পুরোপুরি স্থায়ী আর কোন্‌টা যে অতি সামান্য মাত্রায় তেজস্ক্রিয় তা বলা খুব শক্ত। ১৯৫১ সালে কয়েকজন বিজ্ঞানী জানালেন যে, বিসমাথ-২০৯ (বিসমাথের একমাত্র প্রাকৃতিক আইসোটোপ, পারমাণবিক সংখ্যা ৮৩) তেজস্ক্রিয় আর এ থেকে আল্‌ফা কণিকা বেরিয়ে আসে। (এর আগে পর্যন্ত একে স্থায়ী বলে ভাবা হত।) বিজ্ঞানীরা বললেন, এর অর্ধজীবনকাল বহু লক্ষ-কোটি বছর। এই অর্ধজীবনকাল এত লম্বা আর এর তেজস্ক্রিয়া এত কম যে, পুরো এক পাউন্ড বিসমাথ-২০৯ থেকে প্রতি মিনিটে মাত্র গোটা দশেক আল্‌ফা কণিকা বেরিয়ে আসে। এর সাথে তুলনা করা যায় এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম আর পরবর্তী ভেঙে পড়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে প্রতি মিনিটে বেরোয় প্রায় পাঁচ শ' কোটি আল্‌ফা কণিকা।

মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষ যেমন অমর নয় তেমনি হয়তো আসলে কোন আইসোটোপই পুরোপুরি অবিনশ্বর নয়। যদি আমাদের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট সূক্ষ্ম হত তাহলে হয়তো দেখা যেত প্রত্যেকটি আইসোটোপই অতি সামান্য পরিমাণে হলেও তেজস্ক্রিয়।

কিংবা হয়তো সবাই তেজস্ক্রিয় শুধু একটি ছাড়া। এমন মনে করার কারণ রয়েছে যে, আইসোটোপদের মধ্যে লোহা ৫৬-এর চেয়ে স্থায়ী আর কোনটাই নয়। যদি আমাদের এই বিশ্ব কোটি কোটি কোটি কোটি বছর টিকে থাকত তাহলে হয়তো আর সব পরমাণু শেষ পর্যন্ত একদিন লোহা ৫৬-এর পরমাণুতে পরিণত হত।

পরমাণুর ছররাগুলি

কিমিয়ার স্বপ্ন

এক জিনিসকে বদলে অন্য জিনিসে পরিণত করা যায় এটা মানুষ জেনেছে সেই আদি কাল থেকেই। বহু হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সবজা রঙের এক রকম পাথরকে যদি বিশেষ একভাবে তাপ দেওয়া যায় তাহলে তা থেকে লালচে এক ধাতু (তামা) পাওয়া যায়। অন্যান্য ধরনের পাথরকে এ ধরনের তাপ দিয়ে পাওয়া যায় লোহা, সীসা, টিন এবং অন্যান্য ধাতু।

এমনি করে পাওয়া ধাতুকেও আবার বদলানো যেত। চকচকে ধাতু থেকে পাওয়া যেত অনুজ্জ্বল, ভঙ্গুর মরচে। কয়েক রকম ধাতু মিশিয়ে তৈরি হত নতুন ধরনের ধাতু যার চেহারা আর গুণাগুণ দুই-ই ভিন্ন। যেমন, টিনের সাথে তামা মিশিয়ে পাওয়া যেত ব্রোঞ্জ ধাতু। ব্রোঞ্জ তামার চাইতে বেশি হলদে আর তামা বা টিন এই দুইয়ের চাইতে বেশি মজবুত।

ধাতু ছাড়া অন্যান্য জিনিসেও পরিবর্তন ঘটানো যায়। আঙুরের রসকে

banglainternet.com

যদি উষ্ণ, অন্ধকার জায়গায় রেখে দেওয়া যায় তাহলে সেটা ক্রমে ক্রমে মদে পরিণত হয়। আদিম মানুষও তার চারপাশে নানা ধরনের পরিবর্তনের কথা বুঝতে পারত আর তার ইচ্ছেমতো কতকগুলো পরিবর্তন ঘটাতে পারত।

চারপাশের নানা রকম পরিবর্তন দেখে তাদের পক্ষে এটা ভাবা মোটেই আশ্চর্য কিছু ছিল না যে, যে-কোন জিনিসকে বদলে অন্য যে-কোন জিনিসে পরিণত করা যায়। দরকার শুধু ঠিকমতো পরিবর্তন ঘটাবার কায়দাটা জানা। জানতে হবে কি কি রাসায়নিক উপাদান মেশাতে হবে আর ঠিক কিভাবে কতখানি তাপ দিতে হবে।

মধ্যযুগের শেষভাগে কিছু কিছু লোক এক জিনিসকে অন্য জিনিসে পরিণত করার বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন। তাঁদের এই শাস্ত্রকে বলা হত **কিমিয়া** শাস্ত্র আর তাঁদের বলা হয় কিমিয়ার সাধক।

কিমিয়ার সাধকরা বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন সোনা তৈরির ব্যাপারে। সোনা মানে বোঝাত ধন-দৌলত, আর সোনা পাওয়া যেত শুধু মাটি থেকে খুঁড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে মাটিতে খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যেত সোনা আর তাকে বের করাও ছিল অতি কষ্টসাধ্য।

এর চেয়ে অনেক সোজা হবে যদি তুমি এমন জিনিস নাও যা সোনার মতো অত দুষ্প্রাপ্য নয়, তারপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাকে সোনা বানিয়ে ফেলতে পার। পারদ একটা ধাতু, কিন্তু এটার রঙ হলুদ নয় ; গন্ধকের রঙ হলুদ কিন্তু এটা ধাতু নয়। মনে কর, এদের দুটিকে এক সাথে মিশিয়ে গুঁড়ো করে তাপ দেওয়া হল বা আর কিছু করা হল। এতে কি এমন কোন নতুন জিনিস পাওয়া যেতে পারে, যা ধাতুও আবার রঙেও হলুদ—অর্থাৎ কিনা সোনা?

কিছু কিছু ফাঁকিবাজও এসে জুটল, যারা যে-কোন জিনিসকে বদলে সোনা করে দেবার ক্ষমতা দাবী করতে লাগল। তার ফলে কিমিয়ার এমন বদনাম হল যে, পণ্ডিত লোকেরা এর কোন কিছুরই তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। যাই হোক, ক্রমে ক্রমে এক জিনিসকে কি করে বদলে অন্য জিনিস করা যায় সে শাস্ত্রের নাম হল 'কেমিস্ট্রি' বা রসায়ন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পরমাণু-তত্ত্বের সৃষ্টি হবার পর রসায়ন-বিদরা বুঝেছেন, যে-কোন উপায়েই হোক অন্য কিছুকে সোনায় পরিণত করা অসম্ভব। তাঁরা জেনেছেন, এক জিনিস অন্য জিনিসে পরিণত হবে শুধু তার অণু-পরমাণুর গড়নে যদি পরিবর্তন আনা যায়।

banglainternet.com

আঙুরের রসে আছে চিনি। চিনির অণুতে (মনে রাখবে আমরা আগেই বলেছি, অণু হল কতকগুলো আন্তরীয় পরমাণুদের জোট বাঁধা) আছে ৪৫টি পরমাণু। এর মধ্যে ১২টি হল কার্বন পরমাণু, ২২টি হাইড্রোজেন পরমাণু, আর ১১টি অক্সিজেন পরমাণু। আঙুরের রসকে যদি রেখে দেওয়া যায় তাহলে এতে জন্মায় ঈস্ট বা **খমির** নামে এক রকম আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ; আর এরা চিনির অণুকে ভেঙে দিয়ে অ্যালকোহল আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড অণু তৈরি করে। অ্যালকোহলের প্রতিটি অণুতে আছে ন'টি পরমাণু—২টি কার্বনের, ৬টি হাইড্রোজেনের আর ১টি অক্সিজেনের। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রতিটি অণুতে আছে ৩টি পরমাণু—১টি কার্বনের আর ২টি অক্সিজেনের।

পরমাণুদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। অ্যালকোহলের কার্বন পরমাণুগুলি ঠিক চিনিতে কার্বন পরমাণু যেমন ছিল তেমনি আছে। হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন পরমাণুর বেলাতেও একথা সত্যি। শুধু পরমাণুদের জোট বাঁধার কায়দায়, তাদের সাজানোতে পরিবর্তন হয়েছে। (কিন্তু এর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে আঙুরের রস আর মদের মধ্যে এতখানি তফাত।)

সবুজ রঙের এক রকম পাথর থেকে তামা পাওয়া যায় ; তার কারণ এই পাথরের অণুতে অন্যান্য জাতের পরমাণুর সাথে তামার পরমাণুও রয়েছে। বিশেষ পদ্ধতিতে এই তামা পৃথক হয়ে আসে, কিন্তু তা বলে তামা সৃষ্টি হয় না। লোহায় যখন মরচে ধরে তখন লোহার পরমাণুর সাথে মেশে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণু ; লোহার পরমাণুরা মোটেই ধ্বংস হয় না।

এসব পরিবর্তন যা আমরা দেখি সে যেন অনেকটা রঙিন সুতো দিয়ে তৈরি নকশার মতো। লাল, সবুজ, নীল আর হলুদ রঙের সুতো দিয়ে আমরা নানা ধরনের নকশা তৈরি করতে পারি। কিন্তু একটা নকশার লাল সুতো আর অন্য নকশার লাল সুতোর মধ্যে কোন তফাত নেই। রঙিন সুতোর নকশা বানিয়ে আমরা সুতোর রঙ পাল্টে দিতে পারিনে।

একই রকমভাবে, পরমাণু সাজানোর কায়দা যতই বদলানো যাক না কেন এক জাতের পরমাণুকে অন্য জাতের পরমাণুতে বদলে ফেলা যায় না।

কিমিয়ার সাধকরা যখন পারদ বা সীসাকে সোনায় পরিণত করতে চাচ্ছিল তখন তারা ঠিক এই রকম পরিবর্তনই ঘটাতে চাচ্ছিল। তারা পারদ বা সীসার পরমাণুকে বদল করে ফেলতে চাচ্ছিল সোনার পরমাণুতে। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল একেবারেই তাদের সাধ্যের অতীত।

ঊনিশ শতকের রসায়নবিদরা বুঝলেন এ রকম পারমাণবিক রূপান্তর মানুষের ক্ষমতার বাইরে। তাঁরা ভেবেছিলেন, পরমাণুরা পরিবর্তনহীন, এদের ভাঙাও যায় না, বদলানোও যায় না। তাঁরা ভাবলেন, বস্তুর রূপান্তর নেহাতই কিমিয়ার অবাস্তব স্বপ্ন।

এমনি সময় তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কৃত হল।

ইলেকট্রনদের বাধা ডিঙানো

তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় বোঝা গেল পরমাণুতে রূপান্তর ঘটে। ইউরেনিয়াম পরমাণু ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে রেডিয়াম প্রভৃতি নানা মৌল সৃষ্টি করে আর সবশেষে পরিণত হয় সীসাতে। থোরিয়ামের বেলাতেও তেমনি হয়।

হয়তো মনে হতে পারে তেজস্ক্রিয়া একটা খুব বিশেষ ধরনের কিছু। প্রথমত, শুধু বড় পারমাণবিক সংখ্যাঅলা গুটিকতক পরমাণুতেই তেজস্ক্রিয়া দেখা গেল। দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল তেজস্ক্রিয় ভাঙন মানুষ ঘটাতেও পারে না, বদলাতেও পারে না। একে চালুও করা যায় না, বন্ধও করা যায় না ; এর গতি কমানোও যায় না, বাড়ানোও যায় না।

সচরাচর তাপমাত্রা বাড়ালে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়। কখনো কখনো এই গতি এমন বাড়ে যে, রাসায়নিক উপাদানের যে মিশেল সাধারণ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ তাতে তাপ দিলে হঠাৎ প্রচণ্ড রকম বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ওপর তাপের কোন প্রভাব আছে বলে মনে হয় না।

রেডিয়ামের অর্ধজীবনকাল হল ১,৬২০ বছর। একে ঠাণ্ডা করে তাপ-মাত্রা শূন্যের বহু ডিগ্রী নিচে নামানো যায়, কিংবা তাপ দিয়ে গনগনে গরম করে ফেলা যায়। কিন্তু তবু পরমাণুর ভাঙা একইভাবে চলতে থাকে। আর এর অর্ধজীবনকালও তেমনি ১,৬২০ বছরই থাকে। রেডিয়ামের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া যাক, বা আর যাই কিছু করা যাক, এর অর্ধজীবনকালের কোন পরিবর্তন হয় না। রেডিয়াম অন্য নানা পরমাণুর সাথে অণুতে জোট বেঁধে থাকতে পারে ; কিন্তু এমনি অণুতে জোট বাঁধায় এর ভেঙে পড়ায় কোন পরিবর্তন হয় না।

এসব থেকে মনে হল, রসায়নবিদদের ধারণায় তেমন বিশেষ বদল হবে না। "পরমাণুর পরিবর্তন হয় না" একথা না বলে এবার থেকে বলতে হবে "মানুষ পরমাণুতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।"

কিন্তু দেখা গেল, এটাও সত্যি নয়।

মুশকিল হল, পুরনো ধরনের সব রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরমাণুর শুধু একেবারে বাইরের খোলসের ইলেকট্রনে পরিবর্তন হয়।

তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভেঙে পড়ার কায়দা বদলাতে হলে কিংবা এক পরমাণুকে বদলে অন্য পরমাণু করতে হলে এই ইলেকট্রনদের ডিঙিয়ে যেতে হবে। ঢুকতে হবে একেবারে পরমাণুকেন্দ্রে আর সেখানকার মালমশলায় রদ-বদল করতে হবে। কিন্তু ইলেকট্রনরা হালকা হলেও পরমাণুকেন্দ্রকে কড়া শান্ত্রীর মতো পাহারা দেয়। খুব কম জিনিসই এই ইলেকট্রনের বেড়াজাল ডিঙাতে পারে।

ইলেকট্রনের বাধা ডিঙিয়ে যাবার একটা উপায় হল, রাদারফোর্ডের মতো (২৪ পৃষ্ঠা দেখ) পরমাণুকে এমন সব কণিকা দিয়ে আঘাত করা, যেগুলো এত ছোট আর দ্রুতগামী যে, ইলেকট্রনদের বাধা ঠেলে চলে যেতে পারে। যদি এমনি বহু কণিকা ছোড়া হয় পরমাণুর দিকে, তাহলে ইলেকট্রন তার সবগুলোকে ঠেকাতে পারবে না, আর তাই গুটিকয়েক নিশ্চয়ই গিয়ে আঘাত করবে পরমাণুকেন্দ্রে। (ইলেকট্রনরা যেন এক মুষ্টিযোদ্ধার হাত আর থাবার মতো, তারা অন্য আরেক মুষ্টিযোদ্ধার ঘুষি ঠেকাতে পারে, কিন্তু গুলির সামনে অকেজো।)

এমনি ছোট ছোট আর দ্রুতগামী কণিকা পাওয়া সম্ভব। পৃথিবী আর তার ওপরকার সব জিনিসে, মায় তোমার আমার শরীরে অনবরত এসে পড়ছে এমনি সব গুলি। এদের কথা একটু বিবেচনা করা যাক।

আগেই বলেছি, ছুটন্ত আধানযুক্ত কণিকা পরমাণুর সাথে ধাক্কা খেলে তার গা থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বের করে দিয়ে আয়ন সৃষ্টি করে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ—আলফা রশ্মি, বেটা রশ্মি আর গামারশ্মি—সবই হল **আয়ন সৃষ্টি-কারী বিকিরণ**। তারা যে আয়ন সৃষ্টি করে মেঘকক্ষ, বুদবুদ-কক্ষ প্রভৃতি—যন্ত্রে তার নিশানা করে এই সব বিকিরণের অস্তিত্ব বোঝা যায়। (২০ ও ২১ পৃষ্ঠা দেখ)

banglainternet.com

তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের পর প্রথম ক' বছর এসব কণিকার নিশানা করার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। তখন তার চেয়ে অনেক সরল **বিদ্যুৎবীক্ষণ** নামে একটা যন্ত্র এজন্যে ব্যবহার করা হত। এতে একটা বন্ধ পাত্রের ওপরকার মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া ধাতব দণ্ডের গায়ে দুখণ্ড সোনার পাত লাগানো থাকে।

এই দণ্ডের ওপরকার গোল প্রান্তে যদি বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কোন জিনিস ছোঁয়ানো যায়, তাহলে সেই আধান ধাতব দণ্ড বেয়ে এসে পৌঁছয় নিচের দুটি স্বর্ণপাতে। দুটি পাতে একই জাতের আধান হওয়ায় এরা বিকর্ষণ করবে পরস্পরকে, আর একে অন্যের থেকে সরে যাবে উল্টো ইংরেজি V অক্ষরের মতো।

এই আধান যদি কোনমতে চুঁইয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে ক্রমে ক্রমে সোনার পাত দুটো আবার এক সাথে হয়ে গায়ে গায়ে লেগে যাবে। বিদ্যুৎবীক্ষণ যন্ত্রটাকে যদি অন্য আর সব জিনিস থেকে দূরে বিশুদ্ধ, শুকনো হাওয়ায় রাখা যায় তাহলে বিদ্যুৎ চুঁইয়ে পালিয়ে যাবার কথা নয়। সোনার পাত দুটো দূরে সরে গেলে তাদের দূরেই সরে থাকার কথা।

তবে পাত দুটোর কাছে হাওয়ায় যদি আয়ন থাকে তাহলে এই আয়ন খানিকটা আধানকে নিরপেক্ষ করে দিতে পারে। অর্থাৎ কাছাকাছি আয়ন থাকলে বিদ্যুৎবীক্ষণের আধান বেরিয়ে যায় আর তার পাত দুটো চুপসে কাছাকাছি এসে পড়ে। আয়ন যত বেশি থাকে পাত দুটো চুপসে যায় তত তাড়াতাড়ি।

স্বভাবতই কাছাকাছি তেজস্ক্রিয় কিছু থাকলে তাদের বিকিরণ থেকে সৃষ্টি হয় আয়ন আর তাতে বিদ্যুৎবীক্ষণ আধানমুক্ত হয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু তেজস্ক্রিয় কিছু আদৌ কাছে না থাকলেও বিদ্যুৎবীক্ষণ যন্ত্র ধীরে ধীরে তার আধান হারিয়ে ফেলে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঠেকাবার জন্যে বিদ্যুৎবীক্ষণের চারপাশে যদি সীসার পাত দিয়ে ঢাকা দেয়া যায় তাহলে আধান হারায় খুব ধীরে ধীরে, তবু এর আধান হারায়ই।

বোঝা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয় বস্তু কাছাকাছি না থাকলেও আশেপাশে কিছু-না-কিছু বিকিরণ রয়েছেই। শুধু তাই নয়, এই বিকিরণ রীতিমতো তীক্ষ্ণ।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এই বিকিরণ আসছে মাটি থেকে। এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ১৯১১ সালে ভিক্টর হেস্ (Victor Francis Hess)

নামে এক অস্ট্রীয় পদার্থবিদ বেলুনে করে বিদ্যুৎবীক্ষণ যন্ত্র অনেক উঁচুতে তুললেন। তাঁর ধারণা ছিল আকাশে যত ওপরে ওঠা যাবে বিদ্যুৎবীক্ষণের আধান হারাবে তত ধীরে ধীরে। ওপরে উঠতে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো আধান হারান একেবারে বন্ধ হবে ; কেননা, মাটি থেকে আসা বিকিরণ যতই তীক্ষ্ণ হোক মাইল দুয়েক ওপরে তার আর কোন প্রভাব থাকবে না।

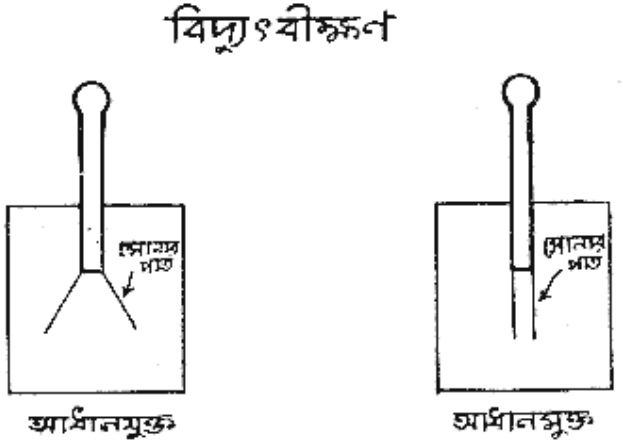

এ অনুমান ভুল প্রমাণিত হল। তিনি বেলুন নিয়ে যত ওপরে উঠলেন, দেখা গেল, বিদ্যুৎবীক্ষণ থেকে আধান হরাচ্ছে তত তাড়াতাড়ি। অর্থাৎ বিকিরণ মাটি থেকে আসছে না, আসছে ওপরের আকাশ থেকে। এই আবিষ্কারের জন্যে হেস্ ১৯৩৬ সালে নোবেল পুরস্কারের একটি অংশ পেলেন।

এই অদ্ভুত বিকিরণ নিয়ে যত পরীক্ষা চলতে লাগল ততই মনে হল এদের উৎপত্তি একেবারে বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোথাও। এরা আসছে 'কস্‌মস্‌' বা মহাবিশ্বের সব দিক থেকে। ১৯২৫ সালে মার্কিন পদার্থবিদ রবার্ট মিলিক্যান (Robert Andrew Millikan) প্রস্তাব করলেন এই বিকিরণের নাম দেওয়া হোক কস্‌মিক রশ্মি বা **নভোরশ্মি** ; বিজ্ঞানীরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন।

banglainternet.com

(১৯১১ সালে, অর্থাৎ ঠিক যে বছর হেস্ নভোরশ্মি আবিষ্কার করলেন, মিলিক্যান খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষা চালিয়ে ইলেকট্রনের আধান মেপে বের করেন। এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান ১৯২৩ সালে।)

কিছুদিন পর্যন্ত রীতিমতো বিতর্ক চলল সত্যি সত্যি নভোরশ্মি কি রশ্মি, না আর কিছু। মিলিক্যান ভাবলেন, এগুলো সত্যি রশ্মি—অনেকটা গামারশ্মির মতো, তবে আরো বেশী শক্তিশালী। কিন্তু পরে দেখা গেল, সাধারণ আলোর মতো কস্মিক রশ্মি একেবারে সোজা পথ ধরে চলে না ; চলতে গিয়ে বেঁকে যায়।

এ আবিষ্কারটা প্রধানত কম্পটনের (যিনি 'ফোটন' আবিষ্কার করেছিলেন, ৭২ পৃষ্ঠা দেখ) কৃতিত্ব। তিনি দুনিয়ার নানান জায়গায় ঘুরে কোথায় কতটা নভোরশ্মি এসে পৌঁছচ্ছে তার মাপ নিতে লাগলেন। এ থেকে তিনি দেখালেন যে, নভোরশ্মির পথ এমনভাবে বেঁকে যায় যাতে বিষুবীয় অঞ্চলের তুলনায় মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এসব রশ্মি বেশি এসে পৌঁছয়।

এদিকে, পৃথিবীর ব্যবহার অনেকটা বিশাল এক চুম্বকের মতো। (এই জন্যেই কম্পাসের কাঁটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে।) নভোরশ্মির পথ যদি বেঁকে যায় তাহলে নিশ্চয়ই তাতে এমন আধানযুক্ত কণিকা রয়েছে যা পৃথিবীর চুম্বকত্বে প্রভাবিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বিজ্ঞানীরা আজ পৌঁছেছেন।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ার আগে পর্যন্ত নভোরশ্মিতে থাকে প্রধানত প্রোটন কণিকা আর কতকগুলো হালকা মৌলের পরমাণুকেন্দ্র ; এগুলো প্রচুর পরিমাণ শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে। একে বলা হয় **প্রাথমিক বিকিরণ**। এই বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের ওপর এসে পড়ে তখন নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। এরা এমন শক্তিশালী যে, যে-কোন পরমাণু-কেন্দ্রে এসে আঘাত করে তাকেই ভেঙে চুরমার করে দেয়। তার ফলে পরমাণুকেন্দ্র থেকে মৌল কণিকা বেরিয়ে চারপাশে ছিটকে পড়ে প্রবল বেগে। এসব কণিকাকে বলা হয় **গৌণ বিকিরণ** ; এরাও প্রায় নভোরশ্মির মতোই শক্তিশালী।

এই গৌণ বিকিরণে এমন কতকগুলো কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল যাদের কথা পদার্থবিদরা আগে জানতেন না। এদের কথা পরের এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

এক নতুন ধরনের কার্বন

পরমাণুতে যখন নভোরশ্মি বা তার গৌণ বিকিরণ এসে আঘাত করে তখন কি হয় তার একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক।

বায়ুমণ্ডলে সবচাইতে বেশি পাওয়া যায় নাইট্রোজেন গ্যাস। নাইট্রো-জেনের সবচেয়ে সাধারণ আইসোটোপ হল (প্রতি হাজার পরমাণুতে ৯৯৬টি) নাইট্রোজেন-১৪। এর পরমাণুকেন্দ্রে আছে সাতটি প্রোটন আর সাতটি নিউট্রন।

কখনো কখনো নভোরশ্মির ধাক্কায় পরমাণু থেকে ছিটকে বেরোনো নিউট্রন গিয়ে ধাক্কা মারে এমনি এক নাইট্রোজেন পরমাণুকেন্দ্রে। সেটা পর-মাণুকেন্দ্রে ঢুকে পড়ে সেখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে, তার বদলে ছিটকে বেরিয়ে যায় একটা প্রোটন কণিকা। (মার্বেল খেলায় কখনো কখনো এ রকম হয়। একটা মার্বেল ঠিক মতো তাক করে অন্য মার্বেলের গায়ে মারতে পারলে দ্বিতীয় মার্বেলটা ছিটকে চলে যায়, আর প্রথমটা হঠাৎ স্থির হয়ে থেমে যায়।)

এমনিভাবে নিউট্রনের ধাক্কা খাওয়া নাইট্রোজেন ১৪-এর অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? একটা প্রোটন হারিয়ে এর পারমাণবিক সংখ্যা ৭ থেকে কমে হয় ৬। এটা এখন আর নাইট্রোজেন রইল না, হয়ে দাঁড়াল কার্বন। একটি প্রোটন হারালেও এতে আবার একটি নিউট্রন যোগ হয়েছে ; কাজেই এর ভরসংখ্যা থেকে যায় আগের মতোই। অর্থাৎ এই নতুন পরমাণুটি হল **কার্বন-১৪** আইসোটোপ।

সাধারণ কার্বনে আছে কার্বন-১২ (শতকরা ৯৯ ভাগ) আর কার্বন-১৩ (শতকরা ১ ভাগ)। এই দুটো আইসোটোপই স্থায়ী। কার্বন-১৪ স্থায়ী নয়, তেজস্ক্রিয় ; এ থেকে বেটাকণিকা বেরিয়ে আসে। তাতে বোঝা যায়, কার্বন ১৪-এর পরমাণুকেন্দ্রে একটি নিউট্রন পরিণত হয় প্রোটনে। তার ফলে আবার তৈরি হয় নাইট্রোজেন-১৪।

হয়তো ভাবছ, তাহলে তো শেষ পর্যন্ত কোন পরিবর্তনই হল না, সব আগের মতোই থাকল। কিন্তু কার্বন-১৪ ভেঙে গিয়ে নাইট্রোজেন-১৪ হতে বহু সময় লাগে। এর অর্ধজীবনকাল ৫,৭৭০ বছর, রেডিয়ামের অর্ধ-জীবনকালের প্রায় চারগুণ। অবশ্য এতেও নভোরশ্মির প্রভাবে যদি অনবরত এই আইসোটোপটি সৃষ্টি না হত, তাহলে পৃথিবীতে কার্বন-১৪ মোটেই থাকত না।

banglainternet.com

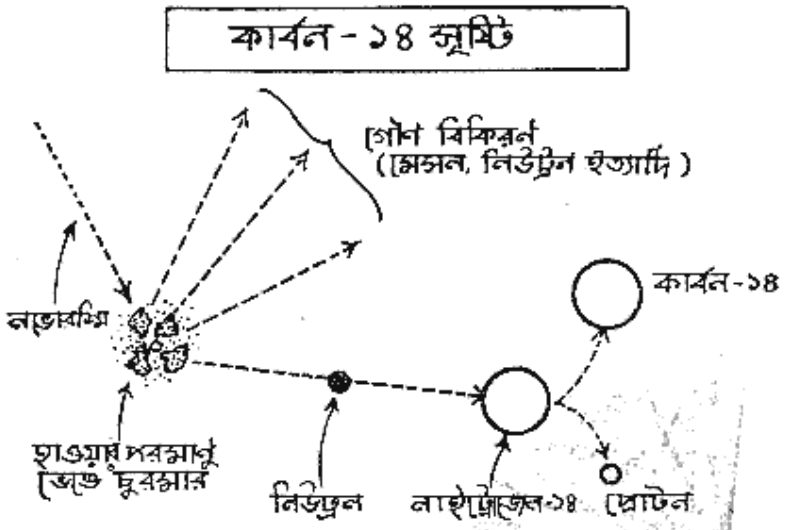

এ রকম পরিবর্তনে ইলেকট্রনদের কি অবস্থা হয় সে প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতে পারে। ইলেকট্রনরা অনেকটা আপনাআপনি নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। নাইট্রোজেন-১৪ যখন কার্বন ১৪-তে পরিণত হয় তখন পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা একটা কমে যায়। নতুন যে কার্বন-১৪ পরমাণুকেন্দ্র সেটা ছ'টা ইলেকট্রন ধরে রাখতে পারে। আগের সাতটা ইলেকট্রনের মধ্যে একটা হয়ে দাঁড়ায় বাড়তি, সেটা ছাড়া পেয়ে যায়। অবশ্য প্রত্যেকবার একটা নাইট্রোজেন-১৪ কার্বন ১৪-য় পরিণত হবার সময় একটা করে প্রোটন ছাড়া পায়। এই প্রোটনটি বাড়তি ইলেকট্রনকে পাকড়াও করে হয়ে দাঁড়ায় হাইড্রোজেন-১ পরমাণু। এতে ইলেকট্রনের ভারসাম্য বজায় থাকে। এইভাবে প্রতিটি পারমাণবিক ভাঙাগড়ায় ইলেকট্রনের ভারসাম্য ঠিকই থাকে। তাই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনদের অবস্থা নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না, তাঁরা নজর দেন বিশেষ করে পরমাণুকেন্দ্রের অবস্থার দিকে।

কখনো কখনো নিউট্রন কণিকা নাইট্রোজেন-১৪ পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করলে অন্য ধরনের পরিবর্তন ঘটে। শুধু একটি প্রোটন কণিকা বেরিয়ে আসার বদলে বেরিয়ে আসে একটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন। একটি প্রোটন

বেরিয়ে যাওয়া পরমাণুটি হয়ে দাঁড়ায় কার্বন। যেহেতু একটি নিউট্রন যোগ হয় আর তিনটি কণিকা (প্রোটন আর নিউট্রন) চলে যায়, কাজেই ভরসংখ্যায় মোট লোকসান হয় দুই ; কাজেই নতুন মৌলটি হল কার্বন-১২, কার্বনের সবচাইতে সাধারণ, স্থায়ী আইসোটোপ।

কিন্তু যে প্রোটন আর দুটি নিউট্রন ছিটকে বেরোয় তাদের অবস্থা কি হয়? এরা জোট বেঁধে একটা নতুন পরমাণুকেন্দ্র সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রোটন রয়েছে একটি, কাজেই পারমাণবিক সংখ্যা হয় ১ আর পরমাণুটি হয় হাইড্রোজেন। আসলে এটা হয়ে দাঁড়ায় হাইড্রোজেন-৩, হাইড্রোজেন ২-এর চেয়েও বেশি ভারি।

হাইড্রোজেন ৩-কে বলা হয় **ট্রাইটিয়াম** (এক গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ তৃতীয়)। ট্রাইটিয়াম সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এটা তেজস্ক্রিয়। এটা একটা বেটা কণিকা ছুড়ে দেয় আর এর অর্ধজীবনকাল ১২½ বছর। বেটাকণিকা ছুটে বেরোলে ট্রাইটিয়াম পরমাণুকেন্দ্রের একটি নিউট্রন বদলে হয় একটি প্রোটন। এবার পরমাণুকেন্দ্রে দাঁড়াল দুটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন, আর এটা হল স্থায়ী হিলিয়াম-৩ (কখনো বলা হয় **হ্রীলফিয়াম**)।

হিলিয়াম-৩ হাওয়ায় রয়েছে, তবে এটা অতিমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য। সম্ভবত যেটুকু রয়েছে তা সবই সৃষ্টি হয়েছে হাইড্রোজেন-৩ ভেঙে গিয়ে ; আবার হাইড্রোজেন-৩ সবই সৃষ্টি হয়েছে নভোরশ্মি বর্ষণের ফলে।

মানুষের হাতে তৈরি

নভোরশ্মির বর্ষণে পরমাণুতে যেসব পরিবর্তন ঘটে তাতে কিমিয়ার স্বপ্ন সফল হয় না, কেননা এগুলোতে মানুষের কোন হাত নেই। নভোরশ্মি বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোথাও থেকে এসে পৃথিবী এবং তার ওপরকার সব কিছুতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে। এতে আমাদের তেমন কিছু করবার নেই। আমরা বড়জোর কোন জিনিসকে শূন্যে নিয়ে তুলতে পারি—সেখানে নভোরশ্মির বর্ষণ বেশি—যাতে পারমাণবিক রূপান্তর কিছুটা তাড়াতাড়ি হয়। কিংবা আমরা কোন কিছুকে গভীর গুহার তলায় নিয়ে যেতে পারি, অথবা এক ফুট পুরু সীসা দিয়ে ঢেকে দিতে পারি, যাতে অধিকাংশ নভোরশ্মির বর্ষণ ঠেকানো যায় এবং পারমাণবিক পরিবর্তন কিছুটা আস্তে হয়। তবে সাধারণভাবে নভোরশ্মিদের মানুষের কাজে লাগাবার উপায় নেই।

banglainternet.com

অবশ্য মানুষের জন্যে অন্য সব পারমাণবিক ছর্‌রা গুলি রয়েছে ঃ সে হল বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ। এসব বিকিরণ নভোরশ্মির মতো অত তেজী নয়, তবে কক্ষীয় ইলেকট্রনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রে ঘা মারার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী।

এসব বিকিরণের একটা বড় সুবিধে হল, পৃথিবীর বুকেই এদের শুরু। সাধারণ অবস্থায় পৃথিবীর বুকে এখানে-সেখানে তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে ভেঙে পড়ছে—তাতে কোথাও হয়তো ছিটকে পড়ছে আল্‌ফা কণিকা, কোথাও ছিটকে পড়ছে বেটাকণিকা। এই অবস্থাটা আমরা বদলাতে পারি, অর্থাৎ পৃথিবীর বুক থেকে আমরা এসব তেজস্ক্রিয় মৌল (ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম) জড়ো করে এক সাথে করতে পারি। এমন কি আমরা ইউরেনিয়াম আর থোরিয়ামের চাইতে বেশি তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম ইত্যাদিও অল্প পরিমাণে এক সাথে জড়ো করতে পারি।

এমনি করে আমরা তেজস্ক্রিয় শক্তিকে কিছুটা ঘনীভূত করতে পারি যাতে শক্তিশালী আল্‌ফা কণিকা, বেটাকণিকা আর গামারশ্মির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আলাদা আলাদাভাবে এই কণিকাগুলি হয়তো নভোরশ্মির তুলনায় অনেক কম তেজী, কিন্তু এক সাথে তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

একখণ্ড তেজস্ক্রিয় বস্তুকে যদি চারদিক বন্ধ আর এক পাশে ছোট্ট ফুটোঅলা একটা ধাতব পাত্রে রাখা যায় তাহলে ধাতুর পাত্র অধিকাংশ তেজস্ক্রিয়া ঠেকিয়ে দিতে পারে। তবে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে তেজস্ক্রিয়ার একটা সূক্ষ্ম রশ্মি। এমনি করে বন্দুকের নল থেকে যেমন ছর্‌রাগুলি বেরিয়ে আসে তেমনি তেজস্ক্রিয় রশ্মিও নির্দিষ্ট নিশানায় তাক করা যায়।

জিঙ্ক সালফাইড নামে একটা জিনিস মাখানো নিশানার দিকে এমনি করে আল্‌ফা কণিকা ছুড়ে দিলে সেই নিশানার গায়ে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এগুলো দেখে আল্‌ফা কণিকার হদিস পাওয়া যায় আর তাদের চলাচলন পরীক্ষা করা চলে। (তোমার যদি রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া হাত-ঘড়ি থাকে তাহলে এসব স্ফুলিঙ্গ তুমিও দেখতে পাবে। ঘড়ির কাঁটা আর সংখ্যাগুলোর ওপর জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ মাখানো থাকে ঃ তাতে মেশানো থাকে অতি সামান্য রেডিয়ামের রেণু। অন্ধকারে এই ঘড়ির দিকে তাকালে জিঙ্ক সালফাইড জ্বলজ্বল করতে থাকে। তার কারণ রেডিয়াম

banglainternet.com

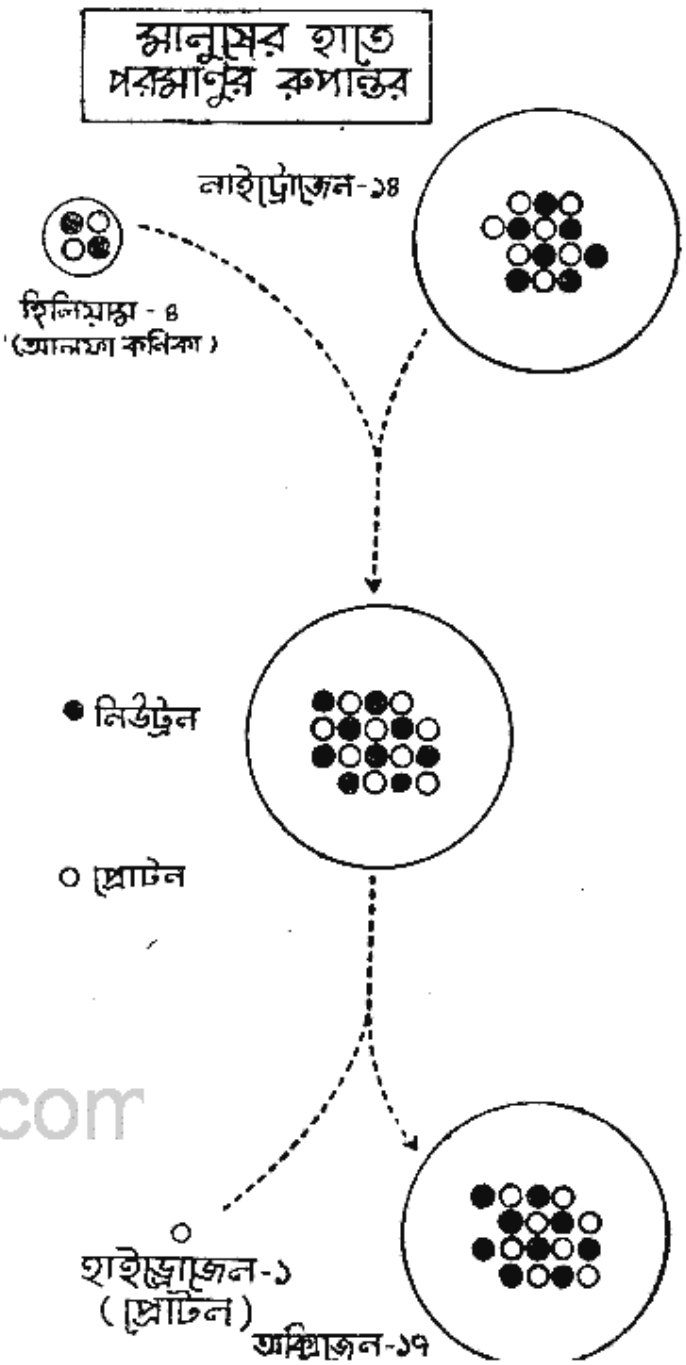

থেকে বেরোনো আল্‌ফা কণিকা জিঙ্ক সালফাইডে আঘাত করে পরমাণু ভেঙে দেয়।)

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাদারফোর্ড আর তাঁর ক'জন ছাত্র আল্‌ফা কণিকা বিভিন্ন গ্যাসের ভেতর দিয়ে গিয়ে জিঙ্ক সালফাইডে আঘাত করলে কি ফল হয় সেটা পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, আল্‌ফা কণিকা নাইট্রোজেনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। কতকগুলো স্ফুলিঙ্গ দেখা দিচ্ছে যেগুলো আল্‌ফা কণিকা হাইড্রোজেন গ্যাসের ভেতর দিয়ে গিয়ে আঘাত করলে যেমন হয় তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সন্দেহ দেখা দিল যে, আল্‌ফা কণিকা নাইট্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে হয়তো হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র সৃষ্টি করছে।

দেখা গেল সত্যি তাই। ব্যাপারটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট (Patrick Maynard Stuart Blackett) নামে একজন ইংরেজ পদার্থবিদ মেঘকক্ষে কণিকা পথের হাজার হাজার ফটো তুললেন। তিনি আল্‌ফা কণিকার চলাপথের ৪০০,০০০ ছবি নিয়ে তাতে এমনি নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙার ঠিক ৮টি নজির পেলেন। এই সব সংঘর্ষের ছবি থেকে তিনি দেখালেন ঠিক কিভাবে নাইট্রোজেন পরমাণু উধাও হয়ে যায় আর তার বদলে অন্য পরমাণুকেন্দ্র এসে হাজির হয়। এই গবেষণা চালাতে গিয়ে ব্ল্যাকেট মেঘকক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটালেন, আর এজন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৪৮ সালে। (ওয়াল্টার বোটে (Walter W. G. Bothe) নামে এক জার্মান পদার্থবিদও মেঘকক্ষের বিশেষ উন্নতি সাধন করে ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান।)

রাদারফোর্ড যা অনুমান করেছিলেন আর যা ব্ল্যাকেট তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছিলেন তা হল এই ঃ মাঝে মাঝে একটি আল্‌ফা কণিকা নাইট্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করে তার সাথে জোড়া লেগে যায়। খানিক পরেই এই যুক্ত নাইট্রোজেন-আল্‌ফা-কণিকা থেকে ছুটে বেরোয় একটি প্রোটন কণিকা। এই প্রোটনই (আসলে যা হল হাইড্রোজেন-১ পরমাণুকেন্দ্র) হাইড্রোজেন জাতীয় কণাদীপ্তির জন্যে দায়ী।

এবার আরো খানিকটা হিসেব-নিকেশ করতে হচ্ছে। আমরা শুরু করলাম নাইট্রোজেন-১৪ পরমাণুকেন্দ্র দিয়ে ; তাতে আছে ৭টি প্রোটন আর ৭টি নিউট্রন। তার সাথে যোগ হল একটা আল্‌ফা কণিকা, অর্থাৎ দুটি

প্রোটন দুটি নিউট্রন। এই দুটো জোড়া লেগে তৈরি হল একটা **যৌগিক পরমাণুকেন্দ্র**, যাতে রয়েছে ৯টি প্রোটন আর ৯টি নিউট্রন। এ থেকে বেরিয়ে যায় একটি প্রোটন ; কাজেই পরমাণুকেন্দ্রে বাকি থাকে ৮টি প্রোটন আর ৯টি নিউট্রন। এতে আর পরিবর্তন হয় না। এটা হল অক্সিজেন-১৭। অক্সিজেন-১৭ একটি স্থায়ী আইসোটোপ। প্রতি ২,৫০০ অক্সিজেন পরমাণুতে একটি হল অক্সিজেন-১৭।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্‌ফা কণিকা দিয়ে একটি নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করায় নাইট্রোজেন থেকে তৈরি হচ্ছে অন্য দুটি মৌল। আল্‌ফা কণিকা আসলে হিলিয়ামের পরমাণুকেন্দ্র, কাজেই এই পরীক্ষার ফলাফলকে আমরা একটা যোগ-অঙ্কের মতো করে লিখতে পারি ঃ নাইট্রোজেন-১৪ যোগ হিলিয়াম-৪ থেকে পাওয়া গেল অক্সিজেন-১৭ যোগ হাইড্রোজেন-১।

এটা হল পরমাণুর রূপান্তর। মানুষের চেষ্টার ফলে এক মৌল থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য মৌল। আল্‌ফা কণিকা অবশ্য প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষ তাকে সংগ্রহ করে ছুড়ে মারার ব্যবস্থা করেছে।

এমনি করে কিমিয়ার স্বপ্ন অবশেষে সফল হল ১৯১৯ সালে। এই বছরই প্রথম রাদারফোর্ড তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন ; অবশ্য ব্ল্যাকেট এর প্রমাণ দেন ১৯২৫ সালে।

এক হিসেবে দেখতে গেলে কিমিয়ার সাধকরা হয়তো এতে হতাশ হতেন। যে ক'টি পরমাণুতে এভাবে রূপান্তর ঘটানো গেল তার সংখ্যা অতি সামান্য। তাছাড়া কিমিয়ার উদ্দেশ্য ছিল কোন সাধারণ সস্তা জিনিস থেকে খুব দামী কিছু তৈরি করা। কিন্তু এক্ষেত্রে সস্তা নাইট্রোজেন থেকে তৈরি হচ্ছে তেমনি সস্তা অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন। তার চেয়ে মুশকিল হল এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে অত্যন্ত দামী আল্‌ফা কণিকা ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর সবচাইতে আফসোসের ব্যাপার এই যে, আল্‌ফা কণিকার বেশির ভাগই স্রেফ অপচয় হচ্ছে। প্রায় ৩০০,০০০ আল্‌ফা কণিকার মধ্যে মাত্র একটা নাইট্রোজেন পরমাণুর রূপান্তর ঘটায়। বাকিগুলো কেউ নাইট্রোজেন পরমাণুকে ঠিকমতো আঘাত করতে পারে না ; হয় ঘা মেরে ঠিকরে ফিরে আসে আর নয়তো পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

banglainternet.com

তবু বিজ্ঞানীরা যে এ ধরনের ব্যাপার আদৌ ঘটাতে পেরেছেন শুধু এটাই বিজ্ঞানীদের কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার চেয়েও বেশি দামী। আর শুধু তাই নয়, পরে আমরা দেখব, সাধারণ মানুষের জন্যেও এই আবিষ্কারের অনেক দাম রয়েছে।

৭ পরমাণুর কামান দাগা

নতুন ধরনের গুলি

যখন কোন পরমাণু-কেন্দ্র মৌল কণিকার আঘাতে অন্য জাতের পরমাণু-কেন্দ্রে পরিণত হয় তখন এই ঘটনাকে আমরা বলি **পারমাণবিক বিক্রিয়া**। আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করে নাইট্রোজেন ১৪-কে অক্সিজেন ১৭-তে রূপান্তরিত করা এমনি পারমাণবিক বিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। মানুষের হাতে এটাই এ রকম প্রথম রূপান্তর।

এই প্রথমটির পর রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এ ধরনের আরো রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আল্‌ফা কণিকা যদি নাই-ট্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্রে ঢুকে যেতে পারে তাহলে অন্য মৌলের পরমাণু-কেন্দ্রে পারবে না কেন?

১৯২৬ সালের মধ্যে পটাসিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ১৯) পর্যন্ত প্রায় দশটি হালকা মৌলে এমনি রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরমাণুকেন্দ্র আল্‌ফা কণিকাকে শুষে নিয়ে একটি করে প্রোটন কণিকা

banglainternet.com

ছুড়ে দেয়।

এর পরে ব্যাপারটা রীতিমতো শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আল্‌ফা কণিকার দুটি প্রোটন থাকে, কাজেই এর আধান +২। পরমাণুকেন্দ্রে যে ক'টি প্রোটন থাকে তাতে সেই পরিমাণে ধনাত্মক আধান থাকে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, সদৃশ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কাজেই পরমাণুকেন্দ্র আল্‌ফা কণিকাকে বিকর্ষণ করে।

আল্‌ফা কণিকা ছুটে চলে এত জোরে যে, এই বিকর্ষণ সত্ত্বেও কিছু কিছু পরমাণুকেন্দ্রের গায়ে গিয়ে ধাক্কা মারে। তবে পরমাণুকেন্দ্রে আধানের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, বিকর্ষণও তত বাড়ে। আধান যখন +৭, যেমন নাইট্রোজেনে, তখন দ্রুতগামী আল্‌ফা কণিকা পরমাণুকেন্দ্রে ধাক্কা মারতে পারে। যখন আধান হয়ে দাঁড়ায় +১৯, যেমন পটাসিয়ামে, তখন আল্‌ফা কণিকা আর যেন পেরে ওঠে না, কোন রকমে পরমাণুকেন্দ্রে পৌঁছয়। আধান +১৯-এর চেয়ে বেশি হলে আল্‌ফা কণিকা আর কোনমতেই পারে না। বিকর্ষণ তখন এত বেশি হয়ে দাঁড়ায় যে, আল্‌ফা কণিকা হয় ঠিকরে ফিরে আসে আর নয়তো অন্য কোন দিকে সরে যায়।

এ যেন তোমার ক্লাসের ছাত্ররা ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল করার চেষ্টা করছে। অন্য পক্ষ চাচ্ছে সেটা ঠেকাতে। (অর্থাৎ দুটো দল পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।) অন্য দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও হয়তো তোমাদের দল গোল করতে পারে। কিন্তু অন্য পক্ষের খেলোয়াড়রা যদি হয়ে দাঁড়ায় বড়সড় আর বেশি শক্তিশালী, তাহলে গোল করা বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। শেষমেষ অন্য পক্ষ যদি খুবই শক্তিশালী হয় তাহলে তোমরা আর মোটেই তাদের গোল দিতে পারবে না। আল্‌ফা কণিকাদের বেলাতেও হয় তেমনি।

বেটাকণিকাদের অবস্থা আরো খারাপ। এরা আসলে ইলেকট্রন কণিকা, আর এমনই হালকা যে অতি জোরে না ছুটলে তেমন বেশি দূরে যেতে পারে না। তাছাড়া পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনদের খোলস এদের বিকর্ষণ করে বলে সচরাচর এরা পরমাণু-কেন্দ্রের কাছাকাছিও যেতে পারে না। পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাবার ব্যাপারে গামারশ্মিও আল্‌ফা কণিকার চেয়ে কম উপযোগী।

বোঝা গেল, নতুন ছররা গুলি যোগাড় করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। রুশ-মার্কিন পদার্থবিদ জর্জ গামভ ১৯২৮ সালে প্রস্তাব করলেন গুলি হিসেবে ছুটন্ত প্রোটন কণিকা ব্যবহার করার। প্রোটনরা ইলেকট্রনের বাধা

ডিঙিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ভারি। তাছাড়া এর আধান মাত্র +১ ; কাজেই আল্‌ফা কণিকা আর পরমাণুকেন্দ্রের মধ্যে যে পরিমাণ বিকর্ষণ, এখানে বিকর্ষণ হবে তার মোটে অর্ধেক।

হাইড্রোজেনকে আয়নিত করে—অর্থাৎ এর একটি কক্ষীয় ইলেকট্রনকে ছাড়িয়ে নিয়ে—প্রোটন পাওয়া যেতে পারে। হাইড্রোজেনকে আয়নিত করা তেমন শক্ত কিছু নয়, তবে মুশকিল হল সেই প্রোটনকে এমন গতিসম্পন্ন করা যাতে তাদের গুলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রোটনদের (বা যে-কোন আধানযুক্ত কণিকাদের) দ্রুত গতিসম্পন্ন করার একটা উপায় হল এদের ওপর বড় রকম বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা। যেমন বিদ্যুৎপ্রবাহে যে ইলেকট্রন বয় তাদের যদি এক জায়গায় ঘনীভূত করা যায় (কিংবা কোন জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা যায়) তাহলে বড় রকমের আধান সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন জড়ো হলে সেটা হয় ঋণাত্মক আধান আর ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে হয় ধনাত্মক আধান। এ রকম বেশি আধানের কাছাকাছি জায়গাকে বলা হয় **উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভবের** এলাকা।

প্রোটনের ওপর যখন উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করা হয় তখন তারা ছুটতে আরম্ভ করে। আধান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে এরা ছোটে আধানের দিকে, আধান ধনাত্মক হলে ছোটে তার বিপরীত দিকে। দুই অবস্থাতেই বিভবের প্রভাবে এরা যত ছোটে তত এদের গতি বাড়তে থাকে। এমনি গতি ক্রমে ক্রমে বাড়াকে বলা হয় **ত্বরণ**। প্রোটন প্রভৃতি কণিকার গতি এভাবে বাড়ালে তাদের বলা হয় **ত্বরণযুক্ত কণিকা**।

ব্যাপারটাকে মানুষের পানির শক্তি ব্যবহারের সাথে তুলনা করা যায়। স্বাভাবিক জলপ্রপাতে পড়ন্ত পানি এসে পড়ে একটা চাকার ওপর, সেই ধাক্কায় চাকাটা চলতে শুরু করে। এই চাকার ঘোরা থেকে চালানো যায় বৈদ্যুতিক জেনারেটর। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে একটা বড় জল-প্রপাতের শক্তি থেকে অনেকগুলো শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের পুরোপুরি চাহিদা মেটানো যায়। আমেরিকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে বাফেলো (নিউ ইয়র্ক) শহরের এবং তার আশেপাশের সম্পূর্ণ বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হয়।

যদি জলপ্রপাত না থাকে তাহলে কখনো কখনো মানুষ জলপ্রপাত তৈরি করে নিতে পারে। নদীতে একটা বাঁধ দিলে তার পেছনে পানি জমা হয়ে এক

banglainternet.com

কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হ্রদের পানি বাঁধের কিনারা ছাড়িয়ে উপ্‌চে পড়তে থাকে। এও অনেকটা স্বাভাবিক জলপ্রপাতের মতোই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যারিজোনা রাজ্যে 'হুভার ড্যাম' এবং ওয়াশিংটন রাজ্যে 'গ্র্যান্ড কুলী ড্যাম' এমনি জলপ্রপাতের দৃষ্টান্ত।

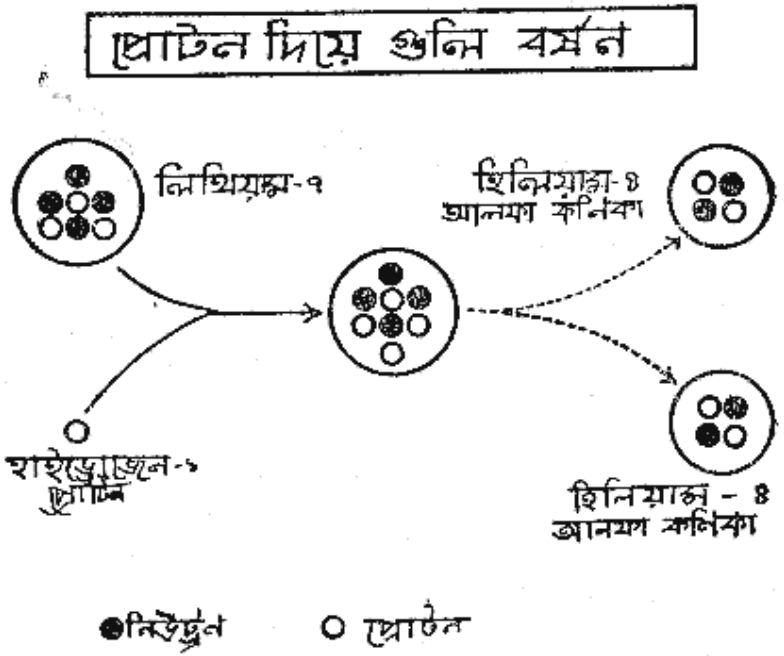

তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে আল্‌ফা কণিকা বের হওয়া যেন স্বাভাবিক জলপ্রপাতের মতো। প্রোটনের প্রবাহ এবং অন্যান্য কৃত্রিম ত্বরণযুক্ত কণিকা যেন কৃত্রিম জলপ্রপাতের মতো। স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সব রকম জলপ্রপাতের শক্তিই আসে মাধ্যাকর্ষ থেকে। ত্বরণযুক্ত কণিকারা তাদের শক্তি পায় বিদ্যুতের বিভব থেকে।

ত্বরণযুক্ত কণিকা দিয়ে প্রথম পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয় রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে ১৯৩২ সালে। লিথিয়াম ৭-কে (এর পরমাণু-কেন্দ্রে রয়েছে তিনটি প্রোটন আর চারটি নিউট্রন) আঘাত করা হল দ্রুতগতি প্রোটন দিয়ে। প্রায় প্রতি এক শ' কোটি প্রোটনে একটি ঢুকে গেল লিথিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রে। চারটি প্রোটন আর চারটি নিউট্রনযুক্ত এই যৌগ পরমাণুকেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে তৈরি হল দুটি আল্‌ফা কণিকা (প্রতিটিতে দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন)।

বিক্রিয়াটি অঙ্কের মতো করে লিখলেঃ লিথিয়াম-৭ যোগ হাইড্রোজেন-১ থেকে পাওয়া গেল হিলিয়াম-৪ যোগ হিলিয়াম-৪।

এ হল পরমাণু জয়ের পথে মানুষের আরেক বিরাট পদক্ষেপ—প্রথম পারমাণবিক বিক্রিয়া ; যাতে এমন কি গুলিগুলোও মানুষের হাতে তৈরি।

নতুন পরমাণু ভাঙা যন্ত্র

প্রোটনকে প্রথম সাফল্যের সাথে পারমাণবিক ছররাগুলি হিসেবে ব্যবহার করেন জন কক্রফ্‌ট্‌ (John Douglas Cockcroft) নামে এক ইংরেজ পদার্থবিদ আর তাঁর আইরিশ সহকর্মী আর্নেস্ট ওয়াল্টন (Ernest Thomas Sinton Walton)। এর ফলে ১৯৫১ সালে তাঁরা দুজনে মিলে নোবেল পুরস্কার পান।

পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাবার মতো যথেষ্ট শক্তি নিয়ে পরমাণুকে আঘাত করার জন্যে কক্রফ্‌ট্‌ আর ওয়াল্টন প্রথম বড় রকম **কণিকা ত্বরক** তৈরি করলেন ১৯৩০ সালে। এতে বৈদ্যুতিক বিভবকে ধাপে ধাপে বাড়াবার ব্যবস্থা ছিল—প্রতি ধাপে বিভব কয়েক গুণ বাড়ত। বৈদ্যুতিক বিভব মাপা হয় **ভোল্টের** হিসেবে, তাই এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হল 'ভোল্টেজ মাল্‌টিপ্লায়ার' বা **বিভব গুণক**।

মৌল কণিকার শক্তি সচরাচর মাপা হয় **ইলেকট্রন-ভোল্ট** হিসেবে। (অর্থাৎ যদি একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক বিভবের ক্ষেত্রে ত্বরণযুক্ত করা যায় তাহলে তাতে এই পরিমাণ শক্তি জন্মায়।)

ইলেকট্রন-ভোল্ট সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা ধারণা পাবে যদি বলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করলে একটি অণুর শক্তি এক থেকে পাঁচ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত বদলায়। এই পরিমাণ শক্তিই কয়লার আগুন বা

banglainternet.com

ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটার জন্যে যথেষ্ট।

দৃশ্য আলোর ফোটনগুচ্ছের শক্তি সবচাইতে লম্বা তরঙ্গের (লাল আলো) ১½ ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে সবচাইতে ছোট তরঙ্গের (বেগনি আলো) ৩ ইলেকট্রন-ভোল্টের মধ্যে। এই শক্তি ঠিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে শক্তি-সীমা তার মধ্যে পড়ে আর সেজন্যেই অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দৃশ্য আলো সৃষ্টি হয়।

তুলনামূলকভাবে, পারমাণবিক বিক্রিয়ায় এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তি সৃষ্টি হয়—বহু হাজার গুণ বেশি। আর এই বিক্রিয়া ঘটাবার জন্যেও প্রচণ্ড শক্তির দরকার। কক্রফ্‌ট্‌-ওয়াল্টন বিভব-গুণক-এ ত্বরণযুক্ত প্রোটনদের শক্তি হত চার লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত। এর আগে বিজ্ঞানীরা যেসব ছররা গুলি ব্যবহার করছিলেন তার তুলনায় এ রীতিমতো কামানের গোলা।

এমনি আরেক ধরনের যন্ত্র হল 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটার' বা 'স্থির-তড়িৎ উৎপাদক'। মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট ভ্যান-ডি গ্রাফ (Robert Jemison Van de Graaff) এটা প্রথম তৈরি করেন ১৯৩১ সালে। তাঁর নাম অনুসারে একে অনেক সময় 'ভ্যান-ডি গ্রাফ জেনারেটার'ও বলা হয়। এই যন্ত্রটাকে দেখে মনে হবে যেন একটা অর্ধেক ডাম্বেল খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। এর ভেতরে একটা বেল্ট ওপরের ফাঁপা গোলক থেকে অনবরত ইলেকট্রনদের বয়ে নিয়ে নিচের এক জায়গায় এনে জড়ো করছে। বেল্টটা যত ইলেকট্রন ওপর থেকে নিচে সরাতে থাকে তত নিচের ঋণাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ আর ওপরের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই দুই আধানের পরিমাণ যত বাড়ে, বৈদ্যুতিক বিভবও তত বেশি হয়।

বিভব খুব বেশি হয়ে গেলে এক সময়ে তলা থেকে হাওয়ার ভেতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ ছুটে গিয়ে আধানকে নিরপেক্ষ করে দিতে পারে। এ হল মানুষের তৈরি 'বিজলি চমকানো'। প্রাকৃতিক বিজলি চমকানোও আসলে একই জিনিস ; ঝড়ের সময় মেঘ আর জমিনের ভেতর আধানের পার্থক্য থেকে তার সৃষ্টি।

ভোল্টেজ মাল্‌টিপ্লায়ারের চেয়ে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটার অনেক বেশি শক্তিশালী যন্ত্র। ভ্যান-ডি গ্রাফের যন্ত্রেই প্রথম দশ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের বেশি শক্তি সৃষ্টি হয়। দশ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'মেভ' (Mev বা Million electron volt)। ভ্যান-ডি গ্রাফ জেনারেটরকে ক্রমে ক্রমে এমন উন্নত করা হয়েছে যে, তাতে ১৮ মেভ পর্যন্ত

শক্তির কণিকা উৎপন্ন করা যায়। এ ধরনের সব যন্ত্রকে আজকাল চলতি কথায় বলা হয় 'পরমাণু চূর্ণ করা' যন্ত্র।

ভোল্টেজ মাল্‌টিপ্লায়ার এবং **ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর** দুধরনের যন্ত্রেই বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি হয় আর তার সাহায্যে কণিকাদের ত্বরণের জন্যে প্রচণ্ড রকমের এক ধাক্কা দেওয়া হয়। এছাড়া কণিকাদের পর পর অনেকগুলো ধাক্কা এমনভাবে দেওয়া যেতে পারে যাতে একটার ক্রিয়ার সাথে অন্যটার ক্রিয়া পর পর যোগ হতে থাকে। (এটা অনেকটা কাউকে দোলনায় ধাক্কা দেবার মতো। একচোটে খুব জোরে ধাক্কা দেবার দরকার নেই। প্রত্যেকবার যখন দোলনাটা পেছন ফিরে আবার সামনে আসবার উপক্রম হয় তখন আস্তে একটা ধাক্কা দেবে। এমনি সব ছোট ধাক্কা যোগ হতে হতে দোলনাটা অনেক দূর পর্যন্ত দুলতে থাকবে।)

১৯৩১ সালে এমন যন্ত্র তৈরি হল যা দিয়ে এটা করা যায়। কণিকারা পর পর অনেকগুলো নলের ভেতর দিয়ে ছোটে সরল রেখায়, আর প্রত্যেক নলে তাদের দেওয়া হয় ছোট একটা ধাক্কা। এ ধরনের যন্ত্রের নাম হল 'লাই-নিয়ার অ্যাক্‌সিলিরেটর' (সংক্ষেপে Linac) বা **রৈখিক ত্বরক**। কণিকার গতি যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে তেমনি নলের দৈর্ঘ্যও ক্রমে ক্রমে বেশি হওয়া দরকার। আজকাল এ ধরনের যেসব রৈখিক ত্বরক তৈরি হয়েছে সেগুলো লম্বায় প্রায় দুমাইল।

১৯৩১ সালেই আর্নেস্ট লরেন্স (Ernest Orlando Lawrence) নামে এক মার্কিন পদার্থবিদ ভাবছিলেন, কি করে এসব যন্ত্রে কিছু জায়গা বাঁচানো যায়। তিনি ভাবলেন ঃ কণিকাদের লম্বা পথে না ছুটিয়ে বাঁকা পথে ছোটার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

এরকম যন্ত্রও তৈরি হল। ধনাত্মক আধানযুক্ত কণিকাদের (প্রোটন, আল্‌ফা কণিকা ইত্যাদি) ছোটানো হল উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভবের প্রভাবে এক ঘোরানো সিঁড়ির মতো পথে। ঘুরতে ঘুরতে কণিকাদের গতি বেড়ে ওঠে আর শেষটায় তারা নল থেকে একেবারে বেরিয়ে আসে। যেখান দিয়ে এসব দ্রুতগতি কণিকা ছুটে বেরোয় সেখানে যদি কোন লক্ষ্যবস্তু রাখা হয় তাহলে তাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে।

এ রকম যন্ত্রে কণিকাগুলি অনেকটা বৃত্তাকার পথে ঘোরে বলে লরেন্স এর নাম দিলেন **সাইক্লোট্রন**। একদম প্রথম সাইক্লোট্রনটির ব্যাস ছিল মোটে

banglainternet.com

১১ ইঞ্চি, কিন্তু এ থেকেও তৈরি হয়েছিল ৮০,০০০-এর বেশি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির কণিকা। পরে এমন সব বড় বড় সাইক্লোট্রন তৈরি হল যেগুলোতে ১০ মেভ পর্যন্ত শক্তির কণিকা উৎপন্ন হল। এজন্যে লরেন্স নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন ১৯৩৯ সালে।

এর চেয়ে বেশি শক্তির কণিকা সৃষ্টির জন্যে সাইক্লোট্রনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো দরকার হয়ে পড়ল ; আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে অতি দ্রুত গতির ফলস্বরূপ কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার প্রভাবের জন্যে এসব পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। ১৯৪৫ সালে মার্কিন পদার্থবিদ এডউইন ম্যাকমিলান (Edwin Mattison McMillan) আর রুশ পদার্থবিদ ভলাদিমির ভেক্সলার (Vladimir I. Veksler)। এঁরা দুজন যন্ত্রে যথাযথ পরিবর্তন ঘটালেন। এই নতুন যন্ত্রের নাম হল **সিন্‌ক্রোসাইক্লোট্রন** আর এতে ৮০০ মেভ পর্যন্ত শক্তির কণিকা সৃষ্টি সম্ভব হল।

এর চেয়েও উন্নত যন্ত্র প্রোটন **সিন্‌ক্রোট্রন** কয়েক হাজার মেভ (কয়েক বিলিয়ন বা হাজার কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট) শক্তিসম্পন্ন কণিকা সৃষ্টি করতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে **বেভাট্রন** নামে এবং ব্রুক্‌হ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে **কস্‌মোট্রন** নামে এ ধরনের যন্ত্র রয়েছে। 'বেভ' বা বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে এসেছে প্রথম নামটি। দ্বিতীয় নামটিতে বোঝায় যে, এর শক্তি কস্‌মিক-রে বা নভোরশ্মির সমান।

১৯৬০ সালের দিকে ইউরোপ আর আমেরিকায় ৩০ বেভ পর্যন্ত শক্তির কণিকা সৃষ্টি হয় এ রকম পরমাণু-ভাঙা যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এসব যন্ত্র এমন বিশাল যে, চওড়ায় প্রায় পোয়া মাইল থেকে আধ মাইল চওড়া ; তবু এর চেয়ে বড় বড় যন্ত্রও তৈরি হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোট্রনে শুধু প্রোটন জাতীয় ভারি পরমাণুতেই ত্বরণ ঘটানো যায়। এতে ইলেকট্রন ব্যবহার করা যাবে না। ১৯৪০ সালে ইলেকট্রনদের জন্যে **বেটাট্রন** নামে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র তৈরি করলেন মার্কিন পদার্থবিদ ডোনাল্ড কার্স্ট্‌ (Donald William Kerst)।

শুধু অতিমাত্রায় শক্তিশালী কণিকা সৃষ্টি করাই কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদদের একমাত্র চিন্তার বিষয় নয়। কণিকাদের অস্তিত্ব বোঝার জন্যেও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার। এর জন্যে এই বইতে আগে মেঘকক্ষ আর বুদবুদ-কক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো যন্ত্রপাতি রয়েছে।

১৯৫৭ সালে **স্ফুলিঙ্গ-কক্ষ** তৈরি হয়। এতে রয়েছে সামান্য ফাঁক দিয়ে দিয়ে অনেকগুলো ধাতব পাত ; তার একটির পর একটিতে দেওয়া হল উচ্চ বিভব, যাতে প্রায় বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বের হবার উপক্রম হয়। কোন মৌল কণিকা এসে পাতে আঘাত করলে যেখানে আঘাত করে সেখানে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়।

'কাউন্টার' বা গণকনল পরমাণু বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত এ ধরনের আরেকটি যন্ত্র। এতে যত মৌল কণিকা এসে পড়ে তাদের সংখ্যা 'কাউন্ট' করা বা গোণা হয়। সবচেয়ে সরল গণকনলে রয়েছে একটি তারের চারপাশে এমন এক গ্যাস যার অণু মৌল কণিকার প্রভাবে সহজেই আয়নিত হয়। এই গ্যাস যে পাত্রে আবদ্ধ থাকে তার এক পাশে মৌল কণিকা ঢুকতে পারে এ রকম একটি পাতলা জায়গা রয়েছে। গণকনলে যখন কোন মৌলকণিকা ঢোকে তখন তার প্রভাবে গ্যাসের অণু আয়নে পরিণত হয় এবং এই আয়নরা বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। এর ফলে তারের ভেতর দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে যায়। এতে একটি 'রীলে' নড়ে ওঠে, কুট করে একটা শব্দ হয়। মৌলকণিকার সংখ্যা যত বেশি হবে, গণকনলের কট্‌কট্‌ শব্দও তত বেশি হতে থাকবে। এই শব্দের সংখ্যা গোণার জন্যে স্বয়ংক্রিয় মাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

এ ধরনের যন্ত্র প্রথম তৈরি করেন ১৯১৩ সালে হান্স্‌ গাইগার (Hans Geiger) নামে এক জার্মান পদার্থবিদ ; পরমাণুকেন্দ্র আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষণায় ইনি রাদারফোর্ডের সহায়তা করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই যন্ত্রকে বলা হয় গাইগার কাউন্টার।

এর চেয়ে দ্রুত মাপার জন্যে আরেক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যাতে মৌলকণিকারা কোন কোন জাতের কেলাসের ওপর পড়লে যে 'সিনটিলেশন' বা ক্ষণদীপ্তি (অতি ছোট ছোট আলোর ঝিলিক) দেখা দেয় তা মাপা হয়। এদের বলা হয় **সিন্‌টিলেশন কাউন্টার**।

নতুন নতুন পরমাণু

আমরা এ পর্যন্ত যে দুটি পারমাণবিক বিক্রিয়ার উল্লেখ করেছি, তাতে স্থায়ী আইসোটোপের সৃষ্টি হয়েছে। নাইট্রোজেন ১৪-কে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করে পাওয়া গিয়েছে অক্সিজেন-১৭ (স্থায়ী) আর হাইড্রোজেন-১ (স্থায়ী)। লিথিয়াম ৭-কে প্রোটন দিয়ে আঘাত করে পাওয়া গিয়েছে হিলিয়াম-৪ (স্থায়ী)। ১৯২০-এর পর পর যেসব পারমাণবিক

banglainternet.com

বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয়েছে তার সবগুলিতেই হয়েছে এমনি ফল।

১৯৩৪ সালে কিন্তু এক নতুন ধরনের ফল পাওয়া গেল। ফরাসী স্বামী-স্ত্রী পরমাণুবিজ্ঞানী জুটি ফ্রেদারিক আর আইরিন জোলিও-কুরীর গবেষণা থেকে এই আবিষ্কার ঘটল। (আইরিন ছিলেন আরেক স্বামী-স্ত্রী বিজ্ঞানী জুটি কুরী-দম্পতি, যাঁরা রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের মেয়ে)। জোলিও-কুরীরা দেখলেন, অ্যালুমিনিয়াম ২৭-কে (অ্যালুমিনিয়ামের এক-মাত্র স্থায়ী আইসোটোপ) আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করলে বেরিয়ে আসে প্রোটন (যেমন রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন ১৪-কে একইভাবে আঘাত করায় হয়েছিল) আর নিউট্রন। এছাড়া বেরোয় আরও একটি বিকিরণ যা নিউট্রনও নয়, প্রোটনও নয়। আল্‌ফা কণিকা ছোড়া বন্ধ করার সাথে সাথে প্রোটন আর নিউট্রন বেরোনোও থেমে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই তৃতীয় ধরনের বিকিরণ বেরোনো তবু চলতেই থাকল।

যা হচ্ছিল সে হল এই। অ্যালুমিনিয়াম ২৭-এর পরমাণুকেন্দ্রে রয়েছে ১৩টি প্রোটন আর ১৪টি নিউট্রন। এই পরমাণুকেন্দ্র যদি একটি আল্‌ফা কণিকা (দুটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন) শুষে নেয় আর একটি প্রোটন ছেড়ে দেয় তাহলে এতে মোটমাট যোগ হল একটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন। নতুন অবস্থায় পরমাণুকেন্দ্রে হল ১৪টি প্রোটন আর ১৬টি নিউট্রন ; এ হল সিলিকন-৩০, মৌল সিলিকনের একটি স্থায়ী আইসোটোপ। কিন্তু অ্যালু-মিনিয়াম ২৭-কে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করলে নিউট্রনও বেরিয়ে আসে। আলুমিনিয়াম-২৭ পরমাণুকেন্দ্র যদি একটি আল্‌ফা কণিকা শুষে নেয় আর একটি নিউট্রন ছুড়ে দেয় তাহলে তাতে মোটমাট যোগ হল দুটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন। তাহলে পরমাণুকেন্দ্রে দাঁড়াল ১৫টি প্রোটন আর ১৫টি নিউট্রন। পরমাণুকেন্দ্র ১৫টি প্রোটন হল ফসফরাসের, কাজেই এটা হল ফসফরাস-৩০ আইসোটোপ।

কিন্তু প্রকৃতিতে ফসফরাস-৩০ বলে তো কিছু নেই! ফসফরাসের মাত্র একটি স্থায়ী আইসোটোপ—সে হল ফসফরাস-৩১, তাতে প্রোটন ১৫টি আর নিউট্রন-১৬টি। ফসফরাস-৩০ অস্থায়ী ; স্থায়ী হবার জন্যে তাই এর পরমাণুকেন্দ্রে কিছুটা রদবদল করতে হবে। এজন্যে পরমাণুটি এর একটি প্রোটনকে নিউট্রনে বদলে ফেলে। তাহলে ১৫টি প্রোটন আর ১৫টি নিউ-ট্রনের বদলে এখন এতে হল ১৪টি প্রোটন আর ১৬টি নিউট্রন আর এটা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী সিলিকন-৩০।

এই প্রোটনকে নিউট্রন করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় যাকে একটু আগে বলেছি 'তৃতীয় বিকিরণ'। এতে রয়েছে এমন এক কণিকা যার কথা এর পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ফসফরাস ৩০-এর অর্ধজীবনকাল ২½ মিনিট ; কাজেই জোলিও-কুরীরা আল্‌ফা কণিকা ছোড়া বন্ধ করার পরেও তাঁরা যে ফসফরাস-৩০ সৃষ্টি করেছেন সেটা ভেঙে পড়তে কয়েক মিনিট সময় লাগল ; আর ততক্ষণ ধরে বেরোতে থাকল এই তৃতীয় রশ্মি।

জোলিও-কুরীরা এর নাম দিলেন **কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া**। ফসফরাস-৩০ হল প্রথম আইসোটোপ যা স্বাভাবিক অবস্থায় আদৌ পাওয়া যায় না। এ হল এক নতুন পরমাণু, মানুষের হাতে তৈরি পরমাণু। এর ফলে জোলিও-কুরীরা ১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯৩৪ সালের পর থেকে নানা ধরনের পরমাণুকে বিভিন্ন রকম স্বাভা-বিক এবং কৃত্রিম পারমাণবিক গুলি দিয়ে আঘাত করে সব মৌলের হরেক রকম পরমাণু তৈরি হয়েছে। তারা সবই তেজস্ক্রিয়।

এ পর্যন্ত মানুষের তৈরি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সংখ্যা এক হাজা-রের অনেক বেশি হবে। তাহলে বুঝতে পারছ, স্থায়ী আইসোটোপদের চাইতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সংখ্যা ঢের বেশি। যেমন, ধরা যাক মৌল **সিজিয়ামের** (পারমাণবিক সংখ্যা ৫৫) কথা। এর মাত্র একটি স্থায়ী আই-সোটোপের কথা জানা আছে—সেটা সিজিয়াম-১৩৩ ; কিন্তু সিজিয়াম-১২৩ থেকে সিজিয়াম-১৪৪ পর্যন্ত অন্তত বিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়েছে। মানুষের তৈরি আইসোটোপদের অর্ধজীবনকাল কম বলে স্বাভাবিক অবস্থায় এরা টিকে থাকতে পারে না ; এদের মধ্যে শুধু কার্বন-১৪ আর হাইড্রোজেন-৩ নভোরশ্মির প্রভাবে তৈরি হয় বলে প্রকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়।

কখনো কখনো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হলে তার পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাগুলো স্থায়ী হবার মতো সাজানো থাকে না। তাই পরমাণুকেন্দ্রের কণিকারা নিজেদের রদবদল ঘটিয়ে স্থায়ী হবার চেষ্টা করে ; এর ফলে গামা-রশ্মি বেরিয়ে আসে। আদি অস্থায়ী গড়নটাকে বলা হয় **উত্তেজিত রূপ** ; আর এর পরের স্থায়ী অবস্থাকে বলা হয় **স্থির রূপ**। একই পরমাণুকেন্দ্র যখন এমনি দু-তিন রকম রূপে থাকতে পারে তখন তাকে বলা হয় 'নিউ-

banglainternet.com

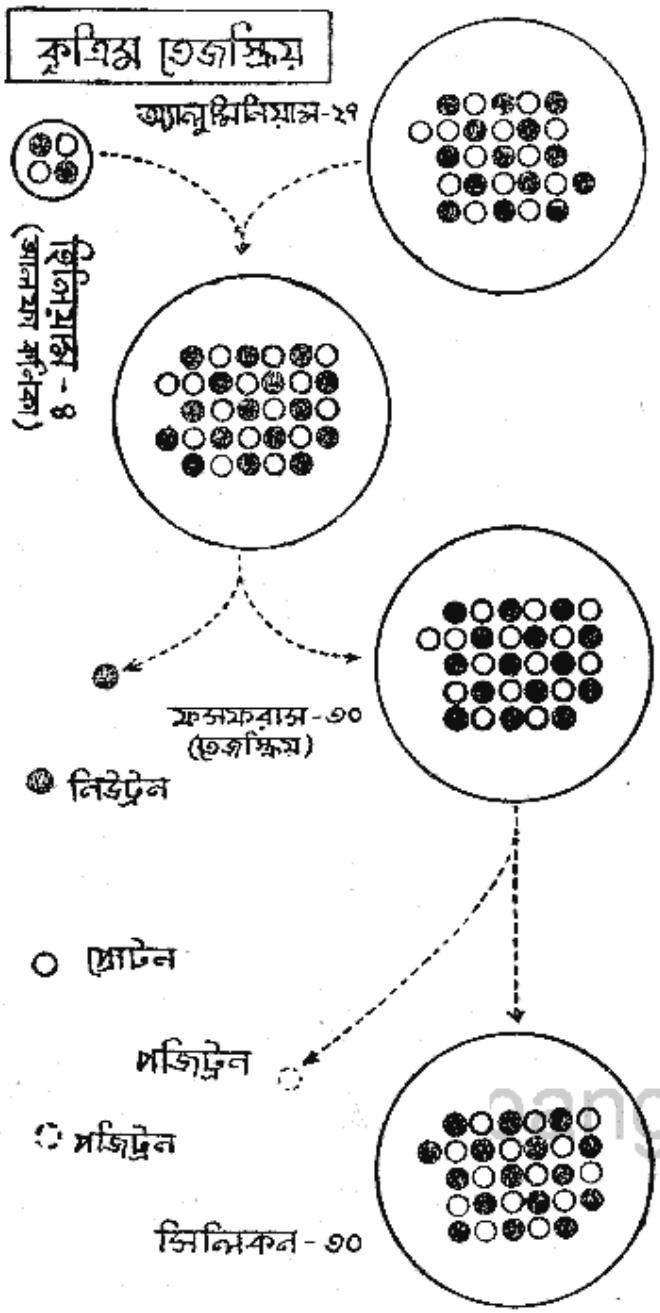

ক্লিয়ার আইসোমার' বা **পারমাণবিক সমরূপী**। অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের মতোই এক সমরূপী থেকে অন্য সমরূপী পরমাণুতে পরিণত হতে নির্দিষ্ট অর্ধজীবনকাল রয়েছে। কয়েকটি স্থায়ী আইসোটোপের পারমাণবিক সমরূপী রয়েছে যেগুলো অস্থায়ী।

নতুন নতুন মৌল

এ থেকে বোঝা যায়, বিজ্ঞানীরা যদি এমনি করে বিভিন্ন মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করতে থাকেন তাহলে শেষটায় একদিন হয়তো তাঁরা এমন এক মৌলের আইসোটোপ তৈরি করে ফেলবেন, প্রকৃতিতে আদৌ যার অস্তিত্ব নেই।

হয়তো তোমাদের মনে পড়বে, আগের এক অধ্যায়ে আমি বলেছিলাম, ১৯৩০ সালের দিকেও ৪৩ আর ৬১ নম্বর মৌল নিশ্চিতভাবে পৃথক করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৭ সালে লরেন্স তাঁর সাইক্লোট্রন যন্ত্র ব্যবহার করে মৌল **মলিবডেনামের** (পারমাণবিক সংখ্যা ৪২) এক কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরি করলেন। এ হল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মলিবডেনাম-৯৯। এর পরমাণুকেন্দ্রে আছে ৪২টি প্রোটন আর ৫৭টি নিউট্রন। একটা বেটা কণিকা ছুড়ে দিয়ে এটা ভেঙে পড়ল, কাজেই একটা নিউট্রন পরিণত হল প্রোটনে। এর ফলে পরমাণুকেন্দ্রে রইল ৪৩টি প্রোটন আর ৫৬টি নিউট্রন। এই হল সেই হারানো ৪৩ নম্বর মৌল। লরেন্স তাঁর পরীক্ষায় পাওয়া বস্তুর খানিকটা নমুনা পাঠিয়েছিলেন ইতালীয় পদার্থবিদ এমিলিও সেগ্রির (Emelio Segre) কাছে--তিনিই সনাক্ত করলেন একে।

তাহলে এবার ঘটল এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার ঃ শুধু আগে থেকে জানা কোন মৌলের এক নতুন আইসোটোপ নয়, এক নতুন মৌলের আইসোটোপ। এটা হল প্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মৌল ; তাই 'কৃত্রিম' কথাটার গ্রীক প্রতিশব্দ থেকে এই নতুন মৌলের নাম রাখা হল **টেক্‌নেটিয়াম**। এর এই বিশেষ আইসোটোপ টেক্‌নেটিয়াম ৯৯-এর অর্ধজীবনকাল ২০০,০০০ বছর ; এত কম অর্ধজীবনকাল নিয়ে এর পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয়। (তোমাদের মনে পড়বে, এর আগে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম পৃথিবীতে যেসব মৌল নেই বিজ্ঞানীরা তাদের আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল কি করে জানেন। এবার তার জবাব পেলে ঃ বিজ্ঞানীরা প্রথম আইসোটোপটা সৃষ্টি করেন, তারপর তার অর্ধজীবনকাল মাপেন।)

banglainternet.com

১৯৪২ সালে মার্কিন রসায়নবিদ চার্লস্ করিয়েলের (Charles Du Bois Coryell) নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ৬১ নম্বর মৌলের সবচেয়ে দীর্ঘ-জীবী আইসোটোপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। এর ভরসংখ্যা ১৪৫ আর অর্ধজীবনকাল প্রায় তিরিশ বছর। গ্রীক পুরাণের এক দেবতা প্রমেথিউস নাকি মানুষকে প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন ; তাঁর নাম অনুসারে ৬১ নম্বর মৌলের নাম রাখা হল **প্রমেথিয়াম**।

এছাড়া রসায়নবিদরা আরো দুটো মৌল পৃথক করলেন ; এগুলো ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভঙ্গের ফলে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এত কম পরিমাণে যে, তাঁরা আগে এদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতেন না। এগুলো হল ফ্রান্সিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৮৭), যার কথা আগে একবার বলেছি, আর **অ্যাস্টাটিন** (পারমাণবিক সংখ্যা ৮৫)।

টেক্নেটিয়ামের আবিষ্কারক সেগ্রের নেতৃত্বে একদল মার্কিন রসায়নবিদ ১৯৪০ সালে অ্যাস্টাটিন আবিষ্কার করেন। (তিনি ঠিক দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধ বাধার আগে ইতালী ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।) অ্যাস্টাটিনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপ হল অ্যাস্টাটিন-২১০। এর অর্ধজীবন-কাল মাত্র আট ঘণ্টার সামান্য ওপরে। 'অ্যাস্টাটিন' নামটাও এসেছে এমন এক গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হল 'অস্থায়ী'।

এবার তাহলে হাইড্রোজেন (পারমাণবিক সংখ্যা ১) থেকে ইউরেনিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৯২) পর্যন্ত সবগুলো মৌলের হদিস পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হল, ৯২-এর চেয়ে বেশি পারমাণবিক সংখ্যাঅলা কোন মৌল থাকা কি সম্ভব? এর জবাব হল, হ্যাঁ।

৯২-এর চেয়ে বেশি পারমাণবিক সংখ্যাঅলা মৌলদের বলা হয় **ইউরে-নিয়াম-পরবর্তী** মৌল। এ বই লেখার সময় পর্যন্ত এগারটি ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌলের কথা জানা গিয়েছিল। (এর পর বিজ্ঞানীরা আরো দুটি আবিষ্কার করেছেন যথাঃ বাদারফোর্ডিয়াম-১০৪ ও হ্যানিয়াম-১০৫—অনু-বাদক)। তার ওপর এদের অনেকগুলোর আবার রয়েছে কয়েকটি করে আইসোটোপ। সবসুদ্ধ পঞ্চাশটিরও বেশি ইউরেনিয়াম-পরবর্তী আইসো-টোপের কথা জানা গিয়েছে।

প্রথম যে ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌল সৃষ্টি হয়েছিল তার পারামাণবিক সংখ্যা হল ৯৩। কতকগুলো নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে (এদের কথা আরো পরে বলব) কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়াম-২৩৯ তৈরি হওয়ার পর এই মৌল পাওয়া

যায়। ইউরেনিয়াম-২৩৯ (৯২টি প্রোটন আর ১৪৭টি নিউট্রন) একটি বেটা কণিকা ছুড়ে দিয়ে ভেঙে যায়। তাতে একটি নিউট্রন পরিণত হয় প্রোটনে ; আর শেষটায় পরমাণুকেন্দ্রে থাকে ৯৩টি প্রোটন আর ১৪৬টি নিউট্রন।

একে প্রথম ৯৩ নম্বর মৌল বলে চিনতে পারেন ম্যাকমিলান (যিনি পরে সিন্ক্রোসাইক্লোট্রন আবিষ্কার করেছিলেন) আর তাঁর সহকর্মী মার্কিন রসায়নবিদ ফিলিপ আবেল্সন (Philip Hauge Abelson) ১৯৪০ সালে।

৯২ নম্বর মৌল ইউরেনিয়ামের নাম রাখা হয়েছিল সৌরজগতের উপগ্রহ ইউরেনাসের নামে ; এই মৌল আর উপগ্রহটির আবিষ্কার হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। কাজেই ইউরেনাসের পরে যে উপগ্রহ আবিষ্কৃত হল (অর্থাৎ নেপ-চুন) তার নামে ৯৩ নম্বর মৌলের নাম রাখা হল **নেপচুনিয়াম**।

নেপচুনিয়াম-২৩৯ হল মানুষের পৃথক করা প্রথম ইউরেনিয়াম পরবর্তী আইসোটোপ ; এটা তা বলে নেপচুনিয়ামের সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী আইসো-টোপ নয়। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হল নেপচুনিয়াম-২৩৭ ; এর অর্ধজীবনকাল ২২,০০,০০০ বছর—পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার মতো যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী নয়।

ইউরেনিয়াম-২৩৮, ইউরেনিয়াম-২৩৫ আর থোরিয়াম ২৩২-এর মতোই নেপচুনিয়াম ২৩৭-ও এক দীর্ঘ তেজস্ক্রিয় শ্রেণীতে ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ে। অন্যান্য আইসোটোপের মতো এটা ভেঙে ভেঙে শেষটায় সীসার আইসোটোপ সৃষ্টি করে না, পরিণত হয় বিসমাথ ২০৯-এ। নেপচুনিয়াম-২৩৭ যেমন পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায় না, তেমনি এর ভেঙে-পড়া কোন আইসোটোপও পৃথিবীতে আর নেই। তবে এখন কৃত্রিম উপায়ে নেপচুনিয়াম-২৩৭ তৈরি সম্ভব হওয়াতে তার পরবর্তী সবগুলো ভেঙে পড়া আইসোটোপও সৃষ্টি হয়েছে। এবারে আর শুধু মানুষে তৈরি আইসোটোপ বা মানুষে তৈরি মৌল নয়, একেবারে সম্পূর্ণ মানুষে তৈরি তেজস্ক্রিয় শ্রেণীর জন্ম হয়েছে।

নেপচুনিয়ামের কোন কোন আইসোটোপ বেটা কণিকা ছুড়ে দিয়ে ভেঙে পড়ে। যেমন, নেপচুনিয়াম-২৩৯ ভাঙে এমনিভাবেঃ এতে একটি প্রোটন যোগ হয়, আর সৃষ্টি হয় ৯৪ পারামণবিক সংখ্যার এক নতুন মৌল।

মার্কিন পদার্থবিদ গ্লেন সীবর্গের (Glenn Theodore Seaborg) সঙ্গে মিলে ম্যাকমিলান ১৯৪০ সালে প্রথম ৯৪ নম্বর মৌলকে চিনতে

banglainternet.com

পারেন। এর পর সীবর্গ অন্যান্য ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌল সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান। এজন্যে ম্যাকমিলান আর সীবর্গ ১৯৫১ সালে এক-যোগে নোবেল পুরস্কার পান।

নেপচুনের পরে যে গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল (অর্থাৎ প্লুটো) তার নাম অনুসারে ৯৪ নম্বর মৌলের নাম রাখা হয় **প্লুটোনিয়াম**। প্লুটোনিয়ামের আইসোটোপদের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘজীবী হল প্লুটোনিয়াম-২৪৪ ; এর অর্ধজীবনকাল সাত কোটি বছর।

ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম পর্যন্ত যাওয়া যেমন গবেষণাগারে সম্ভব, তেমনি প্রকৃতিতেও এ রকম পরিবর্তন ঘটছে। মাঝে মধ্যে মাটিতে একটি ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু হয়তো আঁকড়ে ধরে মহাজাগতিক রশ্মি বা অন্য কিছু থেকে ছুটে আসা কাছাকাছি একটি নিউট্রন। এতে এটা প্রথমে হয় ইউরেনিয়াম-২৩৯, তারপর নেপচুনিয়াম-২৩৯, সবশেষে প্লুটোনিয়াম-২৩৯।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ইউরেনিয়ামের খনিজে প্রতি কোটি কোটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে একটি প্লুটোনিয়াম পরমাণু থাকার কথা। ১৯৪২ সালে ইউরেনিয়ামের খনিজে সত্যি সত্যি প্লুটোনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেল। নেপচুনিয়ামও থাকার কথা, তবে এর চেয়ে আরো অনেক কম পরিমাণে।

১৯৪৪ সালে আরো দুটি ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌল সৃষ্টি হল। আমেরিকার নামে এদের একটির নাম দেওয়া হল **আমেরিসিয়াম** (পারমাণবিক সংখ্যা ৯৫), আর কুরী-দম্পতির নামে অন্যটির নাম দেওয়া হল **কুরীয়াম** (পারমাণবিক সংখ্যা ৯৬)।

১৯৪৯ সালে তৈরি হল ৯৭ আর ৯৮ নম্বর মৌল। এ যাবৎ যে কটি ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌল তৈরি হয়েছে সেগুলো সবই হয়েছে বার্কলিতে স্থাপিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই জন্যে ৯৭ নম্বর মৌলের নাম দেওয়া হল **বার্কেলিয়াম**, আর ৯৮ নম্বর মৌলের নাম দেওয়া হল **ক্যালিফোর্নিয়াম**।

১৯৫৪ সালে ঘোষণা করা হল, ৯৯ আর ১০০ নম্বর মৌল সৃষ্টির কথা। ১৯৫৫ সালে সৃষ্টি হল ১০১ নম্বর মৌল। তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামে এদের নাম রাখা হল **আইনস্টাইনিয়াম, ফার্মিয়াম আর মেন্ডেলেভিয়াম**।

banglainternet.com

বুঝতেই পারছ, মেন্ডেলেভিয়াম নামটা এসেছে রুশ বিজ্ঞানী মেন্ডেলীয়েভ-এর নাম থেকে, যিনি প্রায় এক শ' বছর আগে মৌলদের পর্যাবৃত্ত ছক আবিষ্কার করেছিলেন। আইনস্টাইনিয়াম নামটি এসেছে আইনস্টাইনের নাম থেকে ; এই মৌল আবিষ্কারের মাত্র ক'মাস আগেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ইতালীয়-মার্কিন বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি-ও (Enrico Fermi) ১০০ নম্বর মৌল আবিষ্কারের অল্পদিন আগে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ; কাজেই তাঁর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে প্রথম ১০২ নম্বর মৌল সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়। স্টকহোমের নোবেল ইন্সটিটিউটে এটা সৃষ্টি হয় বলে এর নাম রাখা হয় **নোবেলিয়াম**।

দুর্ভাগ্যক্রমে নোবেল ইন্সটিটিউটে যে প্রক্রিয়ায় মৌলটি তৈরি হয়েছিল বলা হয়, অন্য জায়গায় বিজ্ঞানীরা সে প্রক্রিয়ায় এটা তৈরি করতে পারলেন না। অবশ্য তাঁরা অন্য উপায়ে ১০২ নম্বর মৌল সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যে নোবেলিয়াম নামটি এখনো সরকারীভাবে গৃহীত হয়নি ; অবশ্য এর জন্যে আর কোন নাম প্রস্তাবও করা হয়নি।

১৯৬১ সালে তৈরি হল ১০৩ নম্বর মৌল। সাইক্লোট্রনের আবিষ্কারক লরেন্স এর মাত্র অল্প ক'বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে এর নামকরণ করা হল **লরেন্সিয়াম**।

ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌল সবগুলিই তেজস্ক্রিয়। তাছাড়া পারমাণবিক সংখ্যা যত বাড়ে এদের তৈরি করাও হয়ে দাঁড়ায় তত কঠিন, আর অর্ধজীবনকাল হয় তত কম। ৯৯ নম্বর মৌলের (আইনস্টাইনিয়াম-২৫৪) সবচেয়ে দীর্ঘজীবী আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল হল দেড় বছর। ১০০ নম্বর মৌলের (ফার্মিয়াম-২৫৩) সবচেয়ে দীর্ঘজীবী আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল সাড়ে চার দিন। ১০১ নম্বর মৌলের (মেন্ডেলেভিয়াম-২৫৬) সবচেয়ে স্থায়ী আইসোটোপের অর্ধজীবনকাল হল মোটে দেড় ঘণ্টার মতো। লরেন্সিয়ামের (লরেন্সিয়াম-২৫৭) একমাত্র আইসোটোপটির অর্ধজীবনকাল মোটে আট সেকেণ্ড। এর পর আর ক'টি নতুন মৌল সৃষ্টি করা যাবে সেটা বলা তাই রীতিমতো শক্ত।

নতুন মৌলকণিকার আবির্ভাব

প্রত্যেকের বিপরীত

এ পর্যন্ত এ বইতে আমরা মাত্র তিন জাতের মৌলকণিকা নিয়ে আলোচনা করেছি : ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। হয়তো মনে হবে, এই তিনটিই তো যথেষ্ট ; এই তিনটি দিয়েই বেশ ভালভাবে বোঝানো যায় পরমাণুর গড়ন আর কি করে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে।

আসলে কিন্তু এই তিনটি মৌলকণিকা মোটেই যথেষ্ট নয়, আর এ বই-এর দুজায়গায় আমি একটু আভাস দিয়েছি যে, এছাড়া আরো মৌলকণিকা রয়েছে। নভোরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করলে যে গৌণ বিকিরণের সৃষ্টি হয় তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। এছাড়া জোলিও-কুরীরা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করার সময় যে এক ধরনের রহস্যময় রশ্মির খোঁজ পান তার কথাও বলেছি। এই দুই ক্ষেত্রেই আগে বলা হয়নি এমন সব নতুন ধরনের মৌল কণিকা জড়িত। এবার তাদের কথা আলোচনা করার সময় এসেছে।

এসব নতুন কণিকাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩০ সালে। এ বছর পল ডিরাক (Paul Adrien Maurice Dirac) নামে এক ইংরেজ পদার্থবিদ ইলেকট্রনদের চালচলন প্রকাশ করার জন্যে কতকগুলো গণিতের সমীকরণ তৈরি করছিলেন। তাঁর কাছে মনে হল তাঁর সমীকরণগুলো শুদ্ধ হয়ে থাকলে ইলেকট্রন দুজাতের হবার কথা। তার এক জাতের হবে সাধারণ ইলেকট্রন, যার আধান হবে —১। আরেক জাতের হবে ঠিক এই ইলেকট্রনের উল্টো—এমন এক কণিকা যার ভর ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু আধান এর উল্টো অর্থাৎ +১।

এ রকম 'ধনাত্মক ইলেকট্রন' থাকা কি সত্যি সত্যি সম্ভব? ১৯৩২ সালে মার্কিন পদার্থবিদ কার্ল অ্যাণ্ডারসন (Carl David Anderson) নভোরশ্মি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। নভোরশ্মি তাঁর মেঘকক্ষে ঢুকে তার ভেতর রাখা একটা সীসার খণ্ডের পরমাণুদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এতে অন্যান্য কণিকা সৃষ্টি হল ; আর তাদের মধ্যে অ্যাণ্ডারসন লক্ষ্য করলেন, মেঘের কণায় একটি পথ যেটা হুবহু ইলেকট্রনের পথ বলে মনে হয়। কিন্তু মুশকিল হল, এটা বাঁকানো উল্টো দিকে ; অর্থাৎ এটা ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত নয়, ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত।

ডিরাক যে ধনাত্মক ইলেকট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন, তাকেই আবিষ্কার করেছেন অ্যাণ্ডারসন। তিনি এর নাম দিলেন **পজিট্রন**। যেহেতু, এটা সাধারণ কণিকার বিপরীত সেজন্যে এ ধরনের কণিকাকে বলা হয় **উল্টা-কণিকা**। ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকাকে কখনো কখনো **উল্টা-ইলেকট্রনও** বলা হয়।

এজন্যে ডিরাক নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৩৩ সালে, আর অ্যাণ্ডারসন পেলেন ১৯৩৮ সালে।

নভোরশ্মির আঘাত ছাড়া অন্যভাবেও পরে পজিট্রন সৃষ্টি হতে দেখা গেল। আগে বলেছি, জোলিও-কুরী দম্পতি ১৯৩৪ সালে প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। তাঁরা ১৫টি প্রোটন আর ১৫টি নিউট্রনঅলা ফসফরস-৩০ পরমাণু সৃষ্টি করেছিলেন। ফসফরাস-৩০ অস্থায়ী ; এর একটি প্রোটন হয়ে যায় একটি নিউট্রন, তাতে এটি ১৪টি প্রোটন আর ১৬টি নিউট্রনঅলা স্থায়ী সিলিকন-৩০ পরমাণুতে পরিণত হয়।

কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হয় কি করে? আগে বলেছি, পরমাণুকেন্দ্রে যখন নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়, তখন একটি বেটা-

banglainternet.com

কণিকা (সাধারণ ইলেকট্রন) বেরিয়ে আসে। প্রোটন বদলে নিউট্রন হওয়া এর ঠিক উল্টো, কাজেই একটা উল্টো কণিকা বেরিয়ে আসাই স্বাভাবিক। সাধারণ একটা ইলেকট্রন ছুড়ে দেবার বদলে ফসফরাস-৩০ পরমাণুকেন্দ্র ছুড়ে দেয় ধনাত্মক আধানঅলা ইলেকট্রন, অর্থাৎ পজিট্রন। এর পর পজিট্রন ছুড়ে দিয়ে ভেঙে পড়ে এ রকম অসংখ্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

আসলে পজিট্রনই একমাত্র উল্টা-কণিকা নয়। ডিরাকের আঁকজোক থেকে মনে হল, আসলে যে-কোন কণিকারই একটা করে বিপরীত থাকার কথা। প্রোটনেরও একটা বিপরীত কণিকা থাকার কথা, তাকে বলা যেতে পারে **উল্টো-প্রোটন**।

মুশকিল হল, যে-কণিকা যত বেশি ভারি তাকে সৃষ্টি করার জন্যে তত বেশি শক্তি ব্যয় করা দরকার। উল্টা-প্রোটনের ভর দাঁড়াবে, একটা প্রোটনের সমান অর্থাৎ ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ভরের চেয়ে ১৮৩৬ গুণ বেশি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, একটা পজিট্রন সৃষ্টি করতে যতখানি শক্তি খরচ হয়, একটা উল্টা-প্রোটন সৃষ্টি করতে তার চেয়ে ১৮৩৬ গুণ বেশি শক্তির দরকার।

নভোরশ্মির প্রায় যে-কোন কণিকাই পজিট্রন সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী। শুধু অতি শক্তিশালী আর অতি দুর্লভ নভোরশ্মির কণিকাই উল্টা-প্রোটন সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের কণিকা-ত্বরক তৈরি করার কয়েক শ' কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সেগ্রি (টেক্‌নেটিয়াম ও অ্যাস্‌টাটিনের আবিষ্কারক) আর তাঁর সহকর্মী, তরুণ মার্কিন পদার্থবিদ আওয়েন চেম্বারলেন (Owen Chamberlain) বেভাট্রনের সাহায্যে উল্টা-প্রোটন সৃষ্টি করে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। এজন্যে সেগ্রি আর চেম্বারলেন নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৫৯ সালে।

দেখা গেল, উল্টা-প্রোটনের ভর প্রোটনের সমান, তবে এর আধান ধনাত্মক না হয়ে ঋণাত্মক (—১)।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, **উল্টা-নিউট্রনেরও** হদিস পাওয়া গেল। উল্টা-নিউট্রনের ভর সাধারণ নিউট্রনের সমান আর সাধারণ নিউট্রনের মতোই এতে কোন আধান নেই। নিউট্রন আর উল্টা-নিউট্রন দুয়েরই আধান ০। তাহলে একটা আবার অন্যটার উল্টো হয় কি করে?

এটা সম্ভব, তার কারণ হল, প্রায় সব মৌল কণিকাই মনে হয় নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে। যখন কোন আধানযুক্ত কণিকা এভাবে নিজের চারপাশে ঘোরে, তখন সেটা একটা নির্দিষ্ট দিকযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এর উত্তর-চৌম্বক মেরু থাকে এক দিকে আর দক্ষিণ-চৌম্বক মেরু থাকে অন্য দিকে। কোন কণিকার তুলনায় তার উল্টা-কণিকায় এই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পাল্টে যায়। ধরা যাক, ইলেকট্রন আর প্রোটনের চৌম্বক ক্ষেত্রের উত্তর মেরু থাকে ওপর দিকে ; কিন্তু পজিট্রন আর উল্টা-প্রোটনের উত্তর চৌম্বক মেরু থাকে নিচের দিকে।

নিউট্রন আধানবিহীন হলেও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘোরার ফলে একটা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। উল্টা-নিউট্রনের ভর নিউট্রনের সমান আর দুই-ই আধানবিহীন হলেও উল্টা-নিউট্রনের চৌম্বকক্ষেত্র নিউট্রনের চৌম্বক-ক্ষেত্রের বিপরীত।

উল্টা-বস্তু

তাহলে আমরা এবার পাচ্ছি, দুশ্রেণীর কণিকা। এক শ্রেণীতে আছে আগেকার পরিচিত সব কণিকাঃ প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন। আরেক শ্রেণীতে পড়ে এদের সব বিপরীত কণিকাঃ উল্টা-প্রোটন, উল্টা-নিউট্রন আর পজিট্রন।

সাধারণ পরমাণু হল, প্রথম শ্রেণীর কণিকা দিয়ে তৈরি ; তবে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কণিকা দিয়ে তৈরি পরমাণুও কল্পনা করতে পারি। এমন পরমাণুকেন্দ্রের কল্পনা করা যায় যা উল্টা-প্রোটন আর উল্টা-নিউট্রন দিয়ে তৈরি। এ ধরনের পরমাণুকেন্দ্রের মোটমাট আধান ধনাত্মক না হয়ে ঋণাত্মক হবে। এই ঋণাত্মক আধানের ভারসাম্য রাখার জন্যে এ ধরনের পরমাণু-কেন্দ্রের চারপাশে থাকবে পজিট্রন।

তাহলে শুধু উল্টা-কণিকা দিয়ে তৈরি হবে এই **উল্টা-পরমাণু**। আর কতকগুলো উল্টা-পরমাণু মিলে সৃষ্টি হবে **উল্টা-পদার্থ**।

এ রকম উল্টা-পদার্থের অস্তিত্ব কি সত্যি সম্ভব? ১৯৬৫ সালে পদার্থ-বিদরা একটি উল্টা-প্রোটন আর একটি উল্টা-নিউট্রন এক সাথে করে একটি **উল্টা-ডয়টেরিয়াম** সৃষ্টি করলেন। বহু কষ্টে বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ এইটুকুই মাত্র করতে পেরেছেন।

banglainternet.com

মুশকিল হল, উল্টা-কণিকারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। যেমন, একটি পজিট্রন হয়তো সৃষ্টি হল, কিন্তু তার চারপাশে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য ইলেকট্রন। যখন একটি কণিকা তার উল্টা-কণিকার সংস্পর্শে আসে, তখন দুটিতে পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে। বলা চলে তাদের **পারস্পরিক বিনাশ** ঘটে। যেখানে আগে একটি কণিকা আর একটি উল্টা-কণিকা ছিল, এখন আর সেখানে কোন বস্তুই রইল না।

একটি পজিট্রন সৃষ্টি হবার পর সেটার সাথে একটি ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে তাদের পারস্পরিক বিনাশ ঘটতে মোট এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মতো সময় লাগে। (কখনো কখনো পজিট্রন আর ইলেকট্রনে সংঘাত হয়ে বিনাশ ঘটবার আগে এরা এক সাথে পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে থাকে ; ১৯৫২ সালে এই জুটি আবিষ্কৃত হয়—এর নাম রাখা হয় **পজিট্রনিয়াম**।) ঠিক তেমনিভাবে উল্টা-প্রোটন সৃষ্টি হলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে প্রোটনের সাথে আর উল্টা-নিউট্রন নিউট্রনের সাথে ধাক্কা লেগে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই জন্যেই উল্টা-বস্তু নিয়ে কাজ করা এমন শক্ত।

অবশ্য সংঘাতের ফলে কণিকাগুলি একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায় না। বস্তু হিসেবে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু তারা শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে হিসেব করা যায় একটি ইলেকট্রন আর পজিট্রন অদৃশ্য হলে ঠিক কতখানি শক্তি সৃষ্টি হবে ; আর আসলে সৃষ্টিও হয় ঠিক এই পরিমাণ শক্তি। এছাড়া শক্তি থেকেও আবার এমনি ইলেকট্রন-পজিট্রন জুটি তৈরি হওয়া সম্ভব। (একে বলা হয় **জোড়-সৃষ্টি**।) এখানেও ঠিক আইনস্টাইনের হিসেব অনুযায়ী শক্তির দরকার হয়।

একটি প্রোটন আর একটি উল্টা-প্রোটনের যখন বিনাশ ঘটে তখন ইলেক-ট্রন বা পজিট্রনের চেয়ে বস্তুর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৩৬ গুণ, কাজেই শক্তিও সৃষ্টি হয় ১৮৩৬ গুণ। এই ধরনের বস্তুর বিনাশ আর শক্তি প্রকাশের হিসেব থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সত্যতা আর উপযোগিতার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিশ্ব প্রায় সবটাই মনে হয় কণিকা দিয়ে তৈরি, উল্টা-কণিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অতি কদাচিৎ—এতে বিজ্ঞানীরা অবাক হন। এমন মনে করার কারণ রয়েছে যে, বিশ্বে কণিকা আর উল্টা-কণিকা সমান পরিমাণে থাকা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, আসলে বিশ্ব রয়েছে দুটো। তার একটা হল আমাদের বিশ্ব, যার প্রায় সবটাই তৈরি সাধারণ কণিকা দিয়ে ; আর কোথাও রয়েছে আর একটা উল্টা-বিশ্ব, তার প্রায় সবটা তৈরি উল্টা-কণিকা দিয়ে।

আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, আসলে বিশ্ব বস্তু আর উল্টা-বস্তু মিলিয়ে তৈরি—বিশাল গ্যালাক্সি বা **তারকাপুঞ্জে** এরা আলাদাভাবে রয়েছে। আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি হয়তো তৈরি উল্টা-বস্তু দিয়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন হয়তো কখনো দূরে কোন বস্তু-গ্যালাক্সি আর উল্টা-বস্তু-গ্যালাক্সিতে ঘটবে সংঘর্ষ আর তাতে সৃষ্টি হবে বিপুল পরিমাণ শক্তি। কোন কোন গ্যালাক্সিতে এ ধরনের বিপুল শক্তির উদ্ভাস দেখতে পাওয়া যায় ; কে জানে এগুলো ব্যাপক আকারে বস্তু আর উল্টা-বস্তুর সংঘর্ষ কিনা!

সবচেয়ে ছোট

পরমাণুর গড়ন নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বেটা কণিকা সম্পর্কে একটা রহস্যজনক ব্যাপার দেখা দিল। তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের প্রথম দশকের মধ্যে ধরা পড়ল কোন কোন পরমাণু থেকে বেটা কণিকা বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিভিন্ন পরিমাণ শক্তি নিয়ে।

পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে হল, একটা নির্দিষ্ট পরমাণু থেকে সব বেটা কণিকাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিয়ে বের হবার কথা। কিন্তু তা না হয়ে বেটা কণিকার শক্তি পাওয়া গেল বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে কম। তাছাড়া কতখানি যে কম হবে তারও কোন নির্দিষ্টতা নেই ; কোন কোন বেটা কণিকা তো বেরোয় প্রায় নির্জীব, শক্তিহীন অবস্থায়।

মনে হল, এখানে যেন বস্তু-শক্তির নিত্যতার সূত্র খাটছে না ; এটা বিজ্ঞানীদের বড্ড ভাবিয়ে তুলল। এই নিত্যতার সূত্র এত জায়গায় সত্য আর কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা এটা অসত্য হতে পারে ভাবতেও যেন মনে কষ্ট পেলেন। তাই তাঁরা ব্যাপারটার নতুন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৯৩১ সালে ওল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ পাউলি (যিনি ইলেকট্রন-খোলসের তত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ) এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

banglainternet.com

তিনি বললেন, যখনই একটি বেটা কণিকা সৃষ্টি হয় তখনই সৃষ্টি হয় আরো একটি কণিকা। যে শক্তিটুকু হারিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তা আসলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই দ্বিতীয় কণিকাটি।

তাহলে এই অন্য কণিকাটির কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না কেন? পাউলি দেখালেন যে, এই কণিকাটি যদি আদপে থেকেও থাকে তাহলে এতে কোন বৈদ্যুতিক আধান নেই, তাই মেঘকক্ষে এর নিশানা পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এটা নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় হালকা, ইলেকট্রনের চেয়েও অনেক বেশি হালকা; এমনও হতে পারে যে, এর কোন ভরই নেই।

এই কণিকাটির নামকরণ করা হল, **নিউট্রিনো** (একটা ইতালীয় শব্দ, যার অর্থ হল 'ছোট্ট আর নিরপেক্ষ')। স্বভাবতই আধানও নেই আবার ভরও নেই এ রকম কণিকার হদিস পাওয়া মুশকিল। ইতালীয় পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি এই কণিকার চালচলন কেমন হবার কথা তা হিসেব করে বের করলেন; দেখা গেল, এদের বস্তুর ভেতর দিয়ে এমনভাবে চলে যাবার কথা যেন সেখানে কিছুই নেই। এখান থেকে শুরু করে সবচেয়ে কাছের তারা পর্যন্ত পুরু যদি নিরেট সীসের দেয়াল থাকে তাহলেও নিউট্রিনো তার ভেতর দিয়ে ফুঁড়ে যেতে পারবে।

তবে নিউট্রিনোর যদি ভরও না থাকে, আধানও না থাকে আর কোনমতেই এর হদিস পাওয়া না যায় (এর হদিস করতে হলে একে থামাতে হবে, আর কোটি কোটি মাইল পুরু সীসের দেয়ালও একে থামাতে পারে না), তাহলে এর যে সত্যি অস্তিত্ব আছে তা বোঝার উপায় কি? এটা কি তাহলে নেহাতই 'শূন্য-কণিকা'? পুরোপুরি নয়। নিউট্রিনো অক্ষের চারপাশে ঘোরে আর তার চৌম্বক-ক্ষেত্রও রয়েছে। এরা শক্তি বয়ে নেয়, আর কদাচিৎ একটি-দুটি নিউট্রিনো বস্তুতে আটকাও পড়েছে।

অনেক পদার্থবিদ নিউট্রিনোর অস্তিত্বে রীতিমতো অবিশ্বাস প্রকাশ করলেন। আবার অনেকে হলপ করে বললেন, তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। এরা যে শুধু ভর-শক্তির নিত্যতার সূত্রকে রক্ষা করাই সম্ভব করেছে তাই নয়, এরা না থাকলে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ভেঙে পড়বে।

আসলে এই অতি-ছোট কণিকা আবার আছে দুজাতের: সাধারণ নিউট্রিনো আর **উল্টা-নিউট্রিনো**। যখন পরমাণুর বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটি বেটা কণিকা (ছুটন্ত ইলেকট্রন), তখন তার সাথে বেরোয় উল্টা-নিউট্রিনো।

যখন পরমাণু থেকে ছুটে বেরোয় একটি পজিট্রন, তখন তার সাথে সাথে বেরোয় নিউট্রিনো।

দুজন মার্কিন পদার্থবিদ ক্লাইড কাওয়ান (Clyde L. Cowan, Jr.) আর ফ্রেডারিক রেইন্স (Frederick Reines) স্থির করলেন যেমন করে হোক এই কণিকা-জুটির হদিস বের করতেই হবে। তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই **পারমাণবিক ক্রিয়াকরে** (এর কথা পরে ভাল করে বুঝিয়ে বলব) কোটি কোটি নিউট্রিনো সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এই ক্রিয়াকরেই তাঁদের পরীক্ষা শুরু হল।

এই অদৃশ্য নিউট্রিনোর রশ্মি তাঁরা রাসায়নিক দ্রবা মাখানো এক বিরাট পানির চৌবাচ্চার মধ্যে ছুড়লেন। মাঝেমধ্যে এই কোটি কোটি নিউট্রিনোর মধ্যে একটি-দুটির কোন প্রোটন কণিকার সাথে সংঘর্ষ হয়ে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটবার কথা। এই চৌবাচ্চার পানি আর রাসায়নিক উপাদানগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছিল যেন পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটলেই গামারশ্মি বেরোবে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে, আর কোনভাবে নয়। ১৯৫৬ সালে এই বিশেষ ধাঁচের গামারশ্মির হদিস পাওয়া গেল আর মিলল উল্টা-নিউট্রিনোর সত্যিকার হদিস—পাউলি এর অস্তিত্ব ঘোষণা করার পঁচিশ বছর পরে।

উল্টা-নিউট্রিনো যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্য নিউট্রিনোও নিশ্চয়ই রয়েছে। সূর্যে যে ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়ায় আলো তৈরি হচ্ছে তাতে নিউট্রিনো সৃষ্টি হবার কথা।

এতে বোঝা যায়, সমগ্র পৃথিবী আর এর ওপরকার সবকিছুতে দিন রাত সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ নিউট্রিনোর স্রোত এসে পড়ছে। দিন-রাত প্রতি সেকেন্ডে আমাদের শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা দিয়ে ফুঁড়ে যাচ্ছে অন্তত ৬,০০০ কোটি নিউট্রিনো কণিকা। (এমন কি রাত্রেও, পৃথিবীর অন্য পিঠে সূর্য থেকে যেসব নিউট্রিনো এসে পড়ে সেগুলো অনায়াসে পৃথিবীকে ফুঁড়ে আমাদের দেহের ভেতর দিয়ে চলে যায়—আলোর সমান বেগে।) এসব নিউট্রিনো আমাদের দেহের কোন ক্ষতি করে না। এরা শুধু আমাদের ভেতর দিয়ে চলে যায়—যেন সেখানে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজ এমন সব যন্ত্রপাতি তৈরির চেষ্টা করছেন যার সাহায্যে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা নিউট্রিনোদের হদিস করা যাবে। এসব নিউট্রিনো থেকে সূর্যের ভেতরকার অবস্থা সম্বন্ধে এমন

banglainternet.com

কিছু কথা জানা যেতে পারে যা সূর্যের আলো থেকে জানা যায় না। তাছাড়া একটা মত অনুসারে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটার ঠিক আগে তা থেকে খুব বেশি পরিমাণ নিউট্রিনো বেরোতে থাকে। আকাশে বিশেষ জায়গা থেকে অতিরিক্ত রকমের নিউট্রিনো আসার খোঁজ পেলে বিজ্ঞানীরা হয়তো সেখানে নক্ষত্র-বিস্ফোরণের প্রত্যাশা করতে পারেন। এমন কি, আজ বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা, 'নিউট্রিনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের' জন্ম হচ্ছে।

মাঝামাঝি

পরমাণুর গড়নে আরেকটি ধাঁধা হল তার কেন্দ্র নিয়ে। ১৯৩২ সালের দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরমাণুকেন্দ্র তৈরি প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। কিন্তু তাহলে এদের এক সাথে বেঁধে রাখে কিসে? প্রোটনদের রয়েছে ধনাত্মক আধান, কাজেই তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনগুলো ঠাসা রয়েছে খুবই কাছাকাছি। আর যেহেতু দূরত্ব যত কমে বিকর্ষণ তত বাড়ে, কাজেই পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাগুলো প্রচণ্ড বিকর্ষণে অকল্পনীয় শক্তিতে চারপাশে ছিটকে পড়ার কথা; কিন্তু তা তো হয় না।

মনে হয়, নিউট্রনের উপস্থিতির ফলেই প্রোটনগুলো এক সাথে জড়াজড়ি করে থাকতে পারে; কিন্তু কেমন করে?

পরমাণুর গড়নের একটা তত্ত্ব তৈরির জন্যে প্লাঙ্কের গুচ্ছকণিকা মতবাদ (৬৫ পৃষ্ঠা দেখ) ব্যবহারের প্রয়োজন হল। এটা প্রথম করলেন বোর এবং তাঁর গবেষণা থেকেই পরে ইলেকট্রনদের খোলস ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল।

১৯২৭ সালে আরউইন শ্রোডিঙ্গার (Erwin Shroedinger) নামে এক অস্ট্রীয় পদার্থবিদ বিস্তারিতভাবে গুচ্ছকণিকা বলবিদ্যার গণিত সৃষ্টি করলেন; জার্মান-ব্রিটিশ পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্ন্ (Max Born) আবার তার উন্নতি সাধন করলেন। তাঁদের কাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হল যে, ১৯৩৩ সালে শ্রোডিঙ্গার আর ১৯৫৪ সালে বর্ন্ নোবেল পুরস্কার পেলেন।

মারি গেপার্ট-মেয়ার (Marie Goeppert-Mayer) নামে একজন জার্মান-মার্কিন পদার্থবিদ গুচ্ছকণিকা-বলবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটন আর নিউট্রনের সমাবেশ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। তিনি এবং হান্স্ জেন্সেন্ (J. Hans Daniel Jensen) নামে এক জার্মান

পদার্থবিদ মিলে ১৯৪৮ সালে পরমাণুকেন্দ্রেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে বলে প্রস্তাব করলেন; এই স্তরগুলো অনেকটা ইলেকট্রন খোলসের মতোই, তবে আরো জটিল। এর ফলে এঁরা ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাদের এক সাথে জোট বেঁধে থাকা ব্যাখ্যা করার জন্যে গুচ্ছকণিকা-বলবিদ্যা সাহায্য করল কি করে?

আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল হাইসেনবার্গ থেকে, যিনি প্রথম পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন-নিউট্রন সংযুক্ত গড়নের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯২৬ সালেই তিনি এক ধরনের গুচ্ছকণিকা-বলবিদ্যার তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন; তার সাথে ১৯২৭ সালে তিনি দেখালেন কতকগুলো পরিমাপ একেবারে সঠিকভাবে নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সব সময় যে-কোন পরিমাপেই থাকবে খানিকটা অনিশ্চয়তা; আর বিশেষভাবে ছোট বস্তু, যেমন অতিপারমাণবিক কণিকার বেলায় এই অনিশ্চয়তা হবে বিশেষভাবে প্রবল। এই অনিশ্চয়তা-বাদের জন্যে হাইসেনবার্গ নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৩২ সালে।

হিদেকি ইউকাওয়া (Hideki Yukawa) নামে এক জাপানী পদার্থবিদ এই অনিশ্চয়তার তত্ত্বকে পরমাণুকেন্দ্রের গবেষণায় কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, বৈদ্যুতিক আধানের দরুন প্রোটনদের মধ্যে যে বিকর্ষণের শক্তি, তাকে ছাপিয়ে ওঠার জন্যে প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে নিশ্চয়ই আরো বড় আকর্ষণের শক্তি রয়েছে।

এই **পারমাণবিক বলের** পাল্লা খুব কম। মাত্র পরমাণুকেন্দ্রের অতি ছোট এলাকার মধ্যেই এই আকর্ষণ সীমাবদ্ধ। পরমাণুকেন্দ্রের বাইরে এর কোন হদিস পাওয়া যায় না।

পারমাণবিক বল পরমাণুকেন্দ্রে অতি প্রবল আর তার বাইরে অতি দুর্বল হবার জন্যে যেসব শর্ত পূরণ হওয়া দরকার, ইউকাওয়া সেগুলো আঁক কষে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনিশ্চয়তার তত্ত্ব থেকে তিনি বললেন, পরমাণুকেন্দ্রে নিশ্চয়ই নতুন এক ধরনের কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে। এই কণিকা প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে আনাগোনা করে; কিন্তু এরা এমন ক্ষণস্থায়ী যে, পরমাণুকেন্দ্রের বাইরে এদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। শুধু তাই নয়, ইউকাওয়া স্থির করলেন, এই নতুন কণিকার ভর হবে অন্যান্য পরিচিত কণিকার ভরের মাঝামাঝি। এর ভর হওয়ার কথা ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি, অথচ প্রোটন বা নিউট্রনের চেয়ে কম। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, এর ভর হওয়া উচিত ইলেকট্রনের চেয়ে ২৫০ গুণ বেশি।

banglainternet.com

ইউকাওয়া তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ১৯৩৫ সালে আর তার পরের বছরই অ্যান্ডারসন (পজিট্রনের আবিষ্কারক) নভোরশ্মি থেকে সৃষ্টি হওয়া গৌণ বিকিরণে এমনি এক কণিকার খোঁজ পেলেন। শুধু তাই নয়, এই গৌণ বিকিরণের বেশির ভাগ অংশই হচ্ছে এমনি ধরনের কণিকা।

অ্যান্ডারসন এই কণিকার নাম দিলেন, মেসোট্রন (এক গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ 'মাঝারি') ; কেননা এর ভর ইলেকট্রন আর প্রোটনের মাঝামাঝি। নামটা অল্পদিনের মধ্যেই সংক্ষেপ হয়ে দাঁড়াল **মেসন**।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পরে দেখা গেল ইউকাওয়া যে কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মেসন ঠিক তা নয়। মেসন হল ইলেকট্রনের চেয়ে মাত্র ২০০ গুণ বেশি ভারি, তাছাড়া এর চালচলনও ঠিক যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমন নয়। এটি সেই ইউকাওয়ার বর্ণনামতো কণিকা হলে যে-কোন বস্তু একে অতি তাড়াতাড়ি শুষে ফেলার কথা ; কিন্তু মেসন নানা ধরনের বস্তুর মধ্যে অনেকখানি করে ঢুকে গেলেও তার হারিয়ে যাবার লক্ষণ দেখা গেল না।

১৯৪৭ সালে সিসিল পাওয়েল (Cecil Frank Powell) নামে একজন ইংরেজ পদার্থবিদ গৌণ বিকিরণে আর এক ধরনের কণিকার খোঁজ পেলেন। এই কণিকাটি অ্যান্ডারসনের কণিকার চেয়ে কিছুটা ভারি (ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২৭০ গুণ বেশি ভারি) আর এতে ইউকাওয়ার বর্ণনামতো সব গুণই দেখা গেল।

পাওয়েলের কণিকা সৃষ্টির মূলে যেহেতু রয়েছে 'প্রাইমারী' বা প্রাথমিক নভোরশ্মি, তাই প্রাইমারীর প্রথম অক্ষরের গ্রীক রূপটি নিয়ে এর নাম দেওয়া হল 'পাই-মেসন'। একে কখনো কখনো সংক্ষেপে বলা হয় 'পায়ন'।

অ্যান্ডারসনের কণিকার নাম মেসনের প্রথম অক্ষরের গ্রীক রূপ নিয়ে করা হল **মিউ-মেসন** বা **মিউয়ন**।

মিউয়ন আছে আবার দুরকমের—একটি ঋণাত্মক, অন্যটি ধনাত্মক। ধনাত্মক মিউয়নটি উল্টা-কণিকা।

তেমনি পায়ন আছে, তিন রকমের—একটি ধনাত্মক, একটি ঋণাত্মক, আরেকটি আধানবিহীন। ঋণাত্মক পায়নটি উল্টা-কণিকা। আধানবিহীন পায়নটি একই সাথে কণিকাও আবার উল্টা-কণিকাও।

পায়ন নিঃসন্দেহে ইউকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা কণিকা। পরমাণুকেন্দ্রে বিকর্ষণের শক্তি সত্ত্বেও যে পারমাণবিক শক্তি কণিকাগুলিকে এক সাথে করে রাখে তার প্রকৃতি এর সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়। এজন্যে ইউকাওয়া নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৪৯ সালে আর পাওয়েল পেলেন ১৯৫০ সালে।

আজকাল মৌল কণিকাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয় : **লেপটন, মেসন** আর **বেরিয়ন**। লেপটনদের দলে পড়ে বিভিন্ন হালকা কণিকা—যেমন ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ইত্যাদি। মেসনদের দলে পড়ে বিভিন্ন মাঝারি আকারের কণিকা, যেমন পায়ন। বেরিয়নদের দলে পড়ে সব ভারি কণিকাগুলো—যেমন প্রোটন, নিউট্রন, উল্টা-প্রোটন, উল্টা-নিউট্রন প্রভৃতি।

বাকি সব রহস্য

পদার্থবিজ্ঞানীরা পরমাণুর গড়ন সম্বন্ধে সব রহস্যের যে কিনারা করে ফেলেছেন তা কিন্তু নয়। মনে হয় পুরনো রহস্যের কিনারা করতে করতেই আরো নতুন সব রহস্য এসে হাজির হয়।

দেখা গিয়েছে, পারমাণবিক শক্তি রয়েছে দুরকমের। এক হল **জোরালো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া**, যার শক্তি পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাগুলিকে এক জোট করে রাখে। আরেকটি হল **দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া**, এটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দুর্বল, অনেক মৌল-কণিকা যেভাবে ভেঙে পড়ে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বিজ্ঞানের কতকগুলো নিয়ম যা আগে সব অবস্থায় সত্যি বলে মনে হয়েছিল তা হয়তো এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বেলায় সত্যি, কিন্তু অন্য ধরনের বেলায় সত্যি নয়।

যেমন, এ ধরনের একটি নিয়ম হল **প্রতিসাম্যের নিত্যতার সূত্র**। এই নিয়ম থেকে মনে হয় যেন বিশ্বে বাঁ আর ডাইনের মধ্যে তেমন কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ নেই কোন বস্তু আর তার প্রতিবিম্বের মধ্যে। ১৯৫৬ সালে দুজন চীনা-মার্কিন পদার্থবিদ সুং-দাও লী (Tsung-Dao Lee) আর চেন নিন ইয়াং (Chen Nin Yang) বললেন এই নিয়মটি দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বেলায় খাটে না ; একথা প্রমাণ করা যেতে পারে, এ ধরনের পরীক্ষারও তাঁরা প্রস্তাব দিলেন। এসব পরীক্ষা করে দেখা গেল, লী আর ইয়াং-এর কথাই সত্যি। তাঁরা এর জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৫৭ সালে।

দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি করে কাজ করে এ সম্বন্ধে আরো জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা আজো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

banglainternet.com

এছাড়া রয়েছে মিউরনের সমস্যা। দেখা গেল, পায়নই আসলে ইউ-কাওয়ার কণিকা। তাহলে মিউয়নের কাজ কি ধরনের? পরমাণুতে এর ভূমিকা কি?

কেউ এ পর্যন্ত তার জবাব খুঁজে পায়নি।

তবে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, মিউয়নের এমন কতকগুলো গুণাগুণ আছে যা প্রায় হুবহু ইলেকট্রনের মতো। এদের মধ্যে শুধু বড় রকমের তফাত হল মিউয়ন ইলেকট্রনের চাইতে ২০০ গুণ ভারি। কাজেই মিউয়ন শুধু 'ভারি ইলেকট্রন' তার বেশি আর কিছু নয়। এমন কি মিউয়ন পরমাণুকেন্দ্রের চার-পাশে ইলেকট্রনের জায়গা দখল করে থাকতে পারে—এতে সৃষ্টি হয় **মেসন-জাত পরমাণু**। এটা কখনো কখনো ইলেকট্রনের বদলে পজিট্রনের চারপাশেও ঘুরতে পারে, তাতে যে ক্ষণস্থায়ী জুটির সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় **মিউয়-নিয়াম**।

মিউয়ন ইলেকট্রনের চাইতে ২০০ গুণ ভারি হবার কারণটা কি? এমন ভারি হওয়ায় এদের মধ্যে আর কোন দিক দিয়ে তফাত দেখা যাচ্ছে না কেন? এসব প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায়নি।

ইলেকট্রনদের সাথে যেমন, তেমনি মিউয়ন সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রিনোও সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন ইলেকট্রন-দের সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া নিউট্রিনোরা বস্তুতে ঢুকলে যেসব ব্যাপার ঘটে, মিউয়নের সঙ্গে তৈরি হওয়া নিউট্রিনো বস্তুতে ঢুকলে হুবহু সেসব ব্যাপার ঘটে না।

অর্থাৎ **মিউয়ন-নিউট্রিনো** আর **ইলেকট্রন-নিউট্রিনো** হুবহু এক নয়; তেমনি এক নয় **মিউয়ন-উল্টা-নিউট্রিনো** আর **ইলেকট্রন-উল্টা-নিউট্রিনো**। দুই ধরনের নিউট্রিনোরই ভরও নেই, আধানও নেই, আর তাদের অক্ষের চারপাশে ঘোরার ধরন একই রকম। তাহলে আর তারা দুধরনের হল কি করে? এ-প্রশ্নেরও জবাব এখনো মেলেনি।

১৯৫০ সালের পরে, বিশেষ করে ১৯৬০ সালের পরে, অসংখ্য মেসন এবং বেরিয়ন আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬৫ সালের দিকে একশ'র ওপরে বিভিন্ন ধরনের মৌল কণিকার কথা মানুষের জানা ছিল। এত রকমের কণিকা কেন? এতগুলির কাজ কি? তারও কোন উত্তর জানা নেই।

মেণ্ডেলীয়েভ যেমন একদিন মৌলদেরকে পর্যাবৃত্ত ছকে বিভিন্ন পরি-বারে ভাগ করেছিলেন, বিজ্ঞানীরা মৌল-কণিকাদেরও আজ তেমনি নানা পরিবারে ভাগ করার চেষ্টা করছেন। এ ধরনের একটি তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন মারে গেল্-মান (Murray Gell-Mann) নামে এক মার্কিন পদার্থবিদ ১৯৬১ সালে। গেল্-মানের তত্ত্ব অনুসারে **ওমেগা-মাইনাস** নামে এক বিশেষ ধরনের কণিকার অস্তিত্ব থাকার কথা। তিনি এর গুণাগুণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন আর ১৯৬৪ সালে সত্যি সত্যি এ ধরনের একটি কণিকা আবিষ্কৃত হল। এর গুণাগুণ দেখা গেল গেল্-মানের বর্ণনামতোই।

১৯৬৫ সালের দিকে গেল্-মানের চাইতেও আরো জটিল সব তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে কোন তত্ত্বের সাহায্যে কি সবগুলো মৌল কণিকার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে? আজো কেউ তা জানে না।

অতি-পারমাণবিক কণিকারা সবই কি আলাদা আলাদা? নাকি এগুলো আসলে এদের চেয়েও ছোট আর কোন সরল আর ছোট মৌলকণিকার জোট?

১৯৫০ সালের দিকে রবার্ট হফ্স্ট্যাডার (Robert Hofstadter) নামে একজন মার্কিন পদার্থবিদ অত্যন্ত শক্তিশালী ইলেকট্রন কণিকা দিয়ে পর-মাণুকেন্দ্রকে আঘাত করেন। এর ফলে তিনি যেন প্রোটন আর নিউট্রনের ভেতরের রূপ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, প্রোটন আর নিউট্রন আসলে তৈরি মেসন দিয়ে। (নিউট্রন মোটমাট আধানশূন্য হলেও এতে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দুরকমেরই আধানযুক্ত কণিকা রয়েছে। এই সব আধানের সমা-বেশের ফলেই নিউট্রন অক্ষের চারপাশে ঘুরলে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই জন্যেই উল্টা-নিউট্রনের অস্তিত্বও সম্ভব হয়। ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।)

এর জন্যে ১৯৬১ সালে হফ্স্ট্যাডার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন; কিন্তু এতেও মৌল-কণিকাদের সত্যিকার রূপ সম্বন্ধে সব রহস্যের আজো কিনারা হয়নি।

banglainternet.com

পরমাণু-শক্তি

পুরোপুরি ১ নয়

পরমাণুর গড়ন সম্বন্ধে অনেক রহস্য যেমন আজো রয়েছে অজানা, তেমনি অনেক কিছু আবার জানাও গিয়েছে। যেটুকু জানা গিয়েছে তা এর মধ্যেই মানুষের অনেক উপকারে এসেছে, আবার প্রচুর বিপদও সৃষ্টি করেছে।

এই উপকার আর বিপদ দুয়েরই মূলে অনেকখানি রয়েছে প্রোটন আর নিউট্রনের ভরের সমস্যা। এ বইতে আগাগোড়া আমরা প্রোটন আর নিউট্রনের ভরকে ১ বলে ধরে আসছি। আসলে ভরসংখ্যা পুরোপুরি ১ হয় মাত্র কতকগুলো বিশেষ অবস্থায়।

যেমন, কার্বন ১২-র পরমাণুকেন্দ্রের ভরসংখ্যা ইচ্ছে করে ধরা হয়েছে ঠিক ১২। ভর মাপার জন্যে কার্বন-১২ হল প্রমাণ বা আদর্শ মাপকাঠি। ভরের হিসেব করার জন্যে অন্য সব পরমাণুকেন্দ্র বা মৌলকণিকাকে এর সাথে তুলনা করা হয়। (ঠিক যেমন কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপার জন্যে তাকে

একটা স্কেলের দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করা হয়। দৈর্ঘ্যের মাপের জন্য স্কেল হল প্রমাণ মাপকাঠি।)

কার্বন-১২ পরমাণুতে রয়েছে ৬টি প্রোটন আর ৬টি নিউট্রন, অর্থাৎ মোটমাট ১২টি মৌলকণিকা। কাজেই কার্বন-১২ পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন আর নিউট্রনদের প্রতিটির গড় ভরসংখ্যা ঠিক ১।

অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রে কিন্তু প্রোটন আর নিউট্রনদের ভরসংখ্যা হয় ১-এর চেয়ে অতি সামান্য একটু কম-বেশি। শুধু একটি প্রোটনের ভরসংখ্যা হল ১·০০৭৮। শুধু একটি নিউট্রন এর চেয়ে সামান্য একটু বেশি ভারি ; তার ভরসংখ্যা ১·০০৮৭। একটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন মিলে যখন একটি হাইড্রোজেন-২ (ডয়টেরিয়াম) পরমাণুকেন্দ্র তৈরি হয় তখন কিন্তু তাদের গড় ভরসংখ্যা হিসেবমতো ১·০০৮২৫ হয় না, হয়ে দাঁড়ায় ১·০০৭০৫। আমরা আগেই বলেছি, কার্বন ১২-তে ৬টি প্রোটন আর ৬টি নিউট্রনের গড়পড়তা ভরসংখ্যা হয় ঠিক ১। কিন্তু অক্সিজেন ১৬-তে ৮টি প্রোটন আর ৮টি নিউট্রনের গড় ভরসংখ্যা হয় ০·৯৯৯৭।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরমাণুকেন্দ্রে যত বেশি সংখ্যায় প্রোটন আর নিউট্রন জোট বাঁধে তাদের একেকটির আলাদা ভর তত কমে যেতে থাকে। অক্সিজেনের চেয়ে আরো জটিল পরমাণুতে এই গড় ভরসংখ্যা আরো কমে যায়। যেমন, গন্ধক ৩২-এ পরমাণুকেন্দ্রের গড়পড়তা কণিকার ভরসংখ্যা হল ০·৯৯৯১।

মাঝারি আকারের পরমাণুতেই কণিকাদের গড় ভরসংখ্যা সবচাইতে কম- -যেমন, লোহা বা তামা। লোহা-৫৬ পরমাণুকেন্দ্রে গড়পড়তা কণিকার ভরসংখ্যা হল ০·৯৯৮৮।

এর পরে পরমাণুরা আরো যত বড় আর জটিল হতে থাকে, পরমাণুকেন্দ্রে কণিকাদের গড় ভরসংখ্যাও তেমনি আবার অতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে মৌলদের তালিকার শেষ পর্যন্ত। সবচেয়ে ভারি স্থায়ী আইসোটোপদের পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন আর নিউট্রনদের গড় ভরসংখ্যা আবার ঠিক প্রায় ১-এ এসে দাঁড়ায় ; থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম এসব মৌলের বেলায় ১-এর চেয়ে সামান্য একটু বেশিও হয়।

পর পৃষ্ঠার ভর-শক্তি চিত্রের দিকে তাকালে এ ব্যাপারটা আরো ভাল করে বোঝা যাবে। দেখবে হাইড্রোজেনে বড় রকম ভরসংখ্যা দিয়ে শুরু হয়ে

banglainternet.com

রেখাটি তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নেমে লোহার কাছকাছি সবচেয়ে কমে পৌঁছয়, তারপর আবার ধীরে ধীরে বেড়ে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

ভর-শক্তি চিত্রে অবশ্য ভরের পরিবর্তনটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভর খুব বেশি হলে ১·০০৮৭ পর্যন্ত হতে পারে ; আর খুব কম হলে হতে পারে ০·৯৯৮৮। আমাদের যদি

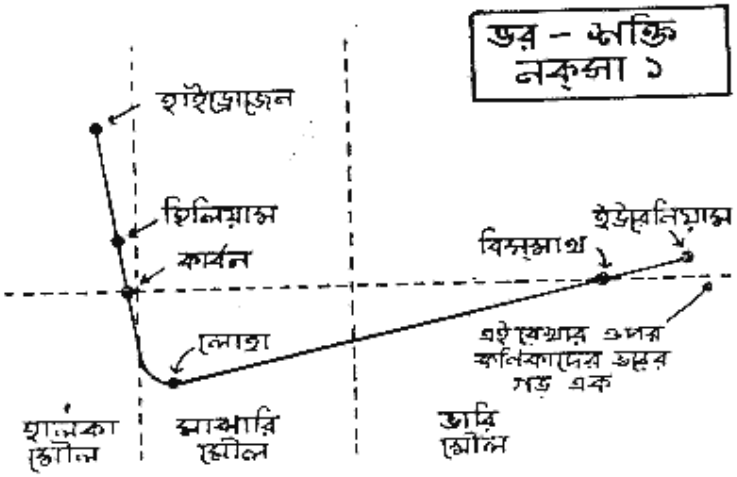

১২০ পাউন্ডের একটা ওজন থাকত, যার ভর এই একই অনুপাতে কমে-বাড়ে তাহলে তাতে যে-কোন দিকে পরিবর্তন হত মোটে এক আউন্স বা আধ ছটাক। হয়তো এই পরিবর্তন আমাদের নজরেই আসত না। কিংবা নজরে এলেও আমরা হয়তো বলতাম, "একশ' বিশ পাউন্ড ওজনে মাত্র এক আউন্স কম-বেশি হলে কি আর এমন এসে যায়?"

পরমাণুর ব্যাপারে কিন্তু এটুকু তফাতে এসে যায় অনেকখানি।

হারিয়ে যাওয়া ভর

মাঝারি আকারের পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন আর নিউট্রনরা জোট বাঁধলে যে খানিকটা ভর হারিয়ে যায় সেটা তাহলে যায় কোথায়?

banglainternet.com

যেটুকু ভর হারাচ্ছে মনে হয় তার মাত্র একটাই গতি হতে পারে—সে হল শক্তিতে পরিণত হওয়া। কোন পরমাণুকেন্দ্র যদি বদলে গিয়ে এমন পরমাণুকেন্দ্রে পরিণত হয় যার কণিকাদের ভর কম তাহলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তির প্রকাশ ঘটতে পারে গামারশ্মি হিসেবে, দ্রুতগামী কণিকা হিসেবে অথবা স্রেফ তাপ হিসেবে।

অতি হালকা বা অতি ভারি কোন পরমাণু যখন মাঝারি গোছের পরমাণুতে পরিণত হয় তখনও সৃষ্টি হয় শক্তি। যেমন, ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়

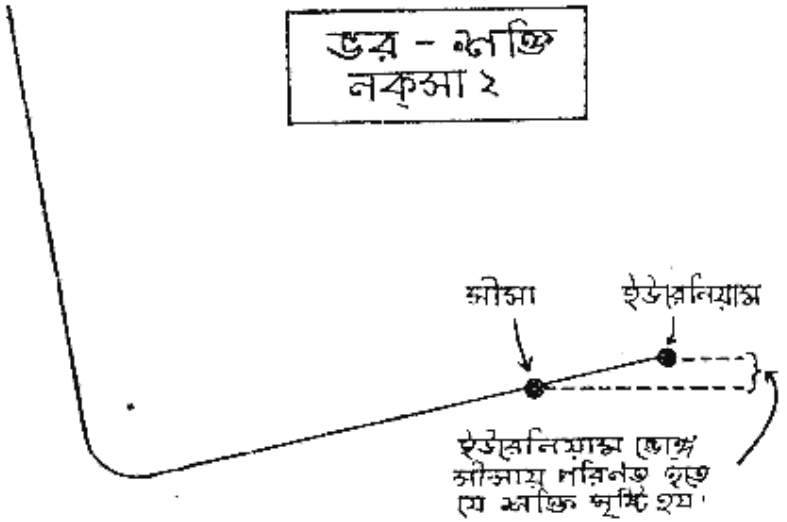

ভাঙনে ক্রমে ক্রমে সীসায় পরিণত হবার সময় শক্তি উৎপাদন করে। ভর-শক্তির দ্বিতীয় চিত্রের দিকে তাকালে এর কারণ বোঝা যাবে। ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাদের তুলনায় সীসার পরমাণুকেন্দ্রের কণিকাদের ভর কম। ইউরেনিয়াম থেকে সীসা হতে হলে এই নকশায় নামতে হয় নিচের দিকে ; আর তাতেই তেজস্ক্রিয়ার যে শক্তি তার সৃষ্টি হয়।

আসলে সব তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনেই আদি কণিকাদের চেয়ে নতুন কণিকাদের ভর হয় সামান্য কম। যেমন ধরা যাক, কার্বন-১৪ থেকে নাইট্রোজেন-১৪ হওয়া। শুরুতে কার্বন ১৪-এর ভরসংখ্যা হল ১৪·০০৩৩, আর যে নাইট্রোজেন-১৪ তৈরি হয় তার ভরসংখ্যা মাত্র ১৪·০০৩১। আবার তেমনি ১·০০৮৭ ভরসংখ্যাঅলা নিউট্রন বদলে হয় ১·০০৭৮ ভরসংখ্যাঅলা প্রোটন।

পরমাণুকেন্দ্রে পরিবর্তনের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তি বা **পরমাণু-শক্তি**। আসলে ঠিক হত একে পরমাণুকেন্দ্রের শক্তি বললে, কিন্তু পরমাণু-শক্তি কথাটাই চালু।

তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষ ভেবেছে, এই পরমাণু-শক্তিকে কোনভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা। আর এই শক্তির পরিমাণ কী বিপুল! এক পাউন্ড করলাকে শুধু পুড়িয়ে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তার চাইতে তাকে এক পাউন্ড লোহায় পরিণত করলে শক্তির উদ্ভব হবে বহু লক্ষ গুণ বেশি।

বহুদিন পর্যন্ত এই শক্তিকে কাজে লাগাবার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক জাতের পরমাণুকে অন্য জাতের পরমাণুতে পরিণত করার উপায় অবশ্য জানা গিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল তার জন্যে পরমাণুদের মৌল কণিকার ছর্‌রা দিয়ে আঘাত করতে হত। আর একটা মৌলকণিকা যদিবা কোনমতে একটা পরমাণুর গায়ে লাগল তো বহু লক্ষ মৌলকণিকার ছর্‌রা মোটেই কোন পরমাণুতে লাগত না। এভাবে পরমাণু বদলানো যেত মাত্র গুটিকয়েক ; কিন্তু এসব মৌলকণিকার ছর্‌রা ছোড়ার জন্যে শক্তি খরচ করতে হত প্রচণ্ড রকম। যেটুকু শক্তি পাওয়া যায় তার চেয়ে যদি বায় করতে হয় বেশি শক্তি তাহলে পরমাণুশক্তির ব্যবহার হয়ে দাঁড়াবে অসম্ভব।

এ যেন এক পয়সার মুদ্রা কেনা প্রত্যেকটি দশ টাকা করে। পয়সার দাম আছে ঠিকই, কিন্তু এভাবে তুমি যত বেশি পয়সা কিনবে ততই গরিব হয়ে যাবে।

পারমাণবিক বিক্রিয়ায় শক্তির অপচয় কমাবার একটা উপায় হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে তাক ফস্‌কানোর সংখ্যা কম হয়। তার জন্যে ছর্‌রা গুলি ছোড়ার নতুন ব্যবস্থা করার দরকার হল।

দরকারি নিউট্রন

মৌলকণিকা দিয়ে গুলি করার সময় তাক ফস্‌কানোর একটা বড় কারণ হল পরমাণুকেন্দ্র আর মৌলকণিকার মধ্যেকার বিকর্ষণ। এর কথা আমরা আগেই বলেছি। কণিকাদের গতি অতি তীব্র করা হলেও তাদের খুব অল্প অংশই বিকর্ষণ কাটিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে লাগতে পারে, বেশির ভাগই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

এবার মনে কর, আমরা এমন এক কণিকা নিলাম যাকে পরমাণুর কেন্দ্র অথবা বাইরের খোলস কেউই বিকর্ষণ করবে না। এ রকম কণিকা হল নিউট্রন, যার কোন আধান নেই।

নিউট্রন যখন পরমাণুর দিকে ছোড়া হয় তখন (তাক ঠিক হলে) সেটা ইলেকট্রনদের খোলস ফুঁড়ে সোজা পরমাণুকেন্দ্রে গিয়ে ঢোকে। ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোন আধানই একে বিকর্ষণ করে না। এমন কি নিউট্রনকে খুব জোরে ছোড়ারও দরকার করে না। যদি তাক ফসকে কয়েকটা পরমাণুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে এর গতি কমেও যায় (যেমন একটা লোক দৌড়ে ভিড়ে ঢুকে পড়লে লোকের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তার গতি কমে যাবে) তাহলেও ঠিকমতো একটা পরমাণুর সাথে ঠোকর খেলে তাতে ঢুকে পড়বে। এ ধরনের ধীরগতি নিউট্রনদের বলা হয় **তাপীয় নিউট্রন**।

আবার যদি আমরা আগের সেই ফুটবল খেলার উপমায় ফিরে যাই তাহলে নিউট্রনকে মনে করা যেতে পারে যেন এক অদৃশ্য খেলোয়াড় এক অদৃশ্য বল নিয়ে ছুটছে। সাধারণ খেলোয়াড়রা বল নিয়ে ছুটতে গেলেই বিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে বাধা দেবে। কিন্তু এই অদৃশ্য খেলোয়াড়কে কেউ দেখতে পায় না, তাই তাকে কেউ বাধা দেয় না। এমন কি এই অদৃশ্য খেলোয়াড় তার অদৃশ্য বল নিয়ে হেঁটে গিয়েও গোল দিয়ে আসতে পারে অনায়াসে।

এমন মতও প্রচার করা হয়েছে যে, এমনি নিউট্রন বন্দী করে করেই আদিতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। জর্জ গ্যামভ (George Gamow) প্রমুখ কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, শুরুতে বিশ্ব ছিল এক বিশাল নিউট্রন-পুঞ্জের বিস্ফোরণ। এই নিউট্রনদের কিছুটা ভেঙে পড়ল প্রোটন আর ইলেকট্রনে, তারপর অতিরিক্ত নিউট্রন পাকড়াও করে গড়ে তুলল আরো জটিল সব পরমাণু। গ্যামভের মতে আজ আমরা যেসব মৌলের কথা জানি, সেগুলো

banglainternet.com

সবই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে সেই আদি বিস্ফোরণের আধ ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যেই।

নিউট্রনরা আবার কোন কোন পরমাণুকেন্দ্রে ঢুকতে পারে অতি সহজে ; সেটা নির্ভর করে সেই পরমাণুর কেন্দ্রে কণিকাদের সাজানোর ওপরে। যে পরমাণুকেন্দ্রে নিউট্রন সহজে ঢুকতে পারে, বলা হয় তার **প্রস্থচ্ছেদ** বড়। বিজ্ঞানীরা আজকাল বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক ছর্‌রা, বিশেষ করে নিউট্রনদের জন্যে, বেশির ভাগ পরমাণুকেন্দ্রেরই প্রস্থচ্ছেদ হিসেব করে বের করেছেন।

কিন্তু নিউট্রনদের ছর্‌রা পাওয়া যায় কি করে? ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম আর তাদের ভাঙন থেকে যেসব বস্তু হয় সেসব থেকে আল্‌ফা কণিকা আর বেটাকণিকা পাওয়া শক্ত কিছু নয়। সাধারণ হাইড্রোজেনকে আয়নিত করে তারপর পরমাণুকেন্দ্রকে ত্বরণযুক্ত করলেই ছুটন্ত প্রোটন পাওয়া যায়। কিন্তু এত সহজে নিউট্রন পাবার কোন উপায় নেই।

নিউট্রনের উৎস সৃষ্টির জন্যে পারমাণবিক বিক্রিয়াকে কাজে লাগানো হল। জোলিও-কুরী দম্পতির কথা আগেই বলেছি—যাঁরা অ্যালুমিনিয়াম ২৭-কে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে আঘাত করে তিন জাতের বিকিরণ পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে এক জাত হল ছুটন্ত নিউট্রন-কণিকা। এমনি আরো কতকগুলো পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে এ ধরনের নিউট্রনপ্রবাহ পাওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন পারমাণবিক বিক্রিয়া থেকে বেরনো নিউট্রন-প্রবাহের হদিস পাওয়া রীতিমতো শক্ত। আধানযুক্ত কণিকার মতো নিউট্রনরা হাওয়ার পরমাণুদের আয়নিত করে না। আয়ন না থাকায় মৌলকণিকার হদিস করার সাধারণ সব যন্ত্রপাতিতে কাজ হয় না। এজন্যে আবার কল্পিত নিউট্রন-রশ্মির পথে বিশেষ এক ধরনের বস্তু রাখতে হয়। এসব বস্তুর গায়ে ছুটন্ত নিউট্রন পড়লে তাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে আধানযুক্ত কণিকা বেরোয়। এই কণিকারা আয়ন সৃষ্টি করলে তাদের হদিস পাওয়া যায়।

এজন্যে যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সে হল **বোরন-১০**। বোরন ১০-এর ওপর নিউট্রন এসে পড়লে তা থেকে আল্‌ফা কণিকা বেরোতে থাকে। এতেই বোঝা যায় নিউট্রনের অস্তিত্ব।

banglainternet.com

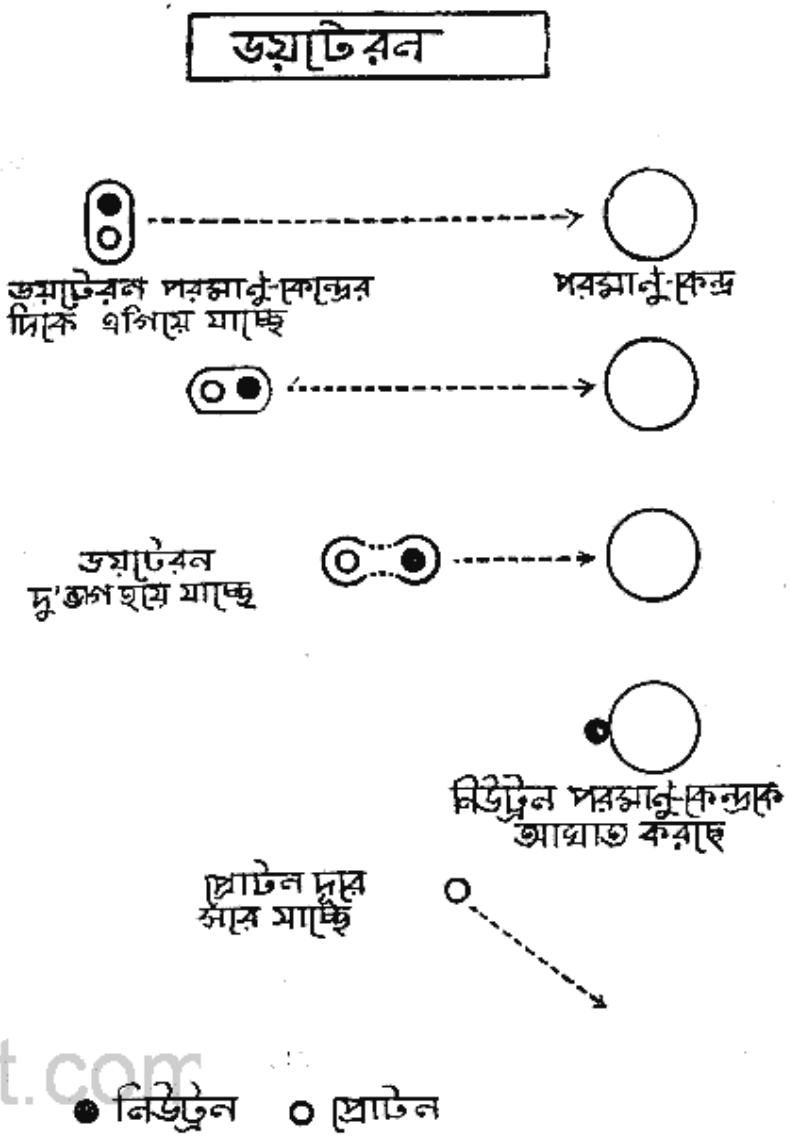

আরেক অসুবিধে হল, নিউট্রনকে ত্বরণযুক্ত করা যায় না। নিউট্রনে আধান নেই বলে তার ওপর উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভবের কোন প্রভাব হয় না। প্রথমটায় বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, নিউট্রনপ্রবাহের গতি যাই হোক তা দিয়ে কাজ চালাতে হবে।

এ সমস্যার একটা সমাধান হল হাইড্রোজেন-২ বা ডয়টেরিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্র ব্যবহার করা। এতে জোট বেঁধে আছে একটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন। ধনাত্মক এক একক আধান থাকায় একে প্রোটনের মতো ত্বরণযুক্তও করা যায়। হাইড্রোজেন-২ পরমাণুকেন্দ্রকে বলা হয় **ডয়টেরন** ; কদাচিৎ ডয়-টনও বলা হয়।

এবার মনে কর, একটি ডয়টেরন এগিয়ে যাচ্ছে পরমাণুকেন্দ্রের দিকে। এতে কি ঘটতে পারে তা মার্কিন পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহাইমার (Robert Oppenheimer) হিসেব করে বের করেছিলেন ১৯৩৫ সালে। তিনি বল-লেন, ডয়টেরনের প্রোটনকে বিকর্ষণ করবে পরমাণুকেন্দ্র, কাজেই সেটা পিছিয়ে পড়বে। ডয়টেরনের নিউট্রনকে পরমাণুকেন্দ্র বিকর্ষণ করবে না, কাজেই সেটা এগিয়ে যেতেই থাকবে। শেষটায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টানাটানিতে ডয়টেরনের প্রোটন আর নিউট্রন ভাগ হয়ে যাবে দুঅংশে। প্রোটন তেরছাভাবে ছিটকে যাবে এক পাশে, আর নিউট্রন হয়তো গিয়ে ধাক্কা খাবে পরমাণু-কেন্দ্রের গায়ে। গোড়ায় ডয়টেরনে যতটা শক্তি ছিল এখন নিউট্রনে আছে তার মাত্র অর্ধেক, কিন্তু তবু এ শক্তিও হয়তো সাধারণ নিউট্রনের শক্তির চাইতে অনেক বেশি। দেখা গেল, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির জন্যে ডয়টেরনই হল সবচাইতে কার্যকর কণিকা।

নিউট্রন বিক্রিয়া

নিউট্রনের ছররাগুলি ব্যবহার শুরু হবার পর ক্রমে ক্রমে এটাই হয়ে দাঁড়াল সবচাইতে উল্লেখযোগ্য 'পরমাণু ভাঙার' কায়দা।

পরমাণুকেন্দ্র নিউট্রন শুষে নিলে তাতে সে-পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যায় রদবদল হয় না। কাজেই পরমাণুটা আগে যে মৌল ছিল ঠিক তাই থাকে। তবে এর ভরসংখ্যা বেড়ে যায় ১ একক।

হাইড্রোজেন ১-এর পরমাণুকেন্দ্র একটি নিউট্রন শুষে নিলে সেটা হয়ে যায় হাইড্রোজেন-২। একটি স্থায়ী আইসোটোপ আরেক স্থায়ী আইসোটোপে

banglainternet.com

পরিণত হওয়ায় এর পর আর কিছু ঘটে না। শুধু একটি নিউট্রন শুষে নেওয়া, আর কিছু নয়।

তবে কখনো কখনো নিউট্রন শুষে নেবার ফলে স্থায়ী আইসোটোপ পরিণত হয় অস্থায়ী আইসোটোপে। যেমন, ইনডিয়াম-১১৫ (স্থায়ী) হয়ে যায় ইনডিয়াম-১১৬ (অস্থায়ী)। এই নতুন আইসোটোপ তৈরি হবার সময় ক্রমে ক্রমে এক নতুন বিকিরণের সৃষ্টি হয় ; বেটা কণিকা ছিটকে বেরোয় আর সৃষ্টি হয় টিন-১১৬ (স্থায়ী)।

কখনো কখনো পরমাণুকেন্দ্র নিউট্রন শুষে নেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি কণিকা ছিটকে বেরোয়। হয়তো তোমাদের মনে পড়বে, আগের এক অধ্যায়ে বলেছিলাম, নাইট্রোজেন-১৪ যখন নিউট্রন শুষে নেয় তখন সাথে সাথে তা একটি প্রোটন বাইরে ছুড়ে দেয়। এর ফলে যে পরমাণুটি দাঁড়ায় (একটি বাড়তি নিউট্রন আর একটি ঘাটতি প্রোটনঅলা) সে হল কার্বন-১৪। এমনও পারমাণবিক বিক্রিয়া রয়েছে যাতে নিউট্রন শুষে নেবার পর সাথে সাথে ইলেকট্রন বা আলফা কণিকা ছিটকে বেরোয়।

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধরনের নিউট্রন বিক্রিয়া হল যাতে পরমাণু-কেন্দ্র একটি নিউট্রন শুষে নেয় আর তার ফলে আবার সাথে সাথেই একটি নিউট্রন ছুড়ে দেয়। এই পরমাণুকেন্দ্রে মোটেই কোন পরিবর্তন হয় না। এক হিসেবে বলতে গেলে এটা এক পা এগিয়েছে আবার এক পা পিছিয়েছে, কাজেই রয়ে গিয়েছে সেই নিজের জায়গাতেই।

হয়তো ভাবছ, এই এক-পা-এগোনো আবার এক-পা-পেছনোর ব্যাপারটা এমন উল্লেখযোগ্য হল কি করে। আসলে ঢুকে-পড়া নিউট্রনটি যদি বেশি জোরালো হয় তাহলে কখনো কখনো ছিটকে বেরোয় দুটি (বা তারও বেশি) নিউট্রন। এবার কিন্তু পরমাণুকেন্দ্র এক-পা এগিয়ে পিছিয়ে পড়ছে দুপা (বা তারও বেশি)।

এ রকম পারমাণবিক বিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কার্বন ১২-কে (সব কার্বন পরমাণুর শতকরা ৯৯ ভাগ হল এই স্থায়ী আইসোটোপটি) নিউট্রন-কণিকা দিয়ে আঘাত করলে। পরমাণুকেন্দ্রে একটি নিউট্রন ঢুকে পড়ে ; আর এই নিউট্রন যদি হয় যথেষ্ট জোরালো তাহলে ছিটকে বেরোয় দুটি নিউট্রন। শেষমেষ দাঁড়ায় এই যে, কার্বন পরমাণুতে আগের চাইতে একটি

নিউট্রন কমে যায়। এটা এখন হয়ে দাঁড়ায় কার্বন-১১ আর অস্থায়ী বলে ছুড়ে দিতে থাকে পজিট্রন কণিকা। (কার্বন ১১-এর অর্ধজীবনকাল বিশ মিনিটের মতো।)

লক্ষ্য করলে দেখবে, এই প্রথমবারের মতো লাভের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মনে কর, কোন জাতের পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে যথেষ্ট জোরে ঘা মারলে তা থেকে পাওয়া যায় দুটি নিউট্রন। এবার এই দুটি নিউট্রনের প্রত্যেকটি যদি একটি করে পরমাণুকেন্দ্রকে যথেষ্ট জোরে ঘা মারে তাহলে প্রত্যেকটি থেকে বেরিয়ে আসবে দুটি নিউট্রন। তাহলে সবসুদ্ধ হল চারটি নিউট্রন। এই চারটি নিউট্রন আবার চারটি পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করে সৃষ্টি করবে আটটি। আটটি থেকে হবে ষোলটি, তারপর বত্রিশটি, তা থেকে চৌষট্টিটি, ইত্যাদি—সবই মাত্র একটি নিউট্রন থেকে শুরু করে!

মনে কর, একটি পরমাণুকেন্দ্র ভাঙতে সময় লাগে এক সেকেণ্ড। তাহলে এক সেকেণ্ড পরে তৈরি হবে দুটি নিউট্রন। দুসেকেণ্ড পরে তৈরি হবে চারটি নিউট্রন। তিন সেকেণ্ড পরে হবে আটটি। চার সেকেণ্ড পরে হবে ষোলটি। এমনি করে তিরিশ সেকেণ্ড পরে হবে একশ' কোটি নিউট্রন! (যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে নিজে নিজে হিসেব করে দেখ। কাগজে প্রত্যেক সেকেণ্ডে নিউট্রনদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে থাক তিরিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত, তারপর দেখ শেষ ফল কি দাঁড়ায়।)

আসলে পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করলে সেটা ভেঙে পড়ে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে। কাজেই নিউট্রনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। মাত্র একটা নিউট্রন থেকে শুরু করে বহু লক্ষ কোটি কোটি পরমাণু ভেঙে পড়ে এক সেকেণ্ডের অতি সামান্য ভগ্নাংশের মধ্যে।

এ ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া, যার স্তরগুলো শেকলের বিভিন্ন খণ্ডের মতো পর পর আসতে থাকে, তার নাম দেওয়া হয়েছে **শৃঙ্খল-বিক্রিয়া**।

পরমাণুকেন্দ্রের প্রতিটি ভাঙনে যদি অতি সামান্য মাত্র শক্তিরও উদ্ভব হয়, তাহলেও নিমেষের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যায় পরমাণু ভেঙে পড়বে যে, মোটমাট শক্তির উদ্ভব হবে অতি প্রচণ্ড। এসবেরই শুরু একটি নিউট্রন-কণিকা দিয়ে। আর এ থেকেই হল পরমাণু-শক্তির জন্ম!

১৯৩৪ সালেই লিও জিলার্ড (Leo Szilard) নামে এক হাঙ্গেরীয় পদার্থবিদ বিলেতে গবেষণা করতে করতে এ ধরনের শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার সম্ভা-

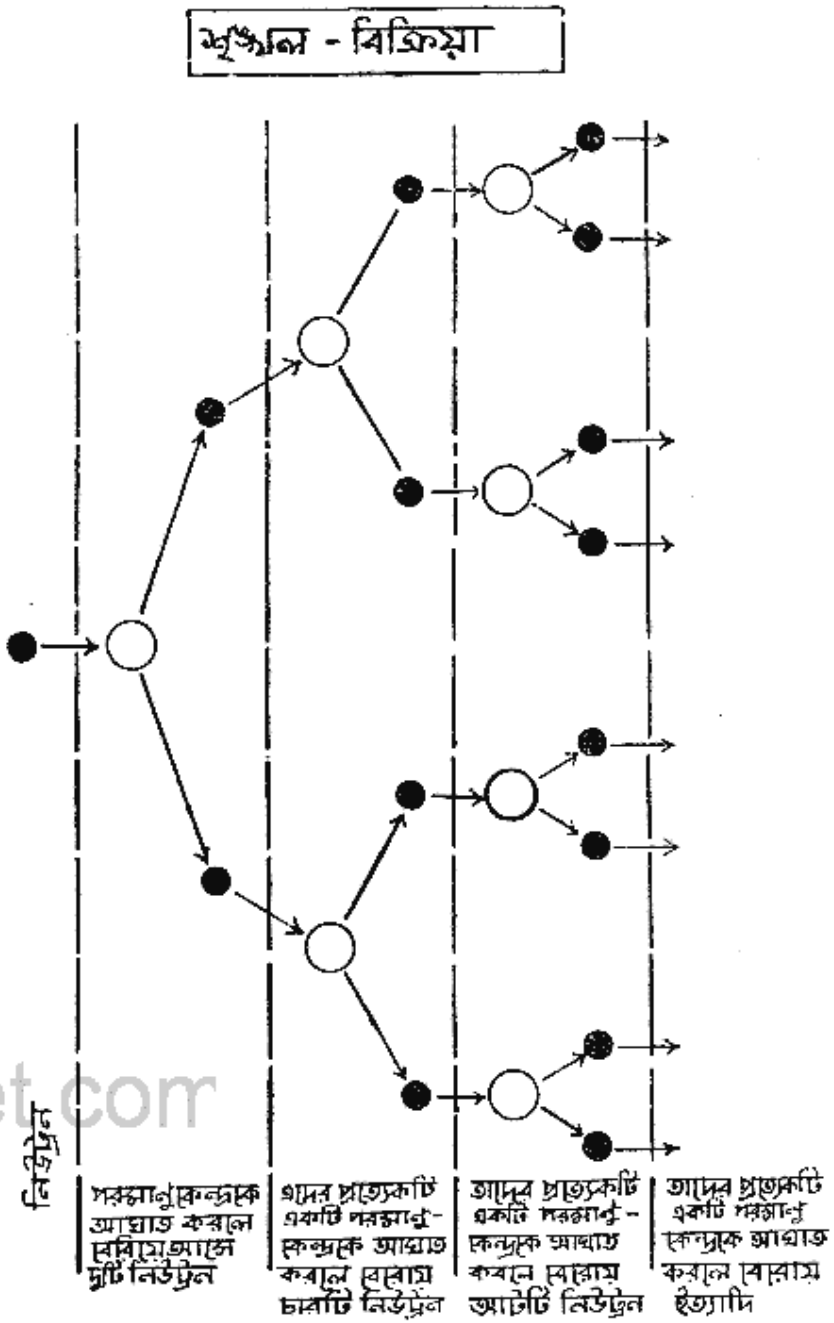

banglainternet.com

বানার কথা বিবেচনা করছিলেন। তিনি এমন কি এর জন্যে একটা পেটেন্টেরও দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনি বিরাট বিপদও দেখেছিলেন, তাই তাঁর চিন্তার কথা প্রকাশ করেননি।

এই বিক্রিয়ার একটা সমস্যা হল এমনভাবে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে যাতে শুষে নেওয়া নিউট্রনের চেয়ে বেশি নিউট্রন তৈরি হবে আর এগুলো এমন জোরালো হবে যেন বিক্রিয়া আপনাআপনি চলতে পারে। সচরাচর এ ধরনের বিক্রিয়া শুরু করার জন্যে রীতিমতো জোরালো নিউট্রন দরকার আর পরমাণুকেন্দ্র যে পরিমাণ তেজী নিউট্রন শুষে নেয়, ছুড়ে দেয় তারচেয়ে কম তেজী নিউট্রন। কার্বন ১২-তে যে নিউট্রনের বিক্রিয়া তাতে কাজ হবে না ; কেননা এতে যে নিউট্রন বেরোয় সেগুলো যথেষ্ট জোরালো নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শৃংখল-বিক্রিয়া তত্ত্বগতভাবে সম্ভব মনে হলেও বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি শুরু হবার পরেও যেন ব্যাপারটা নিভে যায়—দমকা হাওয়ায় দিয়াশলাই জ্বালাবার মতো।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালে এমন এক নতুন ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কৃত হল যা প্রায় রাতারাতি বদলে দিল মানবসভ্যতার ইতিহাসকে।

পরমাণু-বিভাজন!

লোকে কথায় কথায় 'পরমাণু-ভাঙা' নিয়ে আলোচনা করলেও আদতে ১৯৩৯ সালের আগে কখনো মানুষ পরমাণু 'ভাঙতে' পেরেছে বলে জানা যায়নি। এ পর্যন্ত মানুষ পরমাণুর বুক থেকে একটি, দুটি বা বড়জোর চারটি কণিকা খসিয়ে ছিটকে দিয়েছে। একে নেহাৎ পরমাণুর বুক থেকে খুবলে তোলা বলা যায়, পরমাণু 'ভাঙা' কিছুতেই নয়।

এ অবস্থাটা বদলে দিলেন এনরিকো ফার্মি (যিনি নিউট্রিনোর নামকরণ করেন আর এর চালচলন বের করেন)। তিনিই প্রথম পদার্থবিদ, যিনি নিউট্রনের ছর্রা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন নিউট্রনের গতি কম হলে তাকে পরমাণুকেন্দ্র আরো বেশি সহজে শুষে নিতে পারে, আর তাতে পারমাণবিক বিক্রিয়াও ঘটে তাড়াতাড়ি। (নিউট্রন নিয়ে গবেষণা করার জন্যে ১৯৩৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।)

বিশেষ করে তিনি নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করার চেষ্টা করছিলেন। দেখা গেল, কোন মৌলকে নিউট্রন-কণিকা দিয়ে আঘাত

banglainternet.com

করলে সেই মৌলের ওপর দিককার আইসোটোপ সৃষ্টি হয় ; এই আইসোটোপ অনেক সময় একটি বেটা কণিকা ছুড়ে দিয়ে এক একক ওপরকার পারমাণবিক সংখ্যার মৌলে পরিণত হয়। ইউরেনিয়ামে (পারমাণবিক সংখ্যা ৯২) আঘাত করলে সেটা হবে ৯৩ নম্বর মৌল ; তাই ফার্মি ভাবলেন, এজন্যে চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না।

প্রথমটায় তিনি ভাবলেন, তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। (সত্যি তিনি সফল হয়েছিলেনও ; কিন্তু ১৯৪০ সালে ম্যাকমিলান আর অ্যাবেল্‌সন ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে তার মধ্যে ৯৩ নম্বর মৌল—নেপচুনিয়াম—আবিষ্কার করার আগে কেউ এই নতুন মৌলের হদিস পাননি।) দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরেনিয়ামে এমন আরো সব পরিবর্তন ঘটল যে, সত্যি সত্যি যে কি হয়েছে ফার্মি তা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন ; কিন্তু তাঁরাও ঠিক উত্তরটি পেলেন না। বিশেষ করে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন অটো হান (Otto Hahn) নামে এক জার্মান রসায়নবিদ আর তাঁর অস্ট্রীয় সহকারী লিজ মাইট্‌নার (Lise Meitner)। ১৯৩৮ সালে হানের মনে হল তিনি সমস্যাটার সমাধান করেছেন। ইউনিয়াম পরমাণু নিউট্রন কণা শুষে নিয়ে কখনো কখনো ভেঙে যায় দুটুকরো হয়ে। ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে, হান প্রথম প্রথম একথা প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। তিনি ভাবলেন, হয়তো তাঁর এই বোকার মতো কথা শুনে লোকে হাসবে।

ইতিমধ্যে হিটলারের জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। লিজ মাইট্‌নার ছিলেন ইহুদী ; কাজেই প্রাণের দায়ে তাঁকে অস্ট্রিয়া ছেড়ে আশ্রয় নিতে হল সুইডেনে। সুইডেনে থাকার সময়ে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি হানের আবিষ্কার প্রকাশ করলেন।

ঠিক এই সময়ে দিনেমার বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর (Niels Bohr) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছিলেন এক সম্মেলনে যোগ দিতে। মাইট্‌নার এই আবিষ্কারের কথা বললেন তাঁকে। বোর্ এ খবর সঙ্গে করে নিয়ে সম্মেলনে মার্কিন বিজ্ঞানীদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন।

তত্ত্বটার কথা জানাজানি হবার সাথে সাথে মার্কিন বিজ্ঞানীরা ছুটলেন তাঁদের গবেষণাগারে। পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন লিজ মাইট্‌নার যা বলেছেন তা সত্যি। এর ফলে ১৯৪৪ সালে হান নোবেল পুরস্কার পেলেন।

কাজেই এবার এক নতুন ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কৃত হল, যাতে পরমাণুকেন্দ্রকে খালি ঠুকরে নেওয়া হয় না, সত্যি সত্যি সেটা ভেঙে যায়। এ ধরনের বিক্রিয়ার নাম দেওয়া হল **পরমাণু-বিভাজন**।

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বিশেষত্ব

দেখা গেল, ইউরেনিয়াম ছাড়া আরো অনেক ভারি পরমাণুকেন্দ্রকে মৌল-কণিকা (সাধারণত নিউট্রন) দিয়ে ঠিকমতো আঘাত করলে তারা ভেঙে যায় বা পরমাণু-বিভাজন ঘটে। অবশ্য তাদের অধিকাংশের বেলাতেই নিউট্রন যথেষ্ট বেগসম্পন্ন হওয়া দরকার। অধিকাংশ ইউরেনিয়াম পরমাণুর বেলাতেও তাই। ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু, অর্থাৎ ইউরেনিয়াম মৌলের প্রতি হাজারে ৯৯৩টি পরমাণুর বেলাতেই ভাঙার জন্যে বেগবান নিউট্রনের দরকার।

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর ব্যাপার আলাদা। এদের বিশেষত্ব প্রথম নির্দেশ করেছিলেন বোর। ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে ধীরগতি নিউট্রন—যারা হয়তো কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঘা মারলেও সেটা ভেঙে যায়।

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে সাধারণ কোন জিনিসের সঙ্গে এদের তুলনা করা যাক। ইউরেনিয়াম-২৩৮ (এবং অধিকাংশ অন্য ভারি পরমাণুকেন্দ্র) যেন এক খণ্ড শক্ত কাঠ, যাতে তুমি আগুন লাগাতে চাচ্ছ। সাধারণ দিয়াশলাই দিয়ে এটা সম্ভব হবে না ; কাঠটা পোড়াতে হলে বেশ বড়সড় আগুনের কুণ্ড দরকার। সে-জায়গায় ইউরেনিয়াম-২৩৫ যেন কাগজের টুকরোর মতো ; দিয়াশলাই-এর কাঠিতে একটু টোকা দিলেই তাতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে।

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণু-বিভাজনের জন্যে এমন কি মানুষের সাহায্যেরও কোন দরকার নেই। আমাদের চারপাশে সব সময়ই কিছু-না-কিছু নিউট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন নভোরশ্মি এসে হাওয়ার এবং অন্যান্য জিনিসের পরমাণুতে আঘাত করে তখন এসব তৈরি হয়। এ রকম নিউট্রন যে অনেক রয়েছে তা নয়, তবে কিছু রয়েছে। তাদের একটি হয়তো কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত করে তাকে ভেঙে ফেলল। কিংবা হয়তো কদাচিৎ কখনো একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু কোন রকম আঘাত ছাড়াই ভেঙে যায়। একে বলা হয় **স্বতঃ-বিভাজন**।

ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর সাধারণ আলফা কণিকা সৃষ্টির যেমন অর্ধ-জীবনকাল আছে, তেমনি তার স্বতঃ-বিভাজনেরও রয়েছে অর্ধজীবনকাল।

তবে স্বতঃ-বিভাজনের অর্ধজীবনকাল অতি লম্বা—বহু লক্ষ-কোটি বছর। একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু যদি ভেঙে যায় স্বতস্ফূর্ত পরমাণু-বিভাজনে তাহলে সে-জায়গায় দশ লক্ষ বা তারও বেশি পরমাণুকেন্দ্র ভাঙে স্বাভাবিকভাবে আলফা কণিকা ছুড়ে দিয়ে।

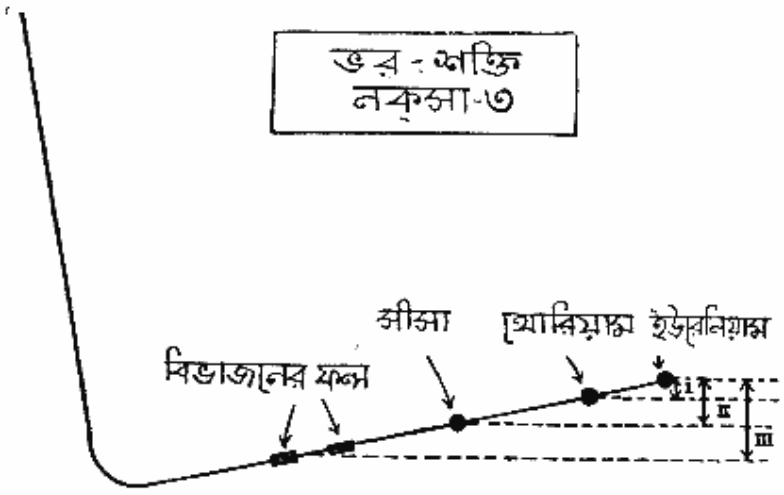

I আলফা কণিকা নিষ্ক্রমণে যে শক্তি সৃষ্টি হয়
II ইউরেনিয়াম ভেঙে সীসায় পরিণত হতে যে শক্তি সৃষ্টি হয়
III ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনে যে শক্তি সৃষ্টি হয়

নতুন ইউরেনিয়াম-পরবর্তী মৌলগুলিতে স্বতঃ-বিভাজন ঘটে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি। প্লুটোনিয়াম ২৩৬-এর পরমাণু-বিভাজনের অর্ধজীবনকাল ৩৫০ কোটি বছর ; কুরিয়াম ২৪০-এর অর্ধজীবনকাল ২০,০০০ বছর ; ক্যালিফোর্নিয়াম ২৫২-এর ১০০ বছর ; আর ফার্মিয়াম ২৫৪-এর মাত্র সাত মাস। খুব বেশি ভারি যেসব পরমাণু সেগুলো অন্য সব উপায়ের চাইতে স্বতঃ-বিভাজনেই ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি।

banglainternet.com

বিজ্ঞানীরা আগে থেকে এর জন্যে খোঁজ রাখলে হয়তো বহু বছর আগেই স্বতঃ-বিভাজনের হদিস করতে পারতেন। আল্‌ফা কণিকা ছিটকে বেরোতে যে পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয় তার চেয়ে বহু গুণে বেশি শক্তি সৃষ্টি হয় পরমাণু-বিভাজনে। কেন তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুতে যখন বিভাজন ঘটে তখন তা ঠিক সমান দুভাগে ভাঙে না। আবার সব সময় এক রকমভাবেও ভাঙে না। নানা ধরনের জিনিস এসব ভাঙন থেকে পাওয়া যায়। এমন কি, এই পরমাণু-বিভাজনের পর ৩৪টি বিভিন্ন ধরনের মৌলের হদিস পাওয়া গিয়েছে। তবে এসব অধিকাংশ পরমাণুকেন্দ্রেরই ভরসংখ্যা ৮৫ থেকে ১০৪ আর ১৩০ থেকে ১৪৯-এর মধ্যে।

এবার তাকাও ভর-শক্তির তৃতীয় চিত্রের দিকে (১৫৯ পৃষ্ঠা)। ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু যখন একটি আল্‌ফা কণিকা খোয়ায় তখন তার ভরসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৩১। কিন্তু যখন এটা ভেঙে ভেঙে হয় সীসা, তখন এর ভরসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২০৭। কিন্তু যদি পরমাণু-বিভাজন ঘটে তখন ভরসংখ্যা কমে হবে অন্তত ১৪৯, এমন কি ৮৫ পর্যন্তও হতে পারে। তাহলেই বুঝতে পারছ, তেজস্ক্রিয়ার তুলনায় পরমাণু-বিভাজনে কত বেশি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়। এমনি বেশি বেশি শক্তি সৃষ্টি হয় প্রতিটি পরমাণুকেন্দ্রের জন্যেই।

১৯৩৯ সালের আগে পর্যন্ত মানুষের যত রকম শক্তির উৎসের কথা জানা ছিল তারচেয়ে এই পরমাণু-শক্তির উৎস অনেক বিরাট। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই শক্তিকে কাজে লাগানো হল আশ্চর্য রকমভাবে।

পরমাণু থেকে বিপদ

শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার সাফল্য

প্রতিটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে যাবার সময় এত শক্তি সৃষ্টি হয় যা, যে-নিউট্রন বিভাজন ঘটায় তার শক্তির চেয়ে প্রায় ৭,০০০ গুণ বেশি। শক্তি সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে এটা বেশ লাভজনকই মনে হয়; কিন্তু এ কেবল শুরু।

তোমাদের হয়তো মনে আছে, (২৭ পৃষ্ঠা), কম পারমাণবিক সংখ্যার পরমাণুকেন্দ্র স্থায়ী হয় সমান সংখ্যায় প্রোটন আর নিউট্রন থাকলে। পরমাণুকেন্দ্র যত ভারি হবে তত তাতে বাড়তি নিউট্রন দরকার হয়।

ভারি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে যখন দুটো মাঝারি আকারের টুকরো হয়ে যায়, তখন সে-দুটো টুকরোর অত সব বাড়তি নিউট্রনের দরকার হয় না। কাজেই ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে গেলে শুধু যে দুটো ছোটখাট পরমাণুকেন্দ্র তৈরি হয় তাই নয়, দু-তিনটে বাড়তি নিউট্রনও পাওয়া যায়।

banglainternet.com

আগের অধ্যায়ে যে ধরনের শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার জন্যে দরকারি জিনিস এবার পাওয়া গিয়েছে। নিউট্রন কণিকা আঘাত করলে একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু ভেঙে দু-তিনটি নতুন নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই দু-তিনটি নিউট্রন যদি আবার অন্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে ভেঙে দিতে পারে তাহলে অন্তত চারটি থেকে নটি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এমনি করে নিমেষের মধ্যে সমস্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুই ভেঙে যেতে থাকে।

একটি নিউট্রন খরচ করে একটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু ভাঙতে পারলে শুধু যে ব্যয়ের চেয়ে ৭,০০০ গুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায় তাই নয়, যখন সবগুলো পরমাণু ভেঙে পড়তে থাকে তখন পাওয়া যায় কোটি কোটি গুণ বেশি শক্তি।

কিন্তু এমনি শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সত্যি কি সফল হবে? যেসব নিউট্রন তৈরি হবে তারা কি একে চালু রাখার জন্যে যথেষ্ট জোরালো হবে? তোমাদের হয়তো মনে পড়বে, নিউট্রনঘটিত অন্যান্য পারমাণবিক বিক্রিয়ায় এটা একটা সমস্যা।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু-বিভাজনের একটা মজা হল এটা চালু রাখার জন্যে মোটেই তেমন জোরালো নিউট্রনের দরকার নেই। অল্প তেজের ধীর-গতি নিউট্রন দিয়েই কাজ চলবে। এমন কি, এর জন্যে দ্রুতগতি নিউট্রনের চাইতে ধীরগতি নিউট্রনেই সুবিধে বেশি।

পরমাণু-বিভাজন আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারলেন। তাঁরা দেখলেন, এ থেকে বিপুল, অবিশ্বাস্য পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

অবশ্য কতকগুলো ব্যবহারিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে কিনা সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ ছিল। সাধারণভাবে হয়তো এসব সমস্যার সমাধান করতে বহুদিন সময় লাগত। এর জন্যে বহু পরিশ্রম আর টাকা-কড়ির দরকার; তারপরেও কেউ আগে থেকে বলতে পারত না বিজ্ঞানীদের চেষ্টা সফল হবে কিনা। তত্ত্বগতভাবে শৃঙ্খল-বিক্রিয়ায় পরমাণু-বিভাজন ঘটানো যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ব্যবহারিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠা না যায়! কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়তো এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রচুর টাকা-কড়ি খরচ করতে রাজি হতেন না।

কিন্তু তার বদলে কোন দেশের সরকার যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন—আর সে সরকার যদি হয় দুনিয়ার সবচাইতে অর্থশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের?

লিও জিলার্ড ভাবছিলেন এসব কথা। তিনি নাৎসী জার্মানীর নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ইউরোপ থেকে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি বুঝলেন, শীগগিরই শুরু হবে মহাযুদ্ধ আর মানুষের সামনে আসছে বিষম বিপদ। তিনি আগে থেকেই শৃঙ্খল-বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন (১৫৪ পৃষ্ঠা); তাই বুঝলেন, ইউরেনিয়ামের পরমাণু-বিভাজন সফল হতে পারে।

যদি হিটলার আর নাৎসীরা শৃঙ্খল-বিক্রিয়ায় পরমাণু-বিভাজন সফল করার কায়দা আগে জেনে ফেলে তাহলে কি হবে?—তারা হয়তো সারা পৃথিবীই জয় করে ফেলবে। ব্যাপারটা যতই 'অভিনব' মনে হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এ ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলতে হবে। আমেরিকায় বাস করছেন এ রকম আরো দুজন হাঙ্গেরীয় পদার্থবিদকে তিনি ব্যাপারটা বোঝালেন। এঁরা হলেন ইউজিন ভিগ্‌নার (Eugene Paul Wigner)—যিনি পরমাণুর গড়ন সম্বন্ধে তত্ত্বগত গবেষণার জন্যে ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—আর এডওয়ার্ড টেলার (Edward Teller)।

এঁরা তিনজন মিলে গেলেন আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে; আইন-স্টাইনও তখন রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আইনস্টাইন হলেন দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী; কাজেই তাঁর কথা হয়তো লোকে শুনবে। এঁরা আইনস্টাইনকে অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কাছে একটি চিঠি লিখতে।

১৯৪১ সালে রুজভেল্ট রাজি হলেন। এমন এক বড় আকারের গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি হল যাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু-বিভাজনের সাহায্যে যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করা যায়। যাতে লোকে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝতে না পারে, সেজন্যে এর নামকরণ করা হল **ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট**।

এই গবেষণা প্রকল্প স্থাপনের হুকুম জারি করা হল ১৯৪১ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। এর পর দিনই জাপান বোমা ফেলল পার্ল হারবার নৌঘাঁটিতে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে। রুজভেল্ট যদি আর মাত্র একদিন দেরি করতেন তাহলে হয়তো নানা ঘটনার জামাডোলে এই নির্দেশ জারির কথা তিনি ভুলেই যেতেন।

banglainternet.com

পরমাণু-বিভাজনের সব অসুবিধে কাটিয়ে উঠে যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটমাট দুশ' কোটি ডলার (প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) খরচ করতে হল।

নানা রকম অসুবিধে

প্রথমত শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটার জন্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু-বিভাজন থেকে বেরোনো নিউট্রন গিয়ে অন্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রে ঘা মারতে হবে। কিন্তু ধরা যাক, তা না করে নিউট্রনরা গিয়ে অন্য ধরনের পরমাণুকেন্দ্রে ঘা মারল। এসব পরমাণু যদি শুষে নেয় নিউট্রনদের তাহলে কিছুই হয়তো ঘটবে না, কিংবা এমন কিছু পরিবর্তন ঘটবে যাতে আর নিউট্রন তৈরি হয় না। যাই হোক না কেন, নিউট্রনরা ফুরিয়ে গেলে শৃঙ্খল-বিক্রিয়া থেমে যাবে।

ইউরেনিয়ামকে শোধন করে এমন ব্যবস্থা অবশ্য অনায়াসেই করা যায় যাতে ভেঙে-পড়া ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রের আশেপাশে ইউরেনিয়াম পরমাণুই শুধু থাকে। মুশকিল হল, শুধু তাতেই কাজ চলে না। বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামেরও বেশির ভাগই হল ইউরেনিয়াম-২৩৮, যেটা আমরা চাইনে। অতি বিশেষ অবস্থা ছাড়া এতে পরমাণু-বিভাজন ঘটে না। প্রতি হাজারটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে মেটে সাতটা হল ইউরেনিয়াম-২৩৫। এটা শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। কোনমতে ইউরেনিয়ামের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণুর সংখ্যা কমিয়ে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

এর অর্থ ইউরেনিয়াম-২৩৫ আর ইউরেনিয়াম-২৩৮ পৃথক করা। এর আগের এক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, আইসোটোপ পৃথক করা কেন এত শক্ত। এবার বিজ্ঞানীদের তাই করতে হবে ব্যাপক আকারে। তাঁদের দরকার বহু পাউন্ড বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫। এই হল একটা বড় রকমের অসুবিধে।

ইউরেনিয়াম আইসোটোপদের পৃথক করার জন্যে প্রায় আধ ডজন বিভিন্ন পদ্ধতি কাজে লাগানো হল। তাদের মধ্যে একটি হল বিশেষ ধরনের ভর-বর্ণালীলেখ যন্ত্র ব্যবহার করা। আরেকটা পদ্ধতির জন্যে ইউরেনিয়ামকে ফ্লোরিন নামে একটা গ্যাসের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে তৈরি করা হল **ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড**। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের কতকগুলো অণুতে রইল

ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু আর অন্য কতকগুলো অণুতে রইল ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু। ইউরেনিয়াম ২৩৫-অলা অণুগুলো হল অন্যদের চাইতে শতকরা প্রায় এক ভাগ হালকা। এই গ্যাসকে যখন জোর করে ঢালিয়ে দেওয়া হল অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রঅলা কতকগুলো পর্দার ভেতর দিয়ে, তখন এসব ছিদ্র-পথে ইউরেনিয়াম ২৩৫-অলা অণুগুলো বেরিয়ে যেতে লাগল সামান্য একটু বেশি তাড়াতাড়ি। একেবারে শেষ পর্দার ভেতর দিয়ে প্রথম দিকে বেরোলো যে গ্যাস তাতে রইল শুধু ইউরেনিয়াম ২৩৫-অলা অণু।

আশ্চর্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরি করতে লাগলেন যা মাত্র কবছর আগেও একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হত।

উন্নত ইউরেনিয়াম (স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের তুলনায় যাতে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর অংশ বেশি) ব্যবহার করে এবার শৃঙ্খল-বিক্রিয়া চালু রাখা সম্ভব হয়ে উঠল। মনে রাখবে, পরমাণু-বিভাজন থেকে বেরনো প্রতিটি নিউট্রনকেই যে অন্য কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত করতে হবে তা নয়। আসলে শুধু প্রতিটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু-বিভাজনের ফলে অন্ততপক্ষে একটি নিউট্রন কণিকা অন্য এক ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত করলেই চলবে। তাতেই প্রতি মুহূর্তে যে কটি পরমাণুকেন্দ্রে বিভাজন ঘটছে তার সংখ্যা হয়তো একই থাকবে অথবা বাড়বে। শক্তিসৃষ্টির বেলাতেও তেমনি।

হয়তো ভাবছ, বিজ্ঞানীদের এত ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর দরকার হল কেন? প্রথম পরীক্ষার জন্যে ছোট একটা খণ্ড, অতি ছোট একটা কণা দিয়ে কি কাজ চলত না? এর জবাব হল 'না'। এটা আরেক অসুবিধে।

মনে কর, তুমি একটা ছোট টুকরো, এক আউন্স পরিমাণ ইউরেনিয়াম, নিয়ে শুরু করলে। এই টুকরোর ভেতর যদি নিউট্রন কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভাঙতে পারে তাহলে আরো নিউট্রন বেরিয়ে চারদিকে ছিটকে যেতে থাকে। তাতে আরো পরমাণুকেন্দ্র ভাঙার কথা। কিন্তু নিউট্রন একটা পরমাণুকেন্দ্রকে বিভাজন ঘটাবার মতো ঠিকমতো ঘা মারার আগে হয়তো অন্য কতকগুলো পরমাণুকেন্দ্রের গা ঘেঁষে ঠিকরে চলে যায়। ইউরেনিয়ামের টুকরোটা যদি ছোট হয় তাহলে পরমাণু-বিভাজন ঘটাবার আগেই হয়তো বেশির ভাগ নিউট্রন বেরিয়ে পড়বে টুকরোর বাইরে। এর ফলে হাওয়ায় এত বেশি নিউট্রন নষ্ট হবে যে, শৃঙ্খল-বিক্রিয়া আর চলবে না।

banglainternet.com

ইউরেনিয়ামের বড়সড় টুকরো নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলে টুকরো থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে নিউট্রন কণিকার কোন-না-কোন পরমাণুকেন্দ্রে সরাসরি আঘাত করে বিভাজন ঘটাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। টুকরোর আকার যত বড় হয়, এই সম্ভাবনাও তত বাড়ে। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যখন একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছয় তখন এত বেশি সংখ্যায় নিউট্রনরা পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করতে থাকে যে, শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরু হয়ে আপনা থেকেই চালু থাকে। সবচেয়ে ছোট আকারের যে পরিমাণ ইউরেনিয়ামে এটা সম্ভব তাকে বলা হয় **সীমান্তিক আকার**।

পারমাণবিক বোমা

এবার মনে কর, তোমার কাছে রয়েছে দুটুকরো উন্নত ইউরেনিয়াম ; এর প্রত্যেকটাই সীমান্তিক আকারের চেয়ে সামান্য ছোট। এই দুটি খণ্ডেই এখানে-ওখানে পরমাণু-বিভাজন চলতে থাকবে। তবে এতে শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটবে না। পরমাণু-বিভাজন থেকে তৈরি বেশির ভাগ নিউট্রনই ইউরেনিয়াম থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় চলে যাবে।

কিন্তু যদি এই দুটি খণ্ডকে এক সময়ে হঠাৎ এক সাথে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে? তখন দুটিতে মিলে হবে সীমান্তিক আকারের চেয়ে বড় একটি খণ্ড।

দুটি খণ্ড হঠাৎ এক সাথে হবার মুহূর্তটিতে কি ঘটতে পারে দেখা যাক। এই খণ্ডের মধ্যে কোন-না-কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুতে বিভাজন ঘটতে থাকবে। (এই খণ্ডে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করার দরকার নেই। স্বতঃ-বিভাজন ঘটতে থাকবে।) কিন্তু এবার শুরু হবে শৃঙ্খল-বিক্রিয়া। পরমাণু-বিভাজনে যে নিউট্রন সৃষ্টি হবে তা ইউরেনিয়ামের তাল থেকে বেরোবার আগেই অন্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে দেবে। তাতে ক্রমে ক্রমে আরো বেশি বেশি নিউট্রন তৈরি হতে থাকবে।

এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুধু যে নিজের ধারা বজায় রাখবে তাই নয়, প্রতি মুহূর্তে ভেঙে যাওয়া পরমাণুকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগের মধ্যে অসংখ্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র ভেঙে পড়বে। প্রতিটি পরমাণু-বিভাজন থেকে বেরোবে অল্প খানিকটা শক্তি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ইউরেনিয়ামের তালটা গলে টগবগ করে বাষ্প হয়ে উবে যাবে। আর তখন থেমে যাবে শৃঙ্খল-বিক্রিয়া।

banglainternet.com

বিক্রিয়া থামার আগে শক্তির উদ্ভব ঘটবে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে। ইউরেনিয়াম উবে যাবার আগেই সৃষ্টি হবে সূর্যের মতো বা তার চেয়েও উজ্জ্বল এক আগুনের গোলা। রঞ্জনরশ্মি আর গামারশ্মি বেরোতে থাকবে চতুর্দিকে, দ্রুতগতি কণিকা ছিটকে পড়বে চারপাশে, আর সেই আগুনের গোলার ভেতরে তাপ হয়ে দাঁড়াবে প্রায় এক কোটি ডিগ্রী।

এ-সবই বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন। স্বভাবতই তাঁরা এবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন সত্যি সত্যি উন্নত ইউরেনিয়াম খণ্ডে এসব ব্যাপার ঘটে কিনা।

সাধারণত কোন নতুন বিস্ফোরক নিয়ে পরীক্ষার সময় তার অতি সামান্য একটা টুকরো নিয়ে খুব ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেখা হয়। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বেলায় এটা খাটবে না। এখানে সীমান্তিক আকার চাই, নইলে বিস্ফোরণ ঘটবে না। আর সীমান্তিক আকার ব্যবহার করলে ঘটবে এক অতি বিরাট বিস্ফোরণ। এর চেয়ে কম কিছু ঘটাবার উপায় নেই।

বিজ্ঞানীদের সামনে আর কোন পথ ছিল না। তাই ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে তাঁরা নিউ মেক্সিকো রাজ্যের আলামোগর্ডো নামে জায়গায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন—ইতিহাসের প্রথম **পারমাণবিক বোমার** অতি প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল ; যেন হাজার হাজার টন অতিবিস্ফোরক টি-এন-টিতে এক সাথে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এ ধরনের বিস্ফোরণের বহু ছবি এর পর খবরের কাগজে, বইতে, ছায়াছবিতে দেখানো হয়েছে। তাই মোটামুটি সবাই আজ আমরা জানি, কি ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের দৃশ্য!

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল ; নাৎসী জার্মানী সম্পূর্ণ ধ্বংস হল। তারাও হাইসেনবার্গের নেতৃত্বে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্যে গবেষণা চালাচ্ছিল ; তবে বেশি দূর এগোতে পারেনি। জাপান তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানেও যুদ্ধ প্রায় শেষ হবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু মার্কিন সরকার একে তাড়াতাড়ি শেষ করার উদ্যোগ নিলেন (কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের আবিষ্কৃত পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ মারণক্ষমতার জন্যে একে ব্যবহার না করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে কান দেওয়া হল না)।

দুটি বোমা তৈরি করা হল, আর পরের মাসেই অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তাদের ফেলা হল জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরের

ওপর। এতে বিপুল আর দুঃখজনক ধ্বংসকাণ্ড ঘটল। শহর দুটির কেন্দ্রস্থল ধ্বংস হয়ে গেল আর তাতে এক লক্ষের ওপর লোক মারা গেল অথবা জখম হল। দুসপ্তাহের মধ্যে জাপান আত্মসমর্পণ করল আর সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।

এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষার জন্যে কয়েক শ' পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যুদ্ধের জন্যে এই বোমা আর ব্যবহার করা হয়নি। সমগ্র মানবজাতির প্রার্থনা যেন এই বোমা আর কখনো মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা না হয়।

আজ শুধু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই এই বোমা আছে তা নয়। তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল চার বছর। তারপর ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল। ১৯৫২ সালে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাল গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৬০ সালে ঘটাল ফ্রান্স। ১৯৬৪ সালে চীন প্রজাতন্ত্র ('গণচীন') পারমাণবিক বোমা তৈরি করে হল এই বোমার অধিকারী পঞ্চম দেশ।

ইতিমধ্যে হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যে ধরনের বোমা ফেলা হয়েছিল তারচেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী নতুন বোমা তৈরি হল।

হাইড্রোজেন বোমা

এবার আমরা তাকিয়ে দেখব, ভর-শক্তির চতুর্থ চিত্রের (১৬৯ পৃষ্ঠা) দিকে। প্রথম যে পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়েছিল তাতে ব্যবহার করা হয়েছিল ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম রয়েছে এই চিত্রের ডানপাশে শেষ প্রান্তে।

নকশার এই প্রান্তটা অনেকটা সমান্তরাল। এখানকার ইউরেনিয়াম থেকে বাঁ-পাশের মাঝারি আকারের পরমাণুকেন্দ্র পর্যন্ত যেতে পরমাণুগুলোর ভর খুব বেশি হারায় না। এতেই অবশ্য প্রচণ্ড শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় ; কিন্তু তার সাথে তুলনা কর নকশার বাঁ প্রান্তের।

ধরা যাক, হাইড্রোজেনকে রূপান্তরিত করা হল হিলিয়ামে। লক্ষ্য করলেই দেখবে কত বেশি ভর হারাচ্ছে, আর কত বেশি শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। সাধারণ পারমাণবিক বোমায় বস্তুর হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ পরিণত হয় শক্তিতে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমায় বস্তুর হাজার ভাগের সাত ভাগই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

banglainternet.com

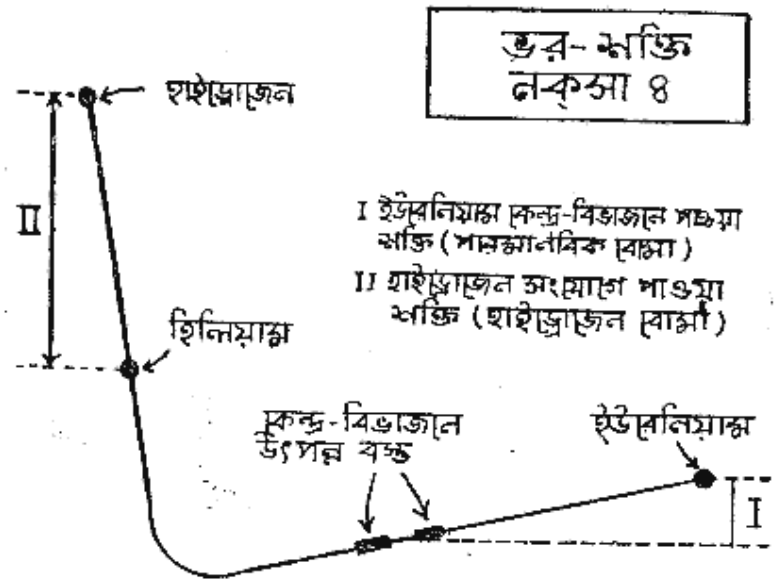

১৯৪৯ সালের পর থেকে বিজ্ঞানীরা এই শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে গভীরভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার জন্যে নতুন এক পন্থার দরকার হল। এর আগে ১১৩ পৃষ্ঠায় আমি পারমাণবিক বিক্রিয়ার একটা উপায় বর্ণনা করেছি। সে হল শক্তিশালী মৌলকণিকাদের ছররা গুলি হিসেবে ব্যবহার করা। তারপর থেকে এই উপায়ের কথাই এতক্ষণ ধরে বলা হয়েছে। এবার দ্বিতীয় আর এক উপায়ের কথা বলার সময় এসেছে।

এই দ্বিতীয় উপায় আর কিছু নয়—তাপ!

শুনে হয়তো অবাক হচ্ছ। হয়তো তোমাদের মনে পড়বে এই বইয়ে প্রথম দিকে আমিও বলেছিলাম তেজস্ক্রিয়া এবং অন্যান্য পারমাণবিক বিক্রিয়ার ওপর তাপের কোন প্রভাব নেই। তাতে আমি এই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, ১৯৪৫ সালের আগ পর্যন্ত মানুষ যতটা তাপ তৈরি করতে পারত তার কোন প্রভাব নেই।

তেজস্ক্রিয় পদার্থকে হয়তো গনগনে গরম করে তোলা হল, কিন্তু তাতে কি? তাপমাত্রা চড়েছে হয়তো মাত্র কয়েক হাজার ডিগ্রী। এতে পরমাণুদের মধ্যে ঠোকাঠুকি সাধারণ অবস্থার চেয়ে বাড়বে ঠিকই, কিন্তু তবু ইলেকট্রনের খোলসের পাহারার দরুন পরমাণুকেন্দ্রের বিক্রিয়া ঘটাতে পারবে না।

কিন্তু কয়েক হাজার ডিগ্রীর বদলে মানুষ যদি তৈরি করতে পারে বহু লক্ষ ডিগ্রী তাপমাত্রা, তাহলে?

এ রকম অবিশ্বাস্য তাপমাত্রায় পরমাণুকেন্দ্র থেকে সব ইলেকট্রনের খোলস খসে পড়ে; পরমাণুকেন্দ্রগুলোর মধ্যে লেগে যায় প্রচণ্ড ঠোকাঠুকি, আর শুরু হয়ে যায় পারমাণবিক বিক্রিয়া। অতিমাত্রায় তাপে এমনি যেসব বিক্রিয়া শুরু হয় তাদের বলা হয় **তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া**।

এ রকম তাপ সৃষ্টি হতে পারে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।

কাজেই এমন নতুন বোমা তৈরি হল যার ভেতর সাধারণ ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বিস্ফোরণ ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু করার জন্যে। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ তারচেয়ে আরো অনেক বড়, অনেক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সূত্রপাত করল যাতে হাইড্রোজেন পরমাণু পরিণত হয় হিলিয়াম পরমাণুতে।

এই নতুন বোমাকে বলা হল **হাইড্রোজেন বোমা**। সাধারণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ বোমা হল **পরমাণু-বিভাজন বোমার** দৃষ্টান্ত। হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি করে যে হাইড্রোজেন বোমায়, সে হল **পরমাণু-সংযোজন বোমার** দৃষ্টান্ত।

আসলে হাইড্রোজেন বোমায় সাধারণ হাইড্রোজেনের বদলে ব্যবহার করা হয় ভারি হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম। ভারি হাইড্রোজেনকে লিথিয়ামের সঙ্গে যোগ করে তৈরি করা হয় লিথিয়াম হাইড্রাইড নামে একটি কঠিন পদার্থ। এই লিথিয়াম আর ভারি হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম, আর তাতে উদ্ভব ঘটে বিপুল পরিমাণ শক্তির।

ঠিক কিভাবে যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় সেটা অবশ্য গোপন সামরিক তথ্য। তবে খুব সম্ভব এই পদ্ধতির মূল বিষয়টা প্রথম প্রস্তাব করেন এডওয়ার্ড টেলার (যে তিনজন পদার্থবিদ আইনস্টাইনকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছিলেন,

তাঁদের একজন)। এজন্যে অনেক সময় টেলারকে বলা হয় 'হাইড্রোজেন বোমার জনক'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন [পরে চীন প্রজাতন্ত্রও—অনুবাদক] পরীক্ষামূলকভাবে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। হিরোশিমায় যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় সে ছিল বিশ হাজার টন টি-এন-টির বিস্ফোরণের সমান শক্তিশালী। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ হতে পারে পাঁচ কোটি টন টি-এন-টির সমান শক্তিশালী। একটি মাত্র হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা যায়।

সূর্য (এবং অন্যান্য সাধারণ নক্ষত্র) তার শক্তি পায় তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়া থেকে। সূর্যের ভেতরকার তাপমাত্রা বহু লক্ষ ডিগ্রী। সেখানে সূর্যের হাইড্রোজেন (তার মোট আয়তনের শতকরা ৮৫ ভাগই হল হাইড্রোজেন) পরিণত হচ্ছে হিলিয়ামে। এভাবে সূর্য তার ভর হারায় আর তার বদলে ছড়ায় শক্তি। কাজেই আমরা সবাই আসলে আলো আর তাপ পাচ্ছি এমন একটা বিরাট 'হাইড্রোজেন বোমা' থেকে যেটা ৮,৬০,০০০ মাইল চওড়া, রয়েছে পৃথিবী থেকে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে, আর তার বুকে অনবরতই ঘটছে বিস্ফোরণ।

তিনটি প্রভাব

একটি বোমার বিস্ফোরণ যদি হয় বহু লক্ষ টন টি-এন-টির বিস্ফোরণের সমান, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা সমগ্র মানুষ জাতির সামনে এক ভয়াবহ বিপদ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, কতকগুলো কারণে এমন বিরাট আকারের টি-এন-টির বিস্ফোরণের চেয়েও পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ অনেক বেশি মারাত্মক।

পারমাণবিক বোমা আর হাইড্রোজেন বোমা ক্ষতি ঘটায় তিন রকমভাবে।

প্রথম ক্ষতিকর প্রভাব হল **সংঘাত**। বিস্ফোরণের ফলে হাওয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী 'সংঘাত তরঙ্গের' আকারে। প্রবল ধাক্কায় জমিনও কাঁপতে থাকে থরথর করে। এই হাওয়ার তোড় আর ভূমিকম্পের প্রভাব মিলে চারপাশের বেশ কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বাড়িঘর সব ভেঙে পড়ে। এই সংঘাতে মানুষ আর তার সমস্ত কীর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

banglainternet.com

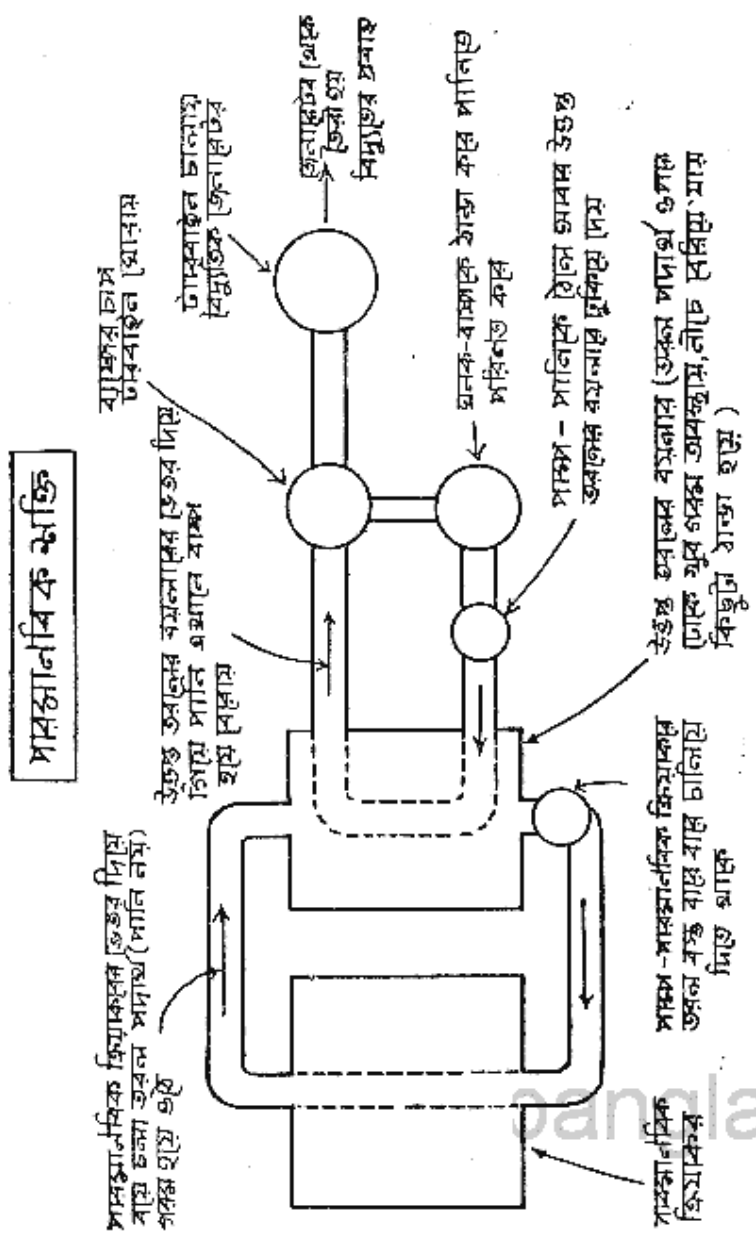

দ্বিতীয় ক্ষতিকর প্রভাব হল তাপ। যে বিপুল তাপের উদ্ভব হয় তাতে চারপাশে ব্যাপক আকারে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয়। এতে সংঘাতের মারাত্মক ক্ষতি আরো অনেক বাড়িয়ে দেয়, ছড়িয়েও দেয় বহু দূর পর্যন্ত।

এই দুটি প্রভাব কিন্তু অনেকটা সাধারণ বিস্ফোরণের ক্ষতির মতোই। সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরকের চাইতে অবশ্য পারমাণবিক বোমার সংঘাত আর তাপ অনেক বেশি মারাত্মক, তবে এ ধরনের ক্ষতির সাথে মানুষ আগে থেকে পরিচিত।

তৃতীয় ধরনের যে প্রভাব তা কিন্তু সাধারণ বিস্ফোরক থেকে কখনো হয় না, আর এটাই হল সবচাইতে বেশি মারাত্মক ক্ষতি। এই প্রভাবটি হল **অতি শক্তিশালী বিকিরণ**।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিকিরণ কিছুটা প্রকাশ পায় চোখ-ধাঁধানো আলো হিসেবে ; কিন্তু সব সময়েই তার সঙ্গে থাকে রঞ্জন-রশ্মি, গামারশ্মি ইত্যাদি অদৃশ্য বিকিরণ। এসব অদৃশ্য অথচ অতি শক্তিশালী বিকিরণ যে কোন জীবকোষ বা দেহকলার ভেতর দিয়ে গেলে তার ক্ষতি করে। জীব-দেহের কলায় সবচাইতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগগুলো হল হাজার হাজার এমন কি লক্ষ লক্ষ পরমাণু মিলিয়ে তৈরি বিশাল অণুর সমাবেশ। এসব বিশাল অণুর কতকগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর ভঙ্গুর। এমনি অণুর ভেতর যখন ঢোকে শক্তিশালী গামারশ্মি তখন তার নানা খণ্ড হয়তো ছিটকে পড়ে কিংবা সমস্ত জিনিসটাই ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মতো।

যেসব লোকের দেহে এমনি শক্তিশালী বিকিরণ পড়ে তাদের দেখা দেয় **বিকিরণজনিত অসুস্থতা**। বেশিক্ষণ ধরে বিকিরণ পড়লে বিকিরণজনিত অসুস্থতায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আসলে রঞ্জন-রশ্মি আর তেজস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণার প্রথম দিকে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে এ ধরনের প্রভাবের দরুন প্রাণ দিতে হয়েছিল। যথাযথ সাবধানতার কৌশল শিখতে বিজ্ঞানীদের বেশ কবছর সময় লেগেছিল।

আজকাল কতগুলো আয়ন সৃষ্টি হচ্ছে তার হিসেব করে রঞ্জন-রশ্মি আর গামারশ্মির পরিমাণ মাপা হয়। এভাবে বিকিরণের পরিমাণ প্রকাশ করা হয় রন্ট্‌গেনের এককে ; এক রন্ট্‌গেন হল এমন বিকিরণের পরিমাপ যা প্রতি ঘন সেন্টিমিটার হাওয়ায় দুশ' কোটি আয়ন সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের শরীর নিরাপদে কত রন্ট্‌গেন বিকিরণ গ্রহণ করতে পারে

banglainternet.com

বিজ্ঞানীরা তার হিসেব করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞ বিপদের সীমারেখা নির্দেশ করেছেন প্রতি সপ্তাহে ০·৩ রন্টগেন বিকিরণ বলে।

তেজস্ক্রিয় ভস্মবর্ষণ—সবচেয়ে বড় বিপদ

পারমাণবিক বিস্ফোরণের মুহূর্তে যে গামারশ্মির সৃষ্টি হয় সে অতি মারাত্মক তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বিস্ফোরণ শেষ হবার সাথে সাথে এই রশ্মিও যায় ফুরিয়ে। কিন্তু এর চেয়ে আরো অনেক বেশি ক্ষতিকর হল পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে যেসব বস্তু তৈরি হয় তাদের প্রভাব। এসব বস্তু বিস্ফোরণের পরেও থেকে যায়। অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় এসব বস্তু ভেঙে পড়ার ফলে অনবরত অতি শক্তিশালী বিকিরণ বেরোতে থাকে।

একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো আর বাষ্পে পরিণত ধুলো-মাটির সাথে মিশে এসব তেজস্ক্রিয় বস্তু উঠে যায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে (বিস্ফোরণের ফলে তৈরি 'ব্যাঙের ছাতার' মতো মেঘকুণ্ডলীর ছবি হয়তো দেখে থাকবে)। এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ হাওয়ায় ভেসে যায় বহু শত বা বহু হাজার মাইল দূরে।

হাওয়ায় ভর করে যেসব তেজস্ক্রিয় বস্তুকণা উড়ে গিয়ে পড়ে তাদের বলা হয় **বিস্ফোরণের ভস্মবর্ষণ**। এ অতি মারাত্মক। একটি বড় রকম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে সরাসরি যত লোক মারা পড়বে তারচেয়ে ঢের বেশি লোক মারা পড়তে পারে তার ভস্মবর্ষণ হাওয়ায় ভর করে শত শত মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে।

হাইড্রোজেন বোমায় আবার এমন কিছু মৌল যোগ করে দেওয়া যায় যাতে বেশি ক্ষতিকর নানা রকম আইসোটোপ তৈরি হয়। তাতে ভস্মবর্ষণ আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। একটি হাইড্রোজেন বোমার ভস্মবর্ষণ বহু হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। আমেরিকার একটি পরীক্ষামূলক হাইড্রোজেন বোমার ভস্মবর্ষণ এক জাপানী জেলে নৌকোর ওপর পড়ে ; তাতে সেই জেলেদের বিকিরণজনিত অসুস্থতা দেখা দেয়। একজন মারাও যায়—এ হল হাইড্রোজেন বোমার প্রভাবে ইতিহাসের প্রথম মৃত্যু।

ভস্মবর্ষণে সবচেয়ে মারাত্মক যে আইসোটোপ সৃষ্টি হয় সে হল স্ট্রনশিয়াম-৯০। আমাদের হাড়ের ক্যালসিয়ামের সাথে স্ট্রনশিয়াম মৌলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। মানুষের দেহ স্ট্রনশিয়াম শুষে নিয়ে ক্যালসিয়াম বলে

ভুল করে তাকে হাড়ে জমা করে রাখে বহুদিন পর্যন্ত। স্ট্রনশিয়ামের অর্ধ-জীবনকাল ২৮ বছর ; কাজেই একজন মানুষের সারা জীবনকাল পর্যন্ত **স্ট্রনশিয়াম** ৯০-এর তেজস্ক্রিয়া থাকে। হাড়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে গুরুতর রোগ ঘটাতে পারে। এখনও খুব মারাত্মক না হলেও এর মধ্যেই আমাদের সবার হাড়ে কিছু কিছু স্ট্রনশিয়াম জমেছে ; কিন্তু পনের বছর আগে কারো হাড়ে এটা ছিল না, কেননা স্ট্রনশিয়াম ৯০-এর অস্তিত্বই ছিল না তখন।

বিজ্ঞানীরা এই ভস্মবর্ষণের বিপদ সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, আমেরিকার নেভাদা মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় তাঁরা নানা সতর্কতা গ্রহণ করতে লাগলেন। অনেক সময় আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকলে পরীক্ষা দিনের পর দিন পিছানো হত, যাতে ভস্মবর্ষণ জন-হীন এলাকার ওপর দিয়ে যায় আর মানুষের কোন ক্ষতি না করে।

শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় মেঘ ক্রমে ক্রমে হালকা হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিন্তু তবু তেজস্ক্রিয় পরমাণুরা গোটা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ; বিস্ফোরণ সমুদ্রের কাছাকাছি হলে ছড়িয়ে পড়ে পানিতেও। কোন এক বিশেষ জায়গায় হয়তো তেজস্ক্রিয়া তেমন তীব্র হয় না, তবে যেটুকু হয় তা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে ধরা পড়ে।

তেজস্ক্রিয়া মাপবার যন্ত্রে সব সময়েই কিছু-না-কিছু তেজস্ক্রিয়া ধরা পড়ছে। এর কারণ হল মাটিতে আর হাওয়ায় সব সময় অতি সামান্য পরিমাণে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পরমাণু রয়েছে। নভোরশ্মির প্রভাবও এর সাথে যোগ করতে হবে। সমুদ্র সমতলে মোট তেজস্ক্রিয় প্রভাবের প্রায় অর্ধেক হল নভোরশ্মির জন্যে। এক মাইল উঁচুতে, যেখানে ওপরকার বায়ুমণ্ডল নভোরশ্মি ততটা শুষতে পারে না, নভোরশ্মির প্রভাব বেড়ে দাঁড়ায় অর্ধেকের কিছুটা বেশি। সব সময়ই আমাদের চারপাশে উপস্থিত এই তেজস্ক্রিয়াকে বলা হয় **পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া**।

পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বায়ুমণ্ডলে কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলেই তারপর কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে পৃথিবীর সব জায়গাতেই পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া বেড়ে যায় ; কতক্ষণ ধরে বাড়বে সেটা নির্ভর করে বিস্ফোরণটা সে জায়গা থেকে কত দূরে হয়েছে তার ওপর। এই জন্যে এ ধরনের কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ গোপন রাখা যায় না। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফো-

banglainternet.com

রণ ঘটায় তখন তার খানিকক্ষণ পরেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই বিস্ফোরণের কথা জানতে পান।

কেউ কেউ বলেছেন বার বার পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া স্থায়ীভাবে বেড়ে যাবে। এ পর্যন্ত যেটুকু বেড়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের ক্ষতি করবার মতো নয়। তবে কোন কোন বিজ্ঞানী ভাবছেন, এতে হয়তো দেহে এমন সব সূক্ষ্ম ক্ষতি হচ্ছে যেগুলো বংশানুক্রমে আমাদের সন্তানসন্ততিতে ছড়াবে। কাজেই এভাবে বছর বছর পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে পুরুষানুক্রমে মানবজাতি দুর্বল হয়ে পড়বে। সমস্যাটা গুরুতর আর এর সমাধানের জন্যে গভীরভাবে চেষ্টা করা দরকার। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছেন, কিন্তু আজো এর কোন ভাল সমাধান পাওয়া যায়নি।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ভস্মবর্ষণের বিপদ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তিত একজন বিজ্ঞানী হলেন মার্কিন রসায়নবিদ লাইনাস পলিং (Linus Pauling)। তিনি এই বিপদের কথা অনবরত বলে যাচ্ছেন আর বার বার পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে বলছেন। এজন্যে ১৯৬৩ সালে তাঁকে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালে তিনি রসায়নের ওপর গবেষণার জন্যে একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাজেই পলিং আর মাদাম কুরী এই দুজনই মাত্র এ যাবৎ দুবার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

পারমাণবিক বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে এমন জনমত গড়ে ওঠে যে, ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা আপোস রফায় স্থির করেন, আর কোন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হবে না। কিন্তু ১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শুরু করে। তবে ১৯৬৩ সালে একমাত্র ভূগর্ভে ছাড়া আর কোন বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে এই তিনটি দেশের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয়। ভূগর্ভে ঠিকমতো বিস্ফোরণ ঘটালে তাতে কোন ভস্মবর্ষণ সৃষ্টি হয় না। আশা করা যায় এই চুক্তি সবাই পালন করবে।

পরমাণু-শক্তির অধিকারী দুটি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি—এরা হল ফ্রান্স আর চীন। তবে এরা শুধু পরমাণু-বিভাজন জাতীয় বোমাই তৈরি করেছে, মারাত্মক হাইড্রোজেন বোমা আজো তৈরি করতে পারেনি [ইতিমধ্যে তাও পেরেছে—অনুবাদক]।

এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশূন্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে; কিন্তু এগুলোও ক্ষতিকর। এতে ভস্মবর্ষণ সৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু উচ্চ বায়ুস্তরের আকার এবং বায়ুমণ্ডলের বাইরের আধানযুক্ত কণিকার প্রভাব বিস্তার করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর ফলে তাঁদের গবেষণায় বাধা সৃষ্টি হয়।

পারমাণবিক পরীক্ষা নিষেধ চুক্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি দেশই ভূগর্ভে ছোটখাট পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এগুলো ক্ষতিকর বলে মনে হয় না।

banglainternet.com

পরমাণুর কল্যানকর সম্ভাবনা

সূক্ষ্ম ভারসাম্য

পরমাণু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলে যদি শুধু পারমাণবিক বোমা আর হাইড্রোজেন বোমাই তৈরি হত তাহলে রীতিমতো আফসোসের কারণ দেখা দিত। এসব প্রবল মারণাস্ত্র সৃষ্টিতে কেউই সুখী হতে পারেন না, যে বিজ্ঞানীরা এসব সৃষ্টির জন্যে দায়ী তাঁরা তো ননই।

তবে পরমাণুর গবেষণা থেকে ভাল জিনিসও পাওয়া যায়, তার কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

ইউরেনিয়াম পরমাণু-বিভাজনের একটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। একতাল ইউরেনিয়াম যদি হয় সীমান্তিক আকারের চেয়ে ছোট, তাহলে তাতে পরমাণু-বিভাজন শুরু হলেও শৃঙ্খল-বিক্রিয়া থেমে যাবে। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি হয় সীমান্তিক আকারের চেয়ে বড় তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটবে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। কিন্তু যদি একতাল ইউরেনিয়াম হয় ঠিক সীমান্তিক আকারের তাহলে কি হবে? পরমাণু-বিভাজন শুরু হয়ে আপনা-

আপনি চলতে থাকবে! শৃঙ্খল-বিক্রিয়া চলতে থাকবে ঠিক একই গতিতে।

হয়তো ভাবছ, তাহলে তো ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে গেল। ঠিক ঠিক আকারের এক তাল ইউরেনিয়াম তৈরি করে নিলেই বাকি সব আপনা-আপনি চলতে থাকবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মুশকিল হল সীমান্তিক আকার সব সময় হুবহু এক থাকে না ; সেটা নির্ভর করে সেই ইউরেনিয়াম খণ্ডের ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া নিউট্রনের গতি এবং অন্যান্য আরো জিনিসের ওপর।

সহজেই বোঝা যায় যে, ধীরগতি নিউট্রনের চেয়ে দ্রুতগতি নিউট্রনের পক্ষে আদৌ কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত না করে সেই তাল থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই দ্রুতগতি নিউট্রন ব্যবহার করলে তাদের অধিকাংশ পরমাণু-বিভাজন না ঘটিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে ; শৃঙ্খল-বিক্রিয়া চালু রাখার জন্যে যথেষ্ট নিউট্রন থাকবে না। তবে যদি ইউরেনিয়াম খণ্ডের আকার বড় করা যায় তাহলে দ্রুতগতি নিউট্রনকে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে হলে কিছুটা লম্বা পথ পেরোতে হবে, আর পথে কোন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত করার সম্ভাবনাও বাড়বে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দ্রুতগতি নিউট্রন ব্যবহার করায় সীমান্তিক আকার বড় হয়ে গিয়েছে। আবার, উল্টো দিকে, ধীরগতি নিউট্রন ব্যবহার করলে সীমান্তিক আকার ছোট হয়।

পরমাণু-বিভাজন চলবার সময় এক তাল ইউরেনিয়ামের আকার ছোট-বড় করা সম্ভব নয়। তারচেয়ে বরং সীমান্তিক আকার অনুযায়ী প্রকৃত আকার বদলানোর চাইতে প্রকৃত আকার অনুযায়ী সীমান্তিক আকার বদলানো সুবিধে। নিউট্রনদের সংখ্যা আর গতি নিয়ন্ত্রণ করে সীমান্তিক আকারকে প্রকৃত আকারের সমান করে রাখা যায়। প্রথমে তৈরি করতে হবে পরমাণু-বিভাজনের হার বাড়াবার জন্যে যথাযথ ধরনের নিউট্রন প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করার একটি উৎস। তারপর চাই এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা এই নিউট্রনদের কিছু অংশ সরিয়ে নিয়ে পরমাণু-বিভাজনের হার কমিয়ে দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কম-বেশি করে পরমাণু-বিভাজন সমান তালে চালু রাখা যেতে পারে।

প্রথম হল, 'উৎস' ঃ তোমাদের হয়তো মনে আছে, আগের এক অধ্যায়ে বলেছিলাম ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু ভাঙার জন্যে তীব্রগতি নিউট্রনের চাইতে ধীরগতি নিউট্রন বেশি উপযোগী। কাজেই আমাদের দরকার প্রচুর

banglainternet.com

পরিমাণ ধীরগতি নিউট্রন। কোথায় পাওয়া যাবে এমন নিউট্রন?—দ্রুতগতি নিউট্রনের গতি কমিয়ে দিয়ে।

হয়তো তোমাদের মনে পড়বে, ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যাবার ফলে কিংবা হাওয়ায় ভাসমান (নভোরশ্মির কীর্তিতে সৃষ্টি হওয়া) ধীরগতি নিউট্রনের প্রভাবে পরমাণু-বিভাজন শুরু হয়। পরমাণু-বিভাজন শুরু হলে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু থেকে যেসব নিউট্রন ছুটে বেরোতে থাকে সেগুলো কিন্তু তীব্রগতি নিউট্রন। এদের গতি কমাতে হবে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটা টেনিস (বা ক্রিকেট) বলের কথা মনে করা যাক। টেনিস বলকে যদি ছুড়ে দেওয়া যায় একটা কামানের গোলার দিকে, তাহলে সেটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসবে। কামানের গোলার কিন্তু কিছুই প্রায় হবে না। টেনিস বলের দিক পাল্টে যাবে, কিন্তু ছুটতে থাকবে প্রায় আগের মতোই গতিতে।

কিন্তু মনে কর, টেনিস বলটা এবার কামানের গোলার গায়ে ধাক্কা না মেরে ধাক্কা খেল আরেকটি টেনিস বলের সাথে। এটা ঠিকরে আসবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য টেনিস বলটিও চলতে শুরু করবে। দ্বিতীয় টেনিস বলটিতে যে গতি জন্মাবে, প্রথম টেনিস বলটিকে হারাতে হবে সেই পরিমাণ গতি। (একটা কিছু খরচ না করে তো অন্য জিনিস পাওয়া যাবে না!) প্রথম বলটি গোড়ায় যে গতিতে চলছিল, এবার দুটোই চলছে তারচেয়ে ধীর-গতিতে।

এবার প্রথম টেনিস বলটিকে যদি ছুড়ে দেওয়া যায় অন্য পনেরটি টেনিস বলের দিকে, তাহলে সবগুলো বলই কিছুটা পথ চলবে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। প্রথম বলটির গতিও অতিমাত্রায় কমে যাবে। সেই আদি গতি ভাগ হয়ে গিয়েছে ষোলটি বলের মধ্যে, আর প্রত্যেকের ভাগেই পড়েছে তার অল্প খানিকটা অংশ।

দ্রুত নিউট্রনের বেলাতেও আমাদের এমনি ধরনের কিছু করতে হবে। ইউরেনিয়ামের সাথে আমাদের একটি বস্তু যোগ করতে হবে যা দ্রুতগতি নিউট্রনদের গতি কমিয়ে দেবে, কিন্তু তাদের শুষে নেবে না। বস্তুটি যদি বেশ বড়সড় পরমাণু দিয়ে গড়া হয় তাহলে নিউট্রনগুলি শুধু ঠিকরে ফিরে আসবে; সেই কামানের গোলার গায়ে ধাক্কা খাওয়া টেনিস বলের মতোই

তাদের শুধু দিক বদলাবে, কিন্তু গতি তেমন কমবে না। কিন্তু বস্তুটি যদি এমন হালকা পরমাণু দিয়ে তৈরি হয় যা নিউট্রনদের চেয়ে তেমন বেশি ভারি নয়, তাহলে সেই টেনিস বলের সাথে টেনিস বলের ঠোকাঠুকির মতো, তাদের গতি কমে যাবে।

কম প্রস্হচ্ছেদযুক্ত হালকা পরমাণু নিউট্রনদের শুষে না নিয়ে তাদের গতি কমিয়ে দিতে পারে। এ ধরনের পরমাণু বিশিষ্ট বস্তুকে বলা হয় মন্হরক। পরমাণু-বিভাজনের জন্যে যেসব মন্হরক ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে ডয়টেরিয়াম, বেরিলিয়াম আর কার্বন। ডয়টেরিয়াম-পরমাণু নিউট্রনের তুলনায় মাত্র দ্বিগুণ ভারি, বেরিলিয়াম নগুণ ভারি, আর কার্বন বারোগুণ ভারি।

একটি দ্রুতগতি নিউট্রনকে যথেষ্ট ধীরগতি হতে অন্তত দুশ' কার্বন পরমাণুর গা থেকে ঠিকরে ফিরে আসতে হয়। ডয়টেরন পরমাণু কার্বনের তুলনায় আকারে ছোট বলে এ ব্যাপারে বেশি উপযোগী। দ্রুতগতি নিউট্রনকে মাত্র পঞ্চাশটি ডয়টেরিয়াম পরমাণু থেকে ঠিকরে এলেই চলে। ডয়টেরিয়াম ব্যবহার করা হয় ভারি পানি হিসেবে, আর কার্বন ব্যবহার করা হয় গ্রাফাইট হিসেবে; সাধারণ পেন্সিলের সীস এই গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি।

এ তো গেল উৎসের কথা। মন্হরক ব্যবহার করে ধীরগতি নিউট্রনের সরবরাহ বাড়াবার ফলে পরমাণু-বিভাজন বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এর উল্টো বিপদ ঠেকানো যায় কি করে? পরমাণু-বিভাজন বাড়তে বাড়তে যদি বিস্ফোরণ ঘটে? সেটা নিয়ন্ত্রণের কি ব্যবস্হা?

এজন্যে ক্যাডমিয়াম মৌল বেশ কাজে আসে। অন্তত একটি স্হায়ী ক্যাডমিয়াম আইসোটোপের রয়েছে রীতিমতো বড় প্রস্হচ্ছেদ। অর্থাৎ এটা একটি নিউট্রন শুষে নিয়ে এক একক বেশি ভরসংখ্যার অন্য এক স্হায়ী ক্যাডমিয়াম আইসোটোপে পরিণত হয়।

পরমাণু-বিভাজনের সময় ইউরেনিয়ামের সঙ্গে যদি ক্যাডমিয়াম থাকে তাহলে কিছুসংখ্যক নিউট্রনকে ক্যাডমিয়াম শুষে নেয়। ক্যাডমিয়াম যদি বেশি থাকে তাহলে শৃংখল-ক্রিয়া চলবার মতো যথেষ্ট নিউট্রন থাকে না। ইউরেনিয়ামের মধ্যে ক্যাডমিয়াম দেওয়া অনেকটা আগুনে পানি ঢালার মতো। বোরন হল আরেকটি মৌল যার এমনি গুণ রয়েছে।

banglainternet.com

পরমাণু যুগের আবির্ভাব

পরমাণু-বিভাজন থেকে শৃংখলক্রিয়া সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা হয় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে। এতে যে ইউরেনিয়াম যৌগ ব্যবহার করা হয় সেটা যথেষ্ট বিশুদ্ধ ছিল না, তাই এই বিক্রিয়া অগ্রসর হতে পারেনি। অবাঞ্ছিত পরমাণুগুলি বিভাজন না ঘটিয়ে প্রচুর নিউট্রনকে শুষে নেয়।

প্রথম সাফল্যজনকভাবে স্বয়ংক্রিয় পরমাণু-বিভাজন ঘটানো হয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকাবাসী ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নেতৃত্বে একটা খেলার স্টেডিয়ামে গ্যালারির তলায় তৈরি করা হল ইউরেনিয়াম আর কার্বনের বিশাল এক ঘনক। প্রথমে বসানো হল এক স্তর ইউরেনিয়াম, তারপর এক স্তর কার্বন, তারপর আরেক স্তর ইউরেনিয়াম, তারপর আরেক স্তর কার্বন—এমনি করে নানান স্তরের পাঁজা তৈরি করা হল বলে এর নাম দেওয়া হল **পারমাণবিক পাঁজা** বা পারমাণবিক চুল্লী। পরমাণু-বিভাজনের সব ব্যবস্থাই তা বলে এভাবে তৈরি হয় না ; তাই এর উপযুক্ত নাম হল **পারমাণবিক ক্রিয়াকর**।

পারমাণবিক পাঁজার মাঝে মাঝে ফুটো করে তার ভেতর ঢোকানো হল ক্যাডমিয়ামের দণ্ড। শেষ পর্যন্ত এই ক্রিয়াকর তৈরি যখন শেষ হল তখন এর দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ৩২ ফুট, চওড়ায় ৩০ ফুট আর উঁচুতে ১২ ফুট। এর মোট ওজন হল ১৪০০ টন, তার মধ্যে ৫২ টন ইউরেনিয়াম।

এবার ইউরেনিয়ামে শুরু হয় পরমাণু-বিভাজন। নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেয় কার্বন আর তাদের শুষে নেয় ক্যাডমিয়াম। ক্যাডমিয়ামের দণ্ডগুলোকে যখন ফুটোয় সম্পূর্ণ ঢোকানো থাকে তখন তা এত নিউট্রন শুষে নেয় যে, পরমাণু-বিভাজন থেমে যায়। ধীরে ধীরে ক্যাডমিয়াম দণ্ড বের করে নিলে পাঁজার ভেতরকার ক্যাডমিয়াম এতটা নিউট্রন শুষে নেবে যাতে বিস্ফোরণ ঘটতে না পারে অথচ পরমাণু-বিভাজনও থেমে না যায়। অর্থাৎ বিভাজন-বিক্রিয়ার ভারসাম্য ঠিকমতো রক্ষা হয়েছে।

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে ক্যাডমিয়াম দণ্ডগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণে টেনে বের করে ঠিক এমনি অবস্থা ঘটানো হল আর ইতিহাসের প্রথম স্বয়ংক্রিয় বিভাজন-বিক্রিয়া চালু হল। এই দিনের এই মুহূর্তেই আসলে জন্ম হল 'পারমাণবিক যুগের'। এর পরও আড়াই বছর লেগেছে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে ; কেননা, ততদিন

লেগেছে যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরি করতে। তবে স্বয়ংক্রিয় বিভাজন-বিক্রিয়া সম্ভব হবার পর বোমা তৈরির আর কোন সমস্যা রইল না।

এই সাফল্যের খবর যে টেলিগ্রাম মারফত পাঠানো হয়েছিল তাতে লেখা ছিল : "ইতালীয় নাবিক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে।" (ইতালীয় নাবিক বলতে এক কালে বোঝাত কলম্বাসকে, কিন্তু এখন তিনি হলেন ফার্মি ; তিনি আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার ভূখণ্ড নয়, পারমাণবিক শক্তি।) এর জবাবে টেলিগ্রামযোগে এল একটি জিজ্ঞাসা : "স্থানীয় বাসিন্দারা কেমন?"—তাড়াতাড়ি আবার তার উত্তর গেল, "অতি বন্ধুভাবাপন্ন।"

সময়েই বোঝা যাবে তারা কতটা বন্ধুভাবাপন্ন। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমরা, ফার্মির অনুসারী নাবিকরা, তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করি তার ওপর।

ক্যাডমিয়ামের শোষকদের সাহায্যে পারমাণবিক পাঁজাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সাহায্যে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বা টেনে বের করে দরকারমতো নিউট্রনের প্রবাহ কমানো বা বাড়ানো যায়।

সৌভাগ্যক্রমে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণু-বিভাজন ঘটার সময় কিছু নিউট্রন বেরোয় একটু দেরিতে। তাতে বিভাজন-বিক্রিয়া বেড়ে উঠতে শুরু করলে ক্যাডমিয়াম দণ্ড ঠেলে দেবার খানিকটা সময় পাওয়া যায়। এই দেরিটুকু না হলে যে-মুহূর্তে বিভাজন হওয়া পরমাণুর সংখ্যা সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে একটু ছাড়িয়ে যেত অমনি ঘটত এক বিস্ফোরণ। অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েও তাকে আর থামানো যেত না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রথম পারমাণবিক পাঁজাটি খুব সুবিধের ছিল না। পরমাণু-বিভাজন চলবার সময় যে তাপ সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে ইউরেনিয়ামকে ঠাণ্ডা রাখবার এতে কোন ব্যবস্থা ছিল না ; বিকিরণের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষারও কোন ভাল ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে ১৯৪৩ সাল থেকে আরো অনেক উন্নত ধরনের পারমাণবিক ক্রিয়াকর তৈরি হয়েছে। এসব তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানী, জাপান এবং অন্যান্য দেশে। ১৯৬০ সালের পর পর এমন কি ভারতের মতো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশেও পারমাণবিক ক্রিয়াকর তৈরি হয়েছে। (অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তারা পারমাণবিক বোমাও তৈরি করতে পেরেছে।) সবসুদ্ধ দুনিয়াতে এখন

banglainternet.com

চার শ'র ওপর পারমাণবিক ক্রিয়াকর রয়েছে—তার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই হচ্ছে মার্কিন দেশে তৈরি।

প্রচুর আইসোটোপ

পারমাণবিক ক্রিয়াকরের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়ে উঠল। ক্রিয়াকর তৈরির আগে সাইক্লোট্রন বা এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যেত অতি সামান্য পরিমাণে।

মানুষের তৈরি যে-কোন সাইক্লোট্রনের চাইতে পারমাণবিক ক্রিয়াকরে পারমাণবিক ছররা গুলি (নানা শক্তির নিউট্রনের আকারে) পাওয়া যায় অনেক বেশি পরিমাণে। এজন্যে শুধু ক্রিয়াকরে বিশেষভাবে তৈরি ফুটোয় কোন বস্তু রেখে দিলেই হল। এই বস্তুতে তখন অসংখ্য নিউট্রন কণিকা এসে ছিটকে পড়তে থাকে। বস্তুটি যখন বের করে নেওয়া হয় তখন তার একটা বড় অংশ বদলে গিয়ে হয়েছে নতুন আইসোটোপ ; সচরাচর এসব আইসোটোপ হয় তেজস্ক্রিয়।

এমনি আইসোটোপযুক্ত বস্তুর নমুনা গুঁড়ো অথবা তরল আকারে আবরণ-মোড়া পাত্রে বন্ধ করে পৃথিবীর নানা দেশে পাঠানো হয়। এসব নমুনার তেজস্ক্রিয়া কুরী এককে মাপা হয় ; বলা বাহুল্য, এককটির নামকরণ করা হয়েছে পিয়ের ও মারি কুরীর নামে। এক কুরী তেজস্ক্রিয়া বিশিষ্ট কোন বস্তু থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ৩,৭০০ কোটি কণিকা বেরোচ্ছে।

আসলে এক কুরী তেজস্ক্রিয়া বলতে অনেকখানি তেজস্ক্রিয়া বোঝায়। অনেক নমুনায় রয়েছে মাত্র কয়েক **মিলি-কুরী** বা এমন কি **মাইক্রো-কুরী** তেজস্ক্রিয়া। এক মিলি-কুরী হল এক কুরীর হাজার ভাগের এক ভাগ ; আর এক মাইক্রো-কুরী হল এক কুরীর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। কখনো কখনো তেজস্ক্রিয়া মাপা হয় **রাদারফোর্ড** হিসেবে (যে বিজ্ঞানী প্রথম পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটান তাঁর নাম অনুসারে)। এক রাদারফোর্ড হল এক মিলিকুরীর ৩৭ ভাগের এক ভাগ—আর এতে বোঝায় প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ পরমাণু ভেঙে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিকিৎসার জন্যে যুক্তিসঙ্গত দামে প্রচুর পরিমাণ আইসোটোপ পাওয়া সম্ভব হল।

banglainternet.com

যেমন, পারমাণবিক ক্রিয়াকর আবিষ্কৃত হবার আগে কার্বন ১৪-এর যে দাম ছিল আজ এর দাম তার প্রায় তিরিশ হাজার ভাগের এক ভাগ।

এসব আইসোটোপের উপযোগিতা মনে হয় সীমাহীন। অতি সামান্য তেজস্ক্রিয় বস্তুর হদিস করে রসায়নবিদরা আজ এত অল্প পরিমাণ রাসায়নিক বস্তুর পরিমাপ করতে পারেন যা এর আগে কখনো সম্ভব হত না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কতকগুলো অদ্রাব্য রাসায়নিক বস্তু ঠিক কি পরিমাণে পানিতে গলে তাঁরা আজ তার নিখুঁত হিসেব পাচ্ছেন। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন ঠিক কোন্ পরমাণু কিভাবে এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে স্থানান্তরিত হয়। রাসায়নিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে জীবদেহ সম্বন্ধেও নানা তথ্য জানা যায়। যেমন, সেই ১৯২৩ সালে গিয়র্গ ফন হেভ্‌সি (Georg Von Hevesy) নামে এক হাঙ্গেরীয় রসায়নবিদ সামান্য মাত্রায় সীসার এক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপযুক্ত পানি গাছের গোড়ায় দিতে থাকেন। তেজস্ক্রিয়ার স্থানান্তর পরীক্ষা করে উদ্ভিদ কিভাবে খনিজদ্রব্য গ্রহণ করে সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছন।

পরীক্ষণ হিসেবে এটা খুব ভাল তা বলা যায় না। তার কারণ সীসা জীবদেহের কলার স্বাভাবিক উপাদান নয় ; তাই এই কৃত্রিম বস্তুর ব্যাপারে উদ্ভিদের আচরণ স্বাভাবিক কিনা তা বোঝার কোন উপায় ছিল না। তবে ফন হেভ্‌সির পরীক্ষা এ ধরনের গবেষণার পথ দেখিয়েছিল ; এর পর জীবদেহের কলার স্বাভাবিক উপাদান যেসব মৌল সেগুলোর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি যখন সম্ভব হল তখন বিজ্ঞানীরা এ ধরনের কলার রসায়ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করার এক চমৎকার হাতিয়ার পেলেন। (বিজ্ঞানের এই বিভাগটির নাম হল **প্রাণ-রসায়ন**।) ফন হেভ্‌সির গবেষণার এই অগ্রণী ভূমিকার জন্যে তিনি ১৯৪৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রাণ-রসায়নবিদদের হাতে এনে দিল এক আশ্চর্য উপকরণ। মানুষের শরীরে এবং অন্যান্য সব জীবদেহের সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে হাজার হাজার রাসায়নিক বিক্রিয়া। স্বভাবতই রসায়নবিদরা জানতে চান, এসব বিক্রিয়ার কথা। তাঁরা এসব বিক্রিয়ার সব রহস্য যদি বুঝতে পারতেন তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য আর ব্যাধি, জীবন, জরা আর মৃত্যুর বহু সমস্যার সমাধান করা যেত। কিন্তু এসব রহস্য ভেদ করা

যায় কি করে? এগুলো যে শুধু সব এক সঙ্গে ঘটে চলেছে তাই নয়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ঘটছে বিক্রিয়া, আবার একই অঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ঘটছে বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া।

এ যেন তুমি একই সঙ্গে দশ লক্ষ টেলিভিশন সেট চালিয়ে দেখবার চেষ্টা করছ ; প্রত্যেকটি সেটে চলছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আর প্রতিটি প্রোগ্রামই অনবরত বদলে যাচ্ছে।

এবার এই জটিল রহস্য সমাধানে সহায়তা পাওয়া গেল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের। দেহ কোন মৌলের আইসোটোপদের মধ্যেকার তফাত ধরতে পারে না। আমাদের খাবারদাবারের মধ্যে কার্বন-১২ (স্থায়ী) মৌলের সঙ্গে যদি কিছু থাকে কার্বন-১৪ (তেজস্ক্রিয়) তাহলে দেহ তাদের দেখবে একইভাবে।

তবে বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে তফাত করতে পারেন, কারণ কার্বন-১৪ থেকে বেরোয় বেটাকণিকা, আর কার্বন-১২ থেকে কিছুই বেরোয় না। এই বেটা কণিকাদের অনুসরণ করে কোন যৌগের ভেতরকার কার্বন ১৪-এর সন্ধান করা যায় নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। এই জন্যে এ ধরনের পরীক্ষায় কার্বন-১৪ বা আরো যেসব আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তাদের নাম দেওয়া হয়েছে **সন্ধানী**।

যেমন ধরা যাক, একটি ইঁদুরকে এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য খাওয়ানো হল যাতে কিছু কার্বন-১৪ পরমাণু রয়েছে। (আজকাল নানা উপায়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপযুক্ত রাসায়নিক বস্তু তৈরি হচ্ছে।) খানিক পরে ইঁদুরটিকে কষ্ট না দিয়ে মেরে ফেলে তার দেহকোষ পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাতে হয়তো কার্বন-১৪ যুক্ত কয়েকটি যৌগ পাওয়া গেল। এদের পরিচয় বের করা হয় ; কেননা ইঁদুরকে যে রাসায়নিক দ্রব্য খাওয়ানো হয়েছিল এগুলো নিশ্চয়ই তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

এমনি বহু পরীক্ষা থেকে (কার্বন-১৪ ছাড়া আরো নানা রকম আইসোটোপ ব্যবহার করে) জীবদেহের অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা জানা গিয়েছে। এ যেন জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে পথ বের করার মতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে এইভাবে। এ হল উদ্ভিদ যে বিক্রিয়ার সাহায্যে সূর্যের আলো বন্দী করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর পানিকে খাদ্যে পরিণত করে। এই **আলোক-সংশ্লেষণ**

বিক্রিয়াকে আয়ত্ত করা গেলে মানুষের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় এক বিপ্লব ঘটবে।

সন্ধানীর সাহায্যে আলোক-সংশ্লেষণের বিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে মার্কিন রসায়নবিদ মেলভিন ক্যালভিন (Melvin Calvin) ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার কাজেও ব্যবহার করা হয়। আয়োডিন মৌল এর একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের দেহে আয়োডিন অতি সামান্য মাত্রায় কাজে লাগে। এটা দেহের এমন এক হরমোন সৃষ্টিতে লাগে যা খাদ্য থেকে শক্তি সৃষ্টির হার নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের গলার ভেতর **থাইরয়েড গ্রন্থি** নামে এক কোষ আছে সেখানে এই হরমোন তৈরি হয়।

খাদ্য থেকে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন আয়ন বা যৌগ আমাদের দেহের রক্তস্রোতে মেশে। রক্তস্রোত একে পৌঁছে দেয় থাইরয়েড গ্রন্থিতে, সেখানে এই আয়োডিন আটকা পড়ে আর জমতে থাকে। থাইরয়েড স্থায়ী আয়োডিন আইসোটোপকে যেমন তেমনি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন আইসোটোপকেও আটকে ফেলে।

কখনো কখনো থাইরয়েড গ্রন্থি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ গ্রন্থির রোগাক্রান্ত অংশকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাজে লাগছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক বলে এদের জন্যে নানা বিশেষ ধরনের পরীক্ষাগার সৃষ্টি করা হয়েছে। দূর থেকে এদের নাড়াচাড়া করা যায় এ ধরনের বিভিন্ন ব্যবস্থার উদ্ভাবনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের যত রকম ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়েছে শুধু সে-সম্বন্ধে মোটা মোটা বই লেখা যেতে পারে। এর নতুন নতুন ব্যবহার আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কোবাল্ট ৫৯-কে নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করে সহজেই তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ আইসোটোপ পাওয়া যায়। কোবাল্ট-৬০ থেকে বেটাকণিকা এবং শক্তিশালী গামারশ্মি বেরোয়। কোবাল্ট ৬০-এর সরু সরু 'সুচ' তৈরি করে তার চারপাশে ধাতব ঢাকনা দিলে তাতে বেটাকণিকা আটকা পড়বে আর গামারশ্মিকে দেহে ক্যানসার রোগাক্রান্ত

banglainternet.com

কোষ ধ্বংস করার জন্যে ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য ক্যানসার এমন জায়গায় হওয়া চাই যেখানে এই সূচ বসানো যায়। আগে এজন্যে রেডিয়াম ব্যবহার করা হত ; কিন্তু রেডিয়ামের চেয়ে কোবাল্ট-৬০ বহুগুণে সস্তা আর এর ব্যবহার অনেক বেশি নিরাপদ।

ঘর্ষণ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানার জন্যেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাজে লাগে। যন্ত্রপাতির বিভিন্ন চলন্ত অংশ ঘর্ষণের জন্যেই ক্ষয়ে যায় আর এতে কলকারখানার বিরাট রকম লোকসান ঘটে। ধরা যাক, একটি ইস্পাতের তৈরি পিস্টন রিংকে নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করা হল যাতে সেটা তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। এবার মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের মতোই এই পিস্টন রিং-এর চার-পাশে একটি পিচ্ছিলযুক্ত পিস্টন খানিকক্ষণ ওঠা-নামা করানো হল। এতে পিস্টন-রিং-এর খানিকটা ইস্পাত ঘর্ষণের ফলে পিচ্ছিলক পদার্থে মিশে গেল। এই পিচ্ছিলকের তেজস্ক্রিয়া মেপে ঘর্ষণের ফলে কি হারে ইস্পাত ক্ষয়ে যাচ্ছে আর বিভিন্ন অবস্থায় এই হারে কি রকম কম-বেশি হয় তার খুব সূক্ষ্ম মাপ পাওয়া যেতে পারে।

কোন সঙ্কর ধাতুকে (অর্থাৎ যাতে বিভিন্ন ধাতুর মিশেল আছে) যখন নিউট্রন প্রভৃতি মৌল-কণিকা দিয়ে আঘাত করা হয় তখন ধাতুর কিছু কিছু পরমাণু নিজের জায়গা থেকে নড়ে যায়। এতে সেই সঙ্করের গুণাগুণ, সাময়িকভাবে হলেও বদলে যায়। এমন সময় আসতে পারে, যখন নির্দিষ্ট গুণাগুণের সঙ্কর তৈরি হবে শুধু পরিমাণমতো নানা ধাতু মিশিয়ে নয়, তার সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিকিরণ যোগ করে।

মৌল চেনার জন্যেও নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করার দরকার হতে পারে। মনে কর, একটি অজানা বস্তুখণ্ডকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হল। বস্তুখণ্ডে যেসব বিভিন্ন মৌল রয়েছে তারা নিউট্রন শোষণ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হয়। প্রতিটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এক নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর নির্দিষ্ট তীব্রতার গামারশ্মি বিকিরণ করে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অতি সামান্য পরিমাণ বস্তুতেও বিভিন্ন মৌলের পরিচয় আর পরিমাণ বের করতে পারেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **নিউট্রন-সক্রিয়ন-বিশ্লেষণ**।

বিকিরণের সাহায্যে ক্ষতিকর পোকামাকড়কে বন্ধ্যা করে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করা যায়। তাছাড়া এর সাহায্যে উদ্ভিদের গুণাগুণে পরিবর্তন ঘটিয়ে

বংশ পরম্পরায় তাদের জাত বদলে দেওয়া যায়। এমনিভাবে বদলে যাওয়া কোন জাত হয়তো বেশি শীত সহ্য করতে পারে, কোনটা পারে অনাবৃষ্টি সহ্য করতে বা রোগ প্রতিরোধ করতে। এমনি আরো নানা উপায়ে বিকিরণের সহায়তায় কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্বের খাদ্যসম্ভার বাড়ানো যাবে।

এ বইতে আগে এক জায়গায় বলা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে নভোরশ্মির প্রভাবে কার্বন-১৪ সৃষ্টি হয়। এই আইসোটোপটির একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি জীবকোষেই কার্বন রয়েছে ; স্বভাবতই এই কার্বনের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কার্বন ১৪-ও রয়েছে। মৃত জীব কিন্তু তার দেহে আর নতুন কার্বন-১৪ গ্রহণ করে না। তার দেহে আগে যে কার্বন-১৪ ছিল তাও ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে থাকে। ঠিক কি হারে কার্বন-১৪ ভেঙে পড়ে তা বিজ্ঞানীদের জানা আছে ; কাজেই মৃতদেহে অবশিষ্ট কার্বন ১৪-এর পরিমাণ মেপে বিজ্ঞানীরা কতদিন আগে এর মৃত্যু ঘটেছে তা বের করতে পারেন। মিসরীয় পিরামিডের পুরনো কাঠ, পুরনো কবর খুঁড়ে পাওয়া কাপড়ের টুকরো, এমনি ১,০০০ থেকে ৩০,০০০ বছরের পুরনো নানা জিনিসের বয়স এভাবে ভালমতোই মাপা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধ-তির সহায্যে পুরাতত্ত্ব মানুষের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে নানা দরকারি কথা আবিষ্কার করেছে। যেমন, রেড ইণ্ডিয়ানরা ঠিক কোন্ সময়ে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম বসত করেছিল তার কথা এই উপায়ে মাত্র অল্পদিন আগে স্থির করা হয়েছে।

এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন মার্কিন রসায়নবিদ উইলার্ড ফ্রিবি (Willard Frank Libby) ১৯৪৭ সালে ; এর জন্য ১৯৬০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

আইসোটোপের মারণক্ষমতার যে প্রচণ্ড বিপদের কথা এর আগের অধ্যায়ে বলেছি, তাও এক কাজে লাগানো হয়েছে। আসলে গামারশ্মি আর অতি শক্তিশালী কণিকা তো শুধু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, অন্যান্য প্রাণীদের জন্যেও ক্ষতিকর। যেমন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যাক্টিরিয়া জাতের জীবাণুর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

তাহলে খাদ্যদ্রব্যে যদি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করা যায় তাহলে এর ভেতরকার ব্যাক্টিরিয়া এবং অন্যান্য অতিসূক্ষ্ম সব প্রাণী সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। এই খাদ্যদ্রব্য তখন হবে **জীবাণুমুক্ত**। এভাবে জীবাণুমুক্ত রাখলে খাদ্যদ্রব্য পচবে না, কিংবা তার রঙ বা স্বাদের কোন পরিবর্তন হবে না। অবশ্য খাদ্য-

banglainternet.com

দ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত করার অন্য উপায়ও রয়েছে। একটি সাধারণ পদ্ধতি হল নির্দিষ্ট সময় ধরে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর খাদ্যবস্তুকে টিনজাত করা। এই পদ্ধতির একটা অসুবিধে হল ফোটাবার ফলে জীবাণু মারা যায় বটে, কিন্তু সাথে সাথে খাদ্যের স্বাদও বদলে যায়।

খাদ্যদ্রব্যকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে রক্ষা করার জন্যে এবং টাট্‌কা খাদ্যের সবটুকু স্বাদ ধরে রাখার জন্যে মনে হয় তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণই একমাত্র উপায়।

তাহলে দেখলে কত রকম উপায়ে শান্তির কাজে পরমাণুকে ব্যবহার করা যায়। এখানে আইসোটোপের যেসব ব্যবহার বর্ণনা করা হয়েছে সে হলঃ

(১) রাসায়নিক ও প্রাণ-রাসায়নিক গবেষণা
(২) চিকিৎসা
(৩) কল-কারখানা
(৪) কৃষি
(৫) পুরাতত্ত্ব
(৬) গার্হস্থ অর্থনীতি।

এতেই কিন্তু শেষ নয়। আইসোটোপ ক্রমেই যত সস্তায় আর ব্যাপক আকারে পাওয়া যাবে, মানুষ ততই তাদের নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করবে ; এমনও হতে পারে যে, একদিন আইসোটোপ বিদ্যুতের মতোই ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হবে। আসলে কিন্তু আমি পরমাণুর সবচেয়ে বড় শান্তিকালীন ব্যবহারের কথা এখনও বলিনি—সে হল, পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদন।

প্রচুর শক্তি

শক্তির অপচয় হতে পারে। কোন কাজ না করে শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট হতে পারে। আবার বাধার বিরুদ্ধে কোন কিছু সরিয়ে শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাধ্যাকর্ষের বিরুদ্ধে কোন জিনিস ওপরে টেনে তুলে শক্তিকে কাজে লাগানো যায় ; কিংবা কাজে লাগানো যায় মাটির বাধার বিরুদ্ধে কোন জিনিস মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে। এর সাহায্যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক আয়নদের তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে সঞ্চয়ী ব্যাটারিতে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরিতে ঢোকানো যায়।

শক্তি যখন এসব বা এ ধরনের আর কিছু ঘটায় তখন বলা হয় শক্তি **কাজে** পরিণত হল। যে হারে কাজ করা হয় তাকে বলে **ক্ষমতা**।

কলকারখানা বেশির ভাগ ক্ষমতা পায় কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া শক্তি থেকে। জাহাজ আর রেল-ইঞ্জিনেও আগে কয়লা পোড়ানো হত, কিন্তু আজ-কাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্বালানী তেল পোড়ানো হয়। মোটর-গাড়ি আর উড়োজাহাজ, আমরা সবাই জানি, পেট্রল বা এই জাতীয় তেল পোড়ায়। পড়ন্ত পানির প্রবাহকে কাজে লাগিয়েও শক্তি পাওয়া যায়।

এমন কি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণকেও শুধু ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে। বিস্ফোরণের সাহায্যে নতুন বন্দর স্থাপন করা যেতে পারে, নদীর পথ পরিবর্তন করা যায়, পাহাড়ের ভেতর তৈরি করা যায় সুড়ঙ্গ। মাটির গভীর তলার স্তর ভেঙে দিয়ে তেল এবং অন্যান্য খনিজের নতুন উৎস পাওয়া যেতে পারে। বিস্ফোরণের ফলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হবে তার সাহায্যে জানা যাবে পৃথিবীর ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য।

এ-সবের কোনটিই আজো বাস্তবে পরিণত হয়নি, তবে পারমাণবিক ক্রিয়াকরের শক্তিকে ইতিমধ্যে শান্তির কাজে লাগানো হয়েছে ; মানুষ **পরমাণু-শক্তিকে** উৎপাদনের কাজে লাগাতে শুরু করেছে।

১৯৫৫ সালে প্রথম পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন **নটিলাস** চালু করা হয়েছে। নটিলাসে রয়েছে একটি পারমাণবিক ক্রিয়াকর। এতে তাপের আকারে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা দিয়ে পানি ফোটানো হয়। এই ফুটন্ত পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে একটি টারবাইনকে ঘোরায়, তারপর পানিতে পরিণত হয়ে আবার ফুটতে শুরু করে। ঘুরন্ত টারবাইন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। এই বিদ্যুৎ এবার সাবমেরিনের ইঞ্জিন এবং তার ওপরকার সব রকম যন্ত্রপাতি চালায়।

মার্কিন নৌবহরে দ্বিতীয় পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন **সী-উল্‌ফ্‌** যোগ করা হয় ১৯৫৬ সালে। তারপর থেকে এ রকম সাবমেরিনের সংখ্যা এক শ'র ওপরে উঠেছে।

পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন অনির্দিষ্ট কাল ধরে পানির তলায়

banglainternet.com

থাকতে পারে। এর এই বিশেষ ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পায় ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে যখন নটিলাস আগাগোড়া বরফের তলায় থেকে উত্তর মেরু এলাকা দিয়ে উত্তর মহাসাগর পাড়ি দেয়। একই বছর সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে সী-উল্‌ফ্‌ পুরো ৬০ দিন পানির তলায় কাটায়। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে এই সাবমেরিনটি উত্তর মেরুতে ভেসে ওঠে।

বোধহয় সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি দেখিয়েছে ট্রাইটন—এই বই লেখার সময় পর্যন্ত এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সাবমেরিন আর শুধু এতেই রয়েছে দুটি পারমাণবিক ক্রিয়াকর। সাড়ে চার শ' বছর আগে ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান যে পথে পৃথিবীর চারপাশে সমুদ্রযাত্রা করেন ঠিক সেই পথে পানির তলা দিয়ে এই সাবমেরিনটি পৃথিবীর চারপাশ ঘুরে আসে। ম্যাজেলানের জাহাজের এই পথ অতিক্রম করতে লেগেছিল তিন বছর ; ট্রাইটনের লাগে মাত্র তিন মাস।

মার্কিন নৌবহরের পানির ওপর দিয়ে চলার মতো তিনটি পরমাণু শক্তিচালিত জাহাজও রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল **এন্‌টারপ্রাইজ**—বিমানবাহী এই জাহাজটি চালু করা হয় ১৯৬১ সালে। এই জাহাজটির পানি অপসারণ-ক্ষমতা ৮৫,০০০ টন, এতে রয়েছে আটটি পরমাণবিক ক্রিয়াকর ; এত বড় জাহাজ এর আগে আর কখনো তৈরি হয়নি। 'সাভানা' নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজও পরমাণুশক্তিতে চলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন হল অন্য একমাত্র দেশ যার পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন এবং অন্য জাহাজ রয়েছে ; তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছে বেশি।

অবশ্য পরমাণু-শক্তির ব্যাপারে কতকগুলো অসুবিধেও রয়েছে। প্রথমত পারমাণবিক ক্রিয়াকর হওয়া চাই আকারে রীতিমতো বড় ; তা নইলে ইউরেনিয়াম হবে সীমান্তিক আকারের চেয়ে পরিমাণে কম। তাছাড়া মন্থরকও অনেকটা জায়গা নেয়। ইউরেনিয়াম আর মন্থরক ছাড়া আধার রয়েছে কংক্রিট বা আর কিছুর **নিরাপত্তা-আবরণ**। (কংক্রিটে রয়েছে সব হালকা পরমাণু ; তাই আবরক হিসেবে সীসার চেয়ে এর দক্ষতা অনেক কম—এজন্যে কংক্রিটকে করতে হয় অনেক বেশি পুরু। তবে ধাতুর তুলনায় কংক্রিটের দাম অনেক কম বলে সচরাচর পারমাণবিক ক্রিয়াকরের চারপাশে কংক্রিটের আবরণ ব্যবহার করা হয়।) এই আবরণের ফলে ক্রিয়াকর থেকে অনবরত যেসব বিকিরণ এবং মৌলকণিকার বিচ্ছুরণ ঘটছে তা থেকে মানুষ রক্ষা পায়। এতে অবশ্য

ক্রিয়াকরের আয়তন এবং ভর বাড়ে। তার ফলে কোন কোনটা হয়ে দাঁড়ায় পাঁচ তলা দালানের সমান বড়।

তাহলে বুঝতে পারছ, সাবমেরিন, জাহাজ কিংবা হয়তো বড় আকারের উড়োজাহাজে পারমাণবিক ক্রিয়াকর বসানো সম্ভব হলেও ছোট যানবাহনে মোটেই সম্ভব নয়। আজ আমরা যতদূর বুঝতে পারছি, পরমাণু শক্তি-চালিত মোটর-গাড়ি তৈরি সম্ভব হবে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পরমাণু শক্তিচালিত নভোযান তৈরি হবে।

তার ওপর রয়েছে পরমাণু-বিভাজনের ফলে ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন নানা অপবস্তুর সমস্যা। এসব কোন কোন অপবস্তু প্রচুর নিউট্রন শুষে নেয়। এগুলোকে জমে উঠতে দিলে এরা এত নিউট্রন শুষে নেবে যে, পরমাণু-বিভাজন বিক্রিয়াই যাবে থেমে। (এ যেন ছাই জমে আগুন নিভে যাওয়ার মতো অবস্থা।) এই জন্যে আজকাল আর সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পাঁজার আকারে ক্রিয়াকর তৈরি করা হয় না। তার বদলে ইউরেনিয়ামকে চোঙের আকারে তৈরি করে মন্থরকের গায়ে ফুটোর ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরমাণু-বিভাজনের অপবস্তু যখন জমে ওঠে, তখন ইউরেনিয়ামের চোঙগুলো টেনে বের করে শোধন করার পর নতুন চোঙ তৈরি করে তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ-সবই ঘটে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়।

এছাড়া তেজস্ক্রিয় বিভাজনের অপবস্তুগুলো মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয় ; তাই মানুষের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে এদের দূরে কোথাও পুঁতে ফেলা দরকার। যদি এমন দিন আসে, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে থাকবে অসংখ্য পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, তখন হয়তো সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়াবে কি করে তেজস্ক্রিয় 'ভস্ম' বা **পারমাণবিক আবর্জনা** নিরাপদে দূর করা যায়।

এসব পারমাণবিক আবর্জনা অব্যবহৃত নুনের খনিতে বা পাহাড়ের গভীর স্তরে গর্ত খুঁড়ে চাপা দেওয়া যায় কিনা, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। হয়তো এদের পুরু কাচ বা চীনামাটির পাত্রে গালিয়ে বন্দী করে গভীর সমুদ্রের তলায় ফেলে দেওয়া যাবে।

আরেক দিক থেকে দেখলে, পারমাণবিক আবর্জনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি থেকে যায়। এই আবর্জনার সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহে শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে। হয়তো কোনদিন এ থেকে বিদ্যুৎও তৈরি করা যাবে। চাই কি, হয়তো এই শক্তিতে কোনদিন মোটর-গাড়িও চালানো যেতে পারে। ইউরে-

banglainternet.com

নিয়াম-পরবর্তী আইসোটোপ, যেমন কুরীয়াম-২৪২ বা সেই মারাত্মক স্ট্রনশিয়াম-৯০ এই শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজেই মানুষের সৃষ্টি এসব কৃত্রিম মৌলও একদিন মানুষের দাস হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আরো জ্বালানি

পরমাণু-শক্তি ব্যাপক আকারে ব্যবহার করার জন্যে যে জিনিসটা বিশেষ করে দরকার সে হল ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম তেমন দুষ্প্রাপ্য ধাতু নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভূত্বকে ইউরনিয়াম রয়েছে তামার চেয়ে বেশি ; আর তামা তো আমরা সারা জীবনে কতই দেখছি। তবে ইউরেনিয়াম কোথাও এক সাথে বেশি পরিমাণে জমা নেই ; প্রায় সমানভাবে ছড়ানো আছে সবখানে।

এটা আফসোসের ব্যাপার যে, হাজারটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে মাত্র সাতটায় পরমাণু-বিভাজন ঘটানো যায়। তোমাদের হয়তো মনে পড়বে, প্রতি এক হাজার ইউরেনিয়াম পরমাণুতে সাতটা হল ইউরেনিয়াম-২৩৫। অবশ্য এ সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ধীরগতি নিউট্রন আঘাত করলে ইউরেনিয়াম-২৩৮ ভাঙে না বটে, তবে নিউট্রনটি শুষে নিয়ে হয়ে দাঁড়ায় ইউরেনিয়াম-২৩৯। দুটি বেটাকণিকা হারিয়ে ইউরেনিয়াম-২৩৯ প্রথমে হয় নেপচুনিয়াম-২৩৯, তারপর হয় প্লুটোনিয়াম-২৩৯। আর এই প্লুটোনিয়াম ২৩৯-এর পরমাণু-বিভাজন ঘটে!

তাহলে এমন এক পারমাণবিক ক্রিয়াকর তৈরি করা সম্ভব যাতে কিছু নিউট্রন পরমাণু-বিভাজন চালু রাখবে, আর কিছু নিউট্রন ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরি করবে। এই ক্রিয়াকর যতটা পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি জ্বালানি তৈরি করে। এ যেন নিত্য নতুন জ্বালানির জন্ম দেয়। এ ধরনের ক্রিয়াকরকে বলা হয় **পুনর্জন্মদায়ী ক্রিয়াকর**। থোরিয়াম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এ রকম পুনর্জন্মদায়ী ক্রিয়াকর তৈরি করা হয়েছে। এতে মানুষের পারমাণবিক জ্বালানির পরিমাণ গিয়েছে আরো বেড়ে। এই ক্রিয়াকরে থোরিয়ামের স্বাভাবিক আইসোটোপ থোরিয়াম ২৩২-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সৃষ্টি হয় ইউরেনিয়াম-২৩৩ ; ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর মতো ইউরেনিয়াম ২৩৩-এও পরমাণু-বিভাজন ঘটে।

এভাবে যে বিপুল পরিমাণ প্লুটোনিয়াম তৈরি হবে তা হয়তো ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বদলে পারমাণবিক বোমায় ব্যবহৃত হবে। শুধু প্লুটোনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এ রকম পারমাণবিক ক্রিয়াকরও তৈরি হয়েছে। এর জন্যে মন্থরকের দরকার হয় না ; দ্রুতগামী নিউট্রনেই এর কাজ চলে। তাই একে বলা হয় **দ্রুত ক্রিয়াকর**।

ভবিষ্যতের দিকে

এমন যেন আমরা না ভাবি যে, আগামী মাসে বা আগামী বছর বা আগামী দশকেই সারা দুনিয়া পরমাণু-শক্তিতে চলবে।

আজকাল আমরা যে হারে পেট্রল ব্যবহার করছি, সে হার বজায় থাকলে ২০০০ সাল আসতে আসতে দুনিয়ার সব পেট্রল হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ শক্তির একটা বড় রকম উৎস যাবে সম্পূর্ণ ফুরিয়ে। তবে পৃথিবীতে কয়লার ভাণ্ডার আরো কয়েক হাজার বছর ধরে চলতে পারে। আর মাত্র এক আউন্স ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে দুলক্ষ টন কয়লার সমান শক্তি পাওয়া গেলেও কয়লার কতকগুলো বিশেষ সুবিধে রয়েছে।

কয়লা ইউরেনিয়ামের তুলনায় পাওয়া যায় অনেক বেশি পরিমাণে ; একে নাড়াচাড়া করতেও অনেক সুবিধে। ছোটখাট আকারের কয়লার আগুন তৈরি করা যায়, কিন্তু ছোটখাট পারমাণবিক ক্রিয়াকর তৈরি করা যায় না (অন্তত এখনো নয়)। সবচেয়ে বড় কথা হল, কয়লা বা তার ছাই তেজস্ক্রিয় নয়। পারমাণবিক ক্রিয়াকরকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করার বিপদ দেখা গিয়েছে কানাডা আর গ্রেট ব্রিটেনে—দুর্ঘটনার ফলে চারপাশের অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ায়। এসব দুর্ঘটনা খুব মারাত্মক হয়নি, কিন্তু হতেও পারত। এতেই গভীর সতর্কতার প্রয়োজন বোঝা যায়। (অবশ্য কয়লা খনিতে আর তেলখনির বিস্ফোরণেও মানুষ মারা গিয়েছে! মানুষ চিরদিনই বেঁচেছে বিপদকে সঙ্গী করে।)

কাজেই খুব সম্ভব পরমাণুশক্তি কয়লার শক্তি বা জলপ্রপাতের শক্তির জায়গা পুরোপুরি দখল করতে পারবে না। তার বদলে এটা হবে চিরাচরিত সব শক্তির উৎসের পরিপূরক। পরমাণুশক্তি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হবে এমন সব এলাকায় যেখানে জলপ্রপাতও নেই আর কাছাকাছি কয়লাও পাওয়া যায় না।

এর সূত্রপাত ইতিমধ্যেই ঘটেছে। পারমাণবিক ক্রিয়াকর থেকে দৈনন্দিন

banglainternet.com

ব্যবহারের জন্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রথম ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে সে দেশে ৫০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ছোট পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু হয়েছে।

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে চালু হয় গ্রেট ব্রিটেনে 'ক্যাল্ডার হল' শক্তিকেন্দ্র। এর পারমাণবিক ক্রিয়াকরের ক্ষমতা হল ৯০,০০০ কিলোওয়াটের ওপরে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এল তৃতীয় স্থানে। ১৯৫৮ সালের ২৬শে মে তারিখে বেসামরিক ব্যবহারের জন্যে পেনসিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের শিপিংপোর্টে একটি পারমাণবিক ক্রিয়াকর চালু করল ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানী ; এর ক্ষমতা ৬০,০০০ কিলোওয়াট। ১৯৬০ সালে আরো দুটি ক্রিয়াকর চালু হল—একটি ইলিনয়-এ, অন্যটি ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ, যথাক্রমে ১৮০,০০০ কিলোওয়াট আর ১১০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট পরমাণু শক্তিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ১৮,০০,০০০ কিলোওয়াট।

তবে, পরমাণু-বিভাজনের ভিত্তিতে তৈরি শক্তিকেন্দ্রই সব নয়। হাইড্রোজেন পরমাণু-সংযোজন থেকে এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তি পাওয়া যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর গ্রেট ব্রিটেন এই তিন দেশেই ব্যাপক আকারে চেষ্টা চলছে হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে বশ করে তাকে কি করে শান্তির কাজে লাগানো যায়।

পরমাণু-বিভাজন ভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রের তুলনায় পরমাণু সংযোজন-ভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রের অনেকগুলো সুবিধে রয়েছে। এতে জ্বালানি হবে ডয়টেরিয়াম। মাত্র এক পাউন্ড ডয়টেরিয়াম থেকে পাওয়া যাবে চার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি ; আর সমুদ্রের পানিতে যে পরিমাণ ডয়টেরিয়াম আছে তাতে কয়েক শ' কোটি বছর চলে যাবে। অবশ্য পানিতে প্রতি ৫,০০০টি সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে রয়েছে মাত্র একটি ডয়টেরিয়াম পরমাণু। তবু এক গ্যালন পানিতে যেটুকু ডয়টেরিয়াম আছে তাতে ৩০০ গ্যালন পেট্রলের সমান শক্তি পাওয়া যাবে।

পরমাণু-সংযোজনের ফলে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি হবে না, কাজেই তেজস্ক্রিয় ভস্মের সমস্যাও দেখা দেবে না। তাছাড়া এমন মনে করবার কারণ রয়েছে যে, পরমাণু-বিভাজন ভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রে যদিওবা বিস্ফোরণ

ঘটতে পারে, পরমাণু-সংযোজনভিত্তিক শক্তিকেন্দ্রে কখনো বিস্ফোরণ ঘটবে না।

তবে পরমাণু-সংযোজনের ভিত্তিতে ব্যবহারিক শক্তিকেন্দ্র তৈরি করতে হলে কেন্দ্রটি যেন গলে না যায়, সেজন্যে বহু কোটি ডিগ্রী তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চাই। এমন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বস্তুর পরমাণু ভেঙে পরমাণুকেন্দ্র আর ইলেকট্রনের মিশেল তৈরি হয়। এ ধরনের মিশেলকে বলা হয় **প্লাজমা**। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র এমনি প্লাজমা দিয়ে তৈরি।

প্লাজমার উপাদান হল আধানযুক্ত কণিকা ; কাজেই তীব্র চৌম্বক-ক্ষেত্রের সাহায্যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা আজো এমন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যাতে প্লাজমা চৌম্বকক্ষেত্রে যেসব পাত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে তাদের গায়ে না লেগে যায়। চৌম্বক শক্তিতে প্লাজমাকে সংকুচিত করে পাত্রের গা থেকে দূরে রাখা হয় বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় **সংকোচন প্রভাব**।

প্লাজমা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা যেসব যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন তাদের একটির নাম হল 'পারহ্যাপ্‌সাট্রন' ; আরেকটির নাম 'স্টেলা-রেটর'। প্রথম কথাটির অর্থ 'এটা হয়তো সফল হবে' ; দ্বিতীয়টির অর্থ 'এতে নক্ষত্রের বুকের মতো তাপ সৃষ্টি হবে'।

এ ব্যাপারে আরেক পদ্ধতিতে নলের দুমাথায় এমন প্রচণ্ড চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, যাতে প্লাজমা দুমাথা থেকে ঠেলা খেয়ে সরে যায়, কিছুতেই আর নল থেকে বেরোতে না পারে। একে বলা হয় **চৌম্বক দর্পণ**। ১৯৬০ সালের পর বিজ্ঞানীরা ৬,০০,০০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পেরেছেন, আর প্লাজমাকে আবদ্ধ রেখেছেন এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত। অগ্রগতি ঘটছে অতি ধীরে, কিন্তু তবু মানুষ এগোচ্ছে।

এদিকে পরমাণু-সংযোজন সম্পর্কিত গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। প্লাজমার সাহায্যে এমন শিখার সৃষ্টি হয়েছে যা শব্দহীন অথচ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে ৩০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ; কলকারখানার কাজে যে কোন রাসায়নিক শিখার চেয়ে এই শিখা বহুগুণ দক্ষতাসম্পন্ন।

পরমাণুশক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের চোখ যেমন করে খুলে দিয়েছে মানুষের সমগ্র ইতিহাসে এমন আর কোন কিছুই

banglainternet.com

পারেনি। গত দু'শ' বছরে মানুষ দেখেছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, রেডিও, সবাক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন—সমগ্র যন্ত্রসভ্যতার যুগ। কিন্তু এর কোনটাই ১৯৩৯ সালের পর পরমাণুশক্তির সাহায্যে মানুষ যা করেছে তার মতো এমন অবিশ্বাস্য আর বিস্ময়কর নয়।

মানুষের মনে আজ জন্মেছে এক বিপুল আত্মবিশ্বাস ঃ শুধু নিজেকে যদি সে জয় করতে পারে তাহলে জয় করতে পারবে সারা বিশ্বকে ; এমন আত্মবিশ্বাস এর আগে আর কখনো দেখা দেয়নি।

মাত্র কয়েক বছর আগেও কল্পনাভিত্তিক বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখকরা (বর্তমান লেখকসহ) যখন পরমাণুশক্তি আর মহাশূন্যে অভিযানের কথা লিখতেন তখন লোকে তাঁদের যেন খানিকটা উদ্ভট বলে মনে করত। আজ পরমাণুশক্তি রীতিমতো বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর যন্ত্রকুশলীরা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি এবং চাঁদে রকেটযান পাঠাবার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো খুব শীগগিরই এই বইয়ের পাঠকরা নভোচারীর পোশাক পরা চাঁদের বিরান বুকে দাঁড়ানো নতুন এক কলম্বাসের দেখা পাবেন [১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে মানুষ সত্যি সত্যি চাঁদের বুকে নেমেছে—অনুবাদক]।

করলা আর ইউরেনিয়াম দুই-ই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে রয়েছে হাইড্রোজেনের পরমাণু-সংযোজন থেকে কিংবা সরাসরি সূর্যের শক্তি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা।

এ বইয়ের গোড়ার দিকে বলেছিলাম, সূর্য হল বিশাল এক হাইড্রোজেন বোমা, প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে অবিশ্বাস্য পরিমাণ শক্তি। এই শক্তি সে ছড়াতে থাকবে কয়েক শ' কোটি বছর ধরে আর তার যে অতি সামান্য ভগ্নাংশ আমাদের পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে তাতেই আমাদের শক্তির প্রয়োজন মিটবে প্রায় চিরকাল।

মানুষ যদি কেবল পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে নিজেরই ধ্বংস ডেকে না আনে তাহলে তার সামনে দেখা যাবে প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনা ঃ অফুরন্ত শক্তি, নতুন নতুন জগৎ, বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিত্য নতুন জ্ঞান।

শুধু যদি আমাদের জানা জ্ঞানকে আমরা বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগাতে পারি...

banglainternet.com

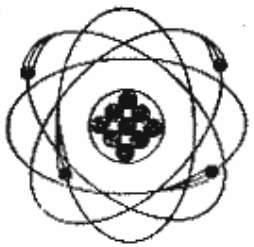

পারিভাষিক শব্দ

অণু — molecule
অণুবীক্ষণ — microscope
অতিবেগনি রশ্মি — ultraviolet rays
অতিপারমাণবিক কণিকা — sub-atomic particle
অতিশক্তিশালী বিকিরণ — energetic radiation
অনির্দিষ্ট গতি — random motion
অনিশ্চয়তাবাদ — uncertainty principle
অন্তরক — insulator
অর্ধজীবনকাল — half-life
অস্থায়ী পরমাণুকেন্দ্র — unstable nucleus
আনোড (ধনমেরু) — anode
আম্বার — amber
অ্যাসফল্ট — asphalt

অ্যাসটাটিন — astatine
আইসোটোপ (সমস্থানিক) — isotope
আইসোবার (সমপ্রেষ) — isobar
আধান — charge (n.)
আধান যোগ — charge (v.)
আধান ত্যাগ — discharge
আপেক্ষিক-তত্ত্ব — theory of relativity
আমেরিসিয়াম — americium
আল্‌ফা কণিকা (রশ্মি) — alpha particle (rays)
আলোক-কণিকা — photon
আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া — photoelectric effect
আলোক-সংশ্লেষণ — photosynthesis
আয়ন — ion
আয়নিত — ionized
আয়নসৃষ্টিকারী বিকিরণ — ionizing radiation
আয়োডিন — iodine
ইউরেনিয়াম-পরবর্তী (মৌল) — transuranian (elements)
ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড — uranium hexfluoride
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ — electron microscope
ইলেকট্রন খোলস — electron shell
ইলেকট্রন নিউট্রিনো — electron-neutrino
ইলেকট্রন-উল্টা-নিউট্রিনো — electron-anti-neutrino
ইলেকট্রো স্ট্যাটিক জেনারেটর — electro static generator
ইলেকট্রন ভোল্ট — electron-volts
উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভব — high electric potential
উত্তেজিত রূপ — excited state
উদাসীন (নিরপেক্ষ) — neutral
উন্নত ইউরেনিয়াম — enriched uranium
উল্টা ইলেকট্রন — anti-electron
উল্টা-কণিকা — anti-particle
উল্টা-নিউট্রিনো — anti-neutrino
উল্টা-পদার্থ — anti-matter

উল্টা-পরমাণু — anti-atom
উল্টা-প্রোটন — anti-proton
এন্‌টার প্রাইজ — enterprise
ওমেগা মাইনাস — omega minus
ক্যাডমিয়াম — cadmium
কসমোট্রন — cosmotron
কক্ষীয় ইলেকট্রন — planetary electrons
কণাদীপ্তি — scintillation
কণিকা-ত্বরক — particle accelerator
কুরী — curies
কলা (দেহকলা) — tissue
ক্যাথোড (ঋণমেরু) — cathode
ক্যাথোড রশ্মি — cathode rays
ক্যালিফোর্নিয়াম — californium
কাজ — work
কারবন-১৪ — carbon-14
কিমিয়া — alchemy
কুরীয়াম — curium
কে-গ্রাস — k-capture
কোষশ্রেণী (ব্যাটারি) — battery
কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া — artificial radioactivity
ক্রিয়াকর (পারমাণবিক) — reactor (atomic, nuclear)
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া — interaction
ক্ষমতা — power
খমির — yeast
গণক-নল — counter
গাইগার কাউন্টার — geiger counter
গামা রশ্মি — gamma rays
গালা — sealing wax
গুচ্ছকণিকা — quantum, quanta
গুচ্ছকণিকা-বলবিদ্যা — quantum mechanics
গৌণ বিকিরণ — secondary radiation

banglainternet.com

চ্যানেল রশ্মি — channel rays
চৌম্বক দর্পণ — magnetic mirror
জীবাণুমুক্ত — sterile
জোড়-সৃষ্টি — pair formation
টেকনেটিয়াম — tecnetium
ট্রাইটন — triton
ট্রাইটিয়াম — tritium
ট্রালফিয়াম — tralphium
ডয়টেরন — deuteron
ডয়টেরিয়াম — deuterium
তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ — electromagnetic radiation
তাপ — heat
তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া — thermonuclear reaction
তাপ-বাতি — heat lamp
তাপীয় নিউট্রন — thermal neutron
তারকাপুঞ্জ — galaxies
তেজস্ক্রিয় স্থিতিশীলতা — radioactive equilibrium
তেজস্ক্রিয় শ্রেণী — radioactive series
তেজস্ক্রিয়া — radioactivity
ত্বরণ — accelerated
ত্বরণযুক্ত কণিকা — accelerated particles
থাইরয়েড গ্রন্থি — thyroid gland
দ্রুত ক্রিয়াকর — fast reactor
নটিলাস — nautilus
নভোরশ্মি — cosmic rays
নিউট্রন — neutron
নিউট্রন-সক্রিয়ন-বিশ্লেষণ — neutron activation analysis
নিউট্রিনো — neutrino
নিরপেক্ষ (উদাসীন) — neutral
নিরাপত্তা আবরণ — shielding
নির্দিষ্ট গতি — directed motion
নিষ্ক্রিয় মৌল — inert element

নেপচুনিয়াম — neptunium
নোবেলিয়াম — nobelium
পজিট্রন — positron
পজিট্রনিয়াম — positronium
পরমাণু — atom
পরমাণুকেন্দ্র — atomic nucleus
পরমাণুকেন্দ্রের শক্তি — nuclear energy
পরমাণু-তত্ত্ব — atomic theory
পরমাণু-বিভাজন — fission
পরমাণুশক্তি — atomic energy
পরমাণু-শক্তি — atomic-power
পরমাণু-সংযোজন — fusion
পরমাণুর রূপান্তর — transmutation
পরিবাহী — conductor
পর্যাবৃত্ত ছক — periodic table
পারমাণবিক আবর্জনা — atomic wastes
পারমাণবিক বল — nuclear force
পারমাণবিক বিক্রিয়া — nuclear reaction
পারমাণবিক ক্রিয়াকর — nuclear reactor
পারমাণবিক সমরূপী — nuclear isomer
পারমাণবিক সংখ্যা — atomic number
পাঁজা (পারমাণবিক) — pile (atomic)
পারস্পরিক বিনাশ — mutual annihilation
পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া — background radiation
পুনর্জন্মদায়ী ক্রিয়াকর — regenerative reactor
প্লুটোনিয়াম — plutonium
প্রতিপ্রভা — fluorescence
প্রতিসাম্যের নিত্যতা — conservation of symmetry
প্রমেথিয়াম — promithium
প্রস্থচ্ছেদ — cross-section
প্রাথমিক বিকিরণ — primary radiation
প্রাণ রসায়ন — biochemistry

banglainternet.com

প্রোটন — proton
প্রোটন সিনক্রোটন — proton synchrotron
প্রোটিয়াম — protium
প্লবতা — buoyancy
প্লাজমা — plasma
ফসফরাস — phosphorus
ফার্মিয়াম — farmium
বন্ধ্য — sterile
বস্তু ও শক্তির নিত্যতা — conservation of matter-energy
বস্তুর নিত্যতা — conservation of matter
বায়ুশূন্য — vacuum
বায়ুশূন্য কাচনল — vacuum tube
বার্কেলিয়াম — berkelium
বেভাট্রন — bevatron
বেরিয়ন — baryono
বিকিরণ — radiation
বিকিরণজনিত অসুস্থতা — radiation sickness
বিক্রিয়া (রাসায়নিক) — reaction (chemical)
বিদ্যুৎবীক্ষণ — electroscope
বিধ্বস্ত বস্তু — collapsed matter
বিভব — potential
বিভব গুণক — voltage multiplier
বুদবুদ-কক্ষ — bubble chamber
বেটা কণিকা (রশ্মি) — beta particle (rays)
বেতার তরঙ্গ — radio wave
বেটাট্রন — betatron
বৈদ্যুতিক বিভব — electric potential
ব্রোঞ্জ — bronze
বোরন-১০ — boron-10
ভর — mass
ভরবর্ণালী লেখ — mass spectrograph
ভরসংখ্যা — mass number

ভস্মবর্ষণ — fallout
ভারি পানি — heavy water
ভারি হাইড্রোজেন — heavy hydrogen
ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট — manhattan engineering District
মাইক্রো কুরী — micro curies
মলিবডেনাম — molybdenum
মন্থরক — moderator
মাধ্যাকর্ষ — gravity
মাপক — scaler
মিউনিয়াম — muonium
মিউয়ন নিউট্রিনো — muon neutrino
মিউয়ন উল্টা-নিউট্রিনো — muon anti-neutrino
মিলি কুরী — milli curies
মিউ মেসন — mu meson
মেঘকক্ষ — cloud chamber
মেরু — pole
মেসন — meson
মোম — paraffin (wax)
মৌল (মৌলিক পদার্থ) — element
মৌল কণিকা — fundamental particle
যৌগ (যৌগিক পদার্থ) — compound
যৌগিক পরমাণুকেন্দ্র — compound neucleus
রঞ্জন-রশ্মি (এক্স-রশ্মি) — Roentgen
রসায়ন — chemistry
রশ্মি — rays
রাদারফোর্ড — rutherfords
রাসায়নিক বিক্রিয়া — chemical reaction
রাসায়নিক বিশ্লেষণ — chemical analysis
রৈখিক ত্বরক — linear accelerator ('linac')
লরেন্সিয়াম — lawrencium
লাল-উজানি আলো — infra-red light
লেপটন — leplons

banglainternet.com

শক্তি — energy
শক্তির নিত্যতা — conservation of energy
শৃংখল-বিক্রিয়া — chain veaction
শ্বেত-বামন — white dwarf
শ্বেতসার — starch
সক্রিয় মৌল — active element
সংঘাত — blast
সংকোচন-প্রভাব — pinch effect
সন্ধানী — tracer
সাইক্লোট্রন — cyclotron
সিনক্রোট্রন — synchrotron
সিনক্রো সাইক্লোট্রন — synchro cyclotron
সিনটিলেশন কাউণ্টার — scintilation counter
সিজিয়াম — cesium
সিরকা — vinegar
সীউলফ — seawolf
সীমান্তিক আকার — critical size
স্ট্রনশিয়াম-৯০ — strontium-90
স্বতঃবিভাজন — spontaneous fission
স্ফুলিঙ্গ-কক্ষ — spark chamber
স্থায়ী পরমাণুকেন্দ্র — stable nucleus
স্থির রূপ — ground state

banternet